২

কিতাবুল মাসাইল

মুফতী মনসূরুল হক

সম্মিলিত মুনাজাতের শরঈ বিধান

তালাক দেয়ার শরঈ বিধান

খতমে কুরআনের বিনিময় গ্রহণ

বিপদ-আপদে সান্তনা পুরস্কার

তাবলীগ কি ও কেন?

মউদুদী মতবাদ

www.islamijindegi.com

সম্মিলিত মুনাজাত এর শর‘ঈ বিধান

মুফতী মনসূরুল হক

www.islamijindegi.com

ফরয নামাযের পর
সম্মিলিত মুনাজাত এর
শর'ঈ বিধান

মুফতী মনসূরুল হক
শাইখুল হাদীস ও প্রধান মুফতী
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া
খতীব, খিলগাঁও বাজার জামে মসজিদ

মাকতাবাতুল মানসূর

প্রথম প্রকাশ :
জানুয়ারি ২০০৩ ইং
দ্বিতীয় প্রকাশ :
জুন ২০০৯ ইং

শুভেচ্ছা বিনিময়: ৪০ টাকা

www.islamijindegi.com

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
জিজ্ঞাসা	৪
সংক্ষিপ্ত জওয়াব	৪
অবতরণিকা	৪
মুনাজাত সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ	৭
হাদীস শরীফ ও কুরআনে পাকের ব্যাখ্যা	৭
মুনাজাত সম্পর্কে নবী করীমের ﷺ আমল	৮
মুনাজাত সম্পর্কে নবী করীমের ﷺ নির্দেশ	১০
উল্লেখিত হাদীসসমূহ দ্বারা বুঝা যায়	১২
মুনাজাত সম্পর্কে হাদীস বিশারদগণের রায়	১৪
নামাযের পর মুনাজাতের স্বপক্ষে ফিক্হের কিতাবসমূহের দলীল	১৬
মুনাজাত অস্বীকারকারীদের কতিপয় অভিযোগ ও জওয়াব	১৮
তাম্বীহ	২১
পরিশিষ্ট	২২
মুনাজাতের সুন্নাত তরীকা	২৩
তথ্যসূত্র	২৪

باسمه تعالى

জিজ্ঞাসা: আমাদের দেশে দৈনন্দিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জামা'আতের পর ইমাম-মুক্তাদী সকলে মিলে যে মুনাজাত করে, শরী'আতে এর কোন প্রমাণ আছে কিনা? অনেকে বলে, "নামাযের পর মুনাজাত বলতে কিছু নেই। অতএব, তা বিদ'আত।" আবার অনেকে বলেছে, "নামাযের জামা'আতের পর ইমাম-মুক্তাদী একত্রে মুনাজাত করা বিদ'আত; একাকী মুনাজাত করা বিদ'আত নয়" এ ব্যাপারে শরী'আতের সঠিক ফায়সালা কী? বিস্তারিত জানতে চাই।

সংক্ষিপ্ত জওয়াব: নামাযের পর বা ফরজ নামাযের জামা'আতের পর কোন প্রকার বাড়াবাড়ি ব্যতিরেকে আমাদের দেশে যে মুনাজাত প্রচলিত আছে, তা মুস্তাহাব আমল; বিদ'আত নয়। কারণ-বিদ'আত বলা হয় ঐ আমলকে, শরী'আতে যার কোন ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। অথচ উক্ত "মুনাজাত" বহু নির্ভরযোগ্য রিওয়ায়াত দ্বারা সুপ্রমাণিত। এ ব্যাপারে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আমল ও নির্দেশ বিদ্যমান। তাই যারা মুনাজাতকে একেবারেই অস্বীকার করে, তারাও ভুলের মধ্যে রয়েছে।আবার যারা ইমাম-মুক্তাদীর সম্মিলিত মুনাজাতকে সর্বাবস্থায় বিদ'আত বলে, তাদের দাবীও ভিত্তিহীন এবং মুনাজাতকে যারা জরুরী মনে করে, এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে এবং কেউ না করলে তাকে কটাক্ষ করে, গালী দেয় তারাও ভুলের মধ্যে আছে।

অবতরণিকা: নামাযের পরের মুনাজাতকে সর্ব প্রথম যিনি ভিত্তিহীন ও বিদ'আত বলে দাবী তুলেছিলেন, তিনি হলেন আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ.। পরের তদীয় ছাত্র আল্লামা হাফিয ইবনুল কাইয়্যিম রহ. তাঁর অনুসরণ করেন। আল্লামা ইবনে তাইমিয়া ও হাফিয ইবনুল কাইয়্যিম দাবী করেন যে, নামাযের পর মুনাজাত করার কোন প্রমাণ কুরআন ও হাদীসে নেই। যে সব রিওয়ায়াতে নামাযের পর দু'আ করার কথা আছে, এর অর্থ-হচ্ছে-সালাম ফিরানোর পূর্বের দু'আয়ে মাছুরা।তাদের এ দাবীর খণ্ডনে বুখারী শরীফের সুপ্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাদাতা, জগৎবরেণ্য মুহাদ্দিস, হাফিয ইবনে হাযার আসকালানী রহ. বলেন, 'ইবনুল কাইয়্যিম প্রমুখগণের দাবী সঠিক নয়। কারণ-বহু সহীহ হাদীসে সালামের পর দু'আ করার স্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায়। সুতরাং ঐসব হাদীসে যে নামাযের শেষে দু'আ করার কথা আছে, তার অর্থ সালাম ফিরানোর পরে দু'আ ও মুনাজাত। দেখুনঃ ফাতহুল বারী, ২:৩৩৫/ফাতহুল মুলহিম, ২:১৬ পৃঃ

(১) يترجح تقديم الذكر الماثورة بتقييده فى الأخبار الصحيحة بدبر الصلاة وزعم بعض الحنابلة أن المراد بدبر الصلاة ما قبل السلام وتعقب بحديث ذهب أهل الدثور فإن فيه يسبحون دبر كل صلاة وهوبعد السلام جزما.

(كتاب الأذان، فتح البارى : ٢/٤٢٦)

(٢) عن عايشة رضي الله عنها قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار مايقول اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام.

لم يقعد إلامقدار ما يقول الخ : تمسك بهذا الحديث من زعم أن الدعاء بعد الصلاة لا يشرع.

الجواب : إن المراد بالنفي المذكور نفي استمراره جالسا على هيئته قبل السلام إلا بقدر أن يقول ما ذكر، فقد ثبت أنه كان إذا صلى أقبل على أصحابه فيحمل ما ورد من الدعاء بعد الصلاة على أنه كان يقوله بعد أن يقبل بوجهه على أصحابه. قال ابن القيم فى الهدى النبوى : وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة سواء الإمام والمنفرد والمأموم فلم يكن ذلك من هدى النبي صلى الله عليه وسلم أصلا. ولا روى عنه بإسناد صحيح ولاحسن...

قال الحافظ : وما ادعاه من النفي مطلقا مردود فقد ثبت عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : يا معاذ! إني والله لأ حبك فلا تدفع دبر كل صلاة أن تقول : اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ....

قيل المراد بدبر كل صلاة قرب اخرها وهو التشهد. قلنا قدورد الأمر بالذكر دبر كل صلاة، والمراد به بعد السلام إجماعا، فكذا هذا.

(فتح البارى : ٢/١٧٥)

এমনিভাবে ইবনুল কাইয়্যিম ও তাঁর উস্তাদের উক্ত অমূলক দাবীর প্রতিবাদ করে আল্লামা যাফর আহমদ উসমানী রহ. 'ই'লাউস সুনান' নামক গ্রন্থে লিখেছেন-"ইবনুল কাইয়্যিম প্রমুখগণ ফরজ নামাযের পরের দু'আকে অস্বীকার করে তৎসম্পর্কিত হাদীস সমূহকে সালাম ফিরানোর পূর্বের দু'আয়ে মাছুরা বলে বুঝাতে চেয়েছেন বটে, কিন্তু তাদের এ ব্যাখ্যা ঠিক নয়। কারণ-অনেক সুস্পষ্ট হাদীস তাদের এ ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে বিদ্যমান। সুতরাং স্পষ্ট হাদীস বিরোধী এ ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়।" (সুনান, ৩:১৫৯)

عن أبي أمامة رضى الله عنه قال : قيل أى الدعاء أسمع؟ قال : جوف الليل الأخير ودبر الصلوات المكتوبات ... قلت : فيه إثبات الدعاء بعد الصلاة. فاندحض به ما أورده ابن القيم الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة أو المآمومين، فلم يكن هديه صلى الله عليه وسلم أصلا، ولا روى عنه بإسناد صحيح ولاحسن. قلت : قد ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. فهذا حديث أبي أمامة فيه إرشاد الأمة بالدعاء بعد الصلوات المكتوبات.

www.islamijindegi.com

وأما تأويله بأن المراد من دبر الصلوت ما قبل السلام كما زعمه ابن القيم فباطل.

قال الحافظ في الفتح : زعم بعض الحنابلة أن المراد بدبر الصلاة ما قبل السلام وتعقب بحديث ذهب أهل الدثور فإن فيه يسبحون دبر كل صلاة وهو بعد السلام جزما، فكذلك ما شابهه. (اعلاء السنن : ١٥٩/٣)

... يفهم منه أنه كان يرفع يديه إذا فرغ من صلاته، فثبت دعاؤه بعد السلام من الصلاة رافعا يديه. (إعلاء السنن : ١٦١/٣)

যারা নামাযের পরের মুনাজাতকে একেবারেই অস্বীকার করেন, তাদের জবাবে উল্লেখিত উদ্ধৃতিদ্বয় যথেষ্ট।

আর যারা বলেন, নামাযের পর একাকী মুনাজাত করা যায়; কিন্তু ইমাম ও মুক্তাদীগণের জন্য সম্মিলিত মুনাজাত করা বিদ'আত; তাদের এ দাবীর স্বপক্ষে যেহেতু কোন মজবুত দলীল বিদ্যমান নেই, অর্থাৎ কুরআন ও হাদীস বা ফাতাওয়ার কিতাব থেকে তারা এমন একটি দলীলও পেশ করতে পারেন নাই, যার মধ্যে সম্মিলিত মুনাজাতকে নাজায়িয বা বিদ'আত বলে তার থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। তাই তাদের এ দাবীও গ্রহণীয় নয়।

'নামাযের পর মুনাজাত প্রসঙ্গে হাদীসসমূহ ব্যাপকতা সম্পন্ন। এ হাদীস সমূহে মুনাজাতের কোন ক্ষেত্র-বিশেষের উল্লেখ নেই। অতএব, হাদীস সমূহের ব্যাপকতার ভিত্তিতে নামাযের পর সর্বক্ষেত্রের মুনাজাতই মুস্তাহাব বলে বিবেচিত হবে। মূল ভিত্তি সহীহ হাদীসে বিদ্যমান থাকার পর বিদ'আতের তো কোন প্রশ্নই উঠে না। (ফাইযুল বারী: ২/৪৩১)

رفع اليدين بعد الصلوت للدعاء قل ثبوته فعلا وكثر فضله قولا، فلا يكون بدعة أصلا، فمن ظن أن الفضل فيما ثبت عمله صلى الله عليه وسلم به فقط فقد حاد عن طريق الصواب، وبنى أصلا فاسدا.

قد أخذت مأخذ الأذكار وليس في الأذكار رفع الأيدى.. إذا لم نفز بالأذكار فينبغي لنا أن لا نحرم من الأدعية ونرفع لهما الأيدى لثبوته عنه عقيب النافلة وإن لم يثبت بعد المكتوبة، فإذا ثبت دنسه لم تكن بدعة أصلا مع ورود القولية فى فضله. (فيض البارى : ٤٣١/٢)

اعلم أن الأدعية بهذه الهيئة الكتابية لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم تثبت عنه رفع الأيدى دبر الصلوات في الدعوات إلا أقل قليل، ومع ذلك وردت فيه ترغيبات قولية

والأمر في مثله أن لا يحكم بالبدعة، فهذه الأدعية في زماننا ليست بسنة بمعنى ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم وليست بدعة بمعنى عدم أصلها فى الدين.

(فيض البارى : ١٦٧/٢)

হাদীসে সম্মিলিত মুনাজাতের গুরুত্বের বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। ফিকহের কিতাব সমূহেও ইমাম-মুক্তাদীর সম্মিলিত প্রচলিত মুনাজাতকে মুস্তাহাব বলা হয়েছে। অসংখ্য হাদীস বিশারদগণের রায়ও সম্মিলিত মুনাজাতের স্বপক্ষে স্পষ্ট বিদ্যমান। এমতাবস্থায় প্রচলিত এ মুনাজাতকে বিদ'আত বলা হঠকারিতা বৈ কি? নিম্নে মুনাজাতের স্বপক্ষে আল্লাহ তাআলার নির্দেশাবলী, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীস সমূহ, ফিকহের কিতাব সমূহের বর্ণনা এবং হাদীস বিশারদগণের রায় সংক্ষিপ্ত দলীল সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপন করা হল ।

মুনাজাতের স্বপক্ষে কুরআন ও হাদীসের দলীলসমূহ

নামাযের পর মুনাজাত সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার নির্দেশ

عن الضحاك فإذا فرغت قال من الصلاة المكتوبة، وإلى ربك فارغب، قال في المسئلة والدعاء. (الدرالمنثور:٣٦٥/٦)

১। হযরত যাহ্হাক রা. সূরা ইনশিরাহ তথা আলাম নাশরাহ এর উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন, যখন তুমি ফরজ নামায থেকে ফারেগ হবে তখন আল্লাহর দরবারে দু'আতে মশগুল হবে।(তাফসীরে দূররে মানসূর : ৬/৩৬৫)

إذا فرغت من الصلاة المكتوبة فانصب في الدعاء. (تفسير ابن عباس : ٥١٤)

২। হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, তিনি উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন, "যখন তুমি ফরজ নামায হতে ফারেগ হও, তখন দু'আয় মশগুল হয়ে যাবে।" (তাফসীরে ইবনে আব্বাস রা., ৫১৪ পৃঃ)

قال ابن عباس وقتادة والضحاك ومقاتل والكلبي : إذا فرغت من الصلاة المكتوبة أو مطلق الصلاة فانصب إلى ربك والدعاء، وارغب إليه في المسئلة (تفسيرمظهرى:٢٩٤/١)

৩। হযরত কাতাদাহ, যাহহাক ও কালবী রা. হতে উক্ত আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত আছে, তাঁরা বলেন-'ফরজ নামায সম্পাদন করার পর দু'আয় লিপ্ত হবে'। (তাফসীরে মাযহারী, ১০/২৯৪ পৃঃ)

عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال : يا محمد! إذا صليت فقل : اللهم إني أسئلك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. (رواه الترمذى : ١٥٩/٢ الحديث ٣٢٤٩)

www.islamijindegi.com

৪। হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ তাআলা তাকীদ করে বলেছেন যে, হে মুহাম্মাদ! যখন আপনি নামায থেকে ফারিগ হবেন তখন এ দু‘আ করবেন, হে আল্লাহ আমি আপনার নিকট ভাল কাজের তৌফিক কামনা করছি এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে সাহায্য চাচ্ছি এবং আপনার দরবারের মিসকীন অর্থাৎ আল্লাহ ওয়ালাদের মুহাব্বত কামনা করছি....। (তিরমিযী শরীফ : ২/১৫৯ হাঃ নং ৩২৪৯)

আল্লাহ তা’আলার এ সমস্ত নির্দেশ দ্বারা বুঝা গেল যে, ফরজ নামাযের পর ইমাম ও মুসল্লীদের জন্য দু‘আ ও মুনাজাতে মশগুল হওয়া কর্তব্য, চাই তারা সম্মিলিতভাবে করেন বা প্রত্যেকে আলাদাভাবে করেন। তবে একই সময় আলাদাভাবে করলেও তা সম্মিলিত মুনাজাতের রূপ ধারণ করবে, যা অস্বীকার করা যায় না।

হাদীস শরীফ ও কুরআনে পাকের ব্যাখ্যা

কুরআনে কারীমের বিভিন্ন আয়াতে বলা হয়েছে যে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআনের হুকুম আহকামের ব্যাখ্যা ও বাস্তব নমুনা উম্মতের সামনে পেশ করবেন, এটা তার নবুওয়াতের দায়িত্ব। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেনঃ

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْکَ الذِّکْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَکَّرُوْنَ

আর আমি আপনার উপর কুরআন অবতীর্ণ করেছি যাতে আপনি লোকদের সামনে তাদের উপর নাযিলকৃত বিষয়গুলোকে স্পষ্ট বর্ণনা করেন এবং তারা চিন্তা-ভাবনা করে।

এই আয়াতের আলোকে এখন আমাদের দেখতে হবে যে, কুরআনে কারীমের উক্ত আয়াতের উপর তিনি নিজে কিভাবে আমল করেছেন এবং হাদীস শরীফের মধ্যে উম্মতকে কিভাবে আমল করার নির্দেশ দিয়েছেন।

নামাযের পর মুনাজাত সম্পর্কে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আমল

عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في دبر صلاته (التاريخ الكبير : ٦)

১। হযরত মুগীরা বিন শু’বা রা. বর্ণনা করেন যে, নবী আলাইহিস সালাম স্বীয় নামাযের শেষে দু‘আ করতেন। (ইমাম বুখারী (রহ) তারীখে কাবীরঃ ৬/৮০)

عن أنس رض كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة يقول : اللهم اجعل خير عمرى أخره وخير عملي خاتمه، وخير أيامي يوم ألقاك.(رواه الطبراني في الأوسط : ١٨٧/١الحديث ٩٤١١)

২। হযরত আনাস রা. বর্ণনা করেন যে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নামায থেকে ফারেগ হতেন তখন এ দু‘আ করতেন। হে আল্লাহ! আমার

জীবনের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর কর শেষ জীবনকে এবং আমার আমলের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম কর শেষ আমলকে এবং আমার দিন সমূহের মধ্যে সবচেয়ে মনোরম কর তোমার সাথে সাক্ষাতের দিনকে। (তাবারানী আউসাত: ১০/১৮৭ হাঃ নং ৯৪১১)

عن أبي بكرة رض فى قول اللهم إني أعوذبك من الكفر والفقر وعذاب النار كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهن دبر كل صلاة.(رواه النساءى : ١٥١ الحديث ٥٣٦٥)

৩। হযরত আবু বকরা রা. বর্ণনা করেন যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক নামাযের পর এ দু‘আ করতেন, “হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট কুফর, অভাব অনটন এবং দোযখের আযাব থেকে মুক্তি চাই।”(নাসাঈ শরীফ: ১/১৫১ হাঃ নং ৫৪৬৫)

عن زيد بن أرقم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في دبر كل صلاة اللهم بنا ورب كل شيء. (رواه أبو داود : ٢١١/١ الحديث ١٥٠٨)

৪। হযরত যায়েদ বিন আরকাম রা. বলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে প্রত্যেক নামাযের পর এ দু‘আ করতে শুনতাম, হে আল্লাহ যিনি আমাদের প্রতিপালক এবং প্রত্যেক জিনিসের প্রতিপালক। (আবু দাউদ:১/২১১ হাঃ নং ১৫০৮)

حدثنا محمد بن يحي الأسلمي قال : رأيت عبد الله بن الزبير ورأى رجلا رافعا يديه يدعو قبل أن يفرغ من صلاته فلما فرغ منه. قال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه حتى يفرغ من صلاته ... (إعلاء السنن : ١٦١/٣)

৫। হযরত মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়া রহ. বলেন, ‘আমি আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর রা. কে দেখেছি যে, তিনি এক ব্যক্তিকে সালাম ফিরানোর পূর্বে হাত তুলে মুনাজাত করতে দেখে তার নামায শেষ হওয়ার পর তাকে ডেকে বললেন, ‘রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেবল নামায শেষ করার পরই হস্তদ্বয় উত্তোলন করে মুনাজাত করতেন; আগে নয়।’ (ই’লাউস সুনান, ৩/১৬১)

عن السائب بن يزيد عن أبيه أن النبي صلى الله عله وسلم كان إدا دعا فرفع يديه مسح وجهه بيديه. (رواه أبو داود : ٢٠٩/١الحديث ١٤٩٢)

৬। হযরত সায়িব বিন ইয়াযীদ রা. স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন দু‘আ করতেন তখন উভয় হাত উঠাতেন এবং দু‘আ শেষে হস্তদ্বয়কে চেহারায় মুছতেন। (আবু দাউদ শরীফ ১/২০৯ হাঃ নং ১৪৯২)

عن أبي موسى الأشعرى أنه قال : دعا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه ورأيت بياض إبطيه. رواه البخارى : ٢/٩٣٨ الحديث

৭। হযরত আবু মূসা আশআরী রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আর জন্য উভয় হাত উত্তোলন করেন। যদ্দরুন আমি তাঁর বগলের সাদা অংশ দেখতে পাই। (বুখারী শরীফ ২/৯৩৮ হাঃ নং ৬৩৪১)

عن عمر بن الخطاب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. (رواه البخارى : ٢/١٧٦ الحديث ٦٣٤١)

৮। হযরত উমর ফারুক রা. বর্ণনা করেন যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'আর জন্য যখন হাত তুলতেন তখন চেহারায় মুছার পূর্বে হাত নামাতেন না। (বুখারী শরীফ ২/১৭৬ হাঃ নং ৬৩৪১)

এ সকল হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হল যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক নামাযের পর মুনাজাত করতেন, চাই ফরজ হোক বা নফল এবং মুনাজাত করার সময় দু'আর আদব হিসাবে উভয় হাত তুলতেন এবং শেষে উভয় হাত চেহারার মধ্যে মুছতেন। আর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এরূপ আমল করতেন তাহলে সাহাবাগণও রা. এ আমল করতেন। কারণ, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আমল ও নির্দেশ-এর পরে সাহাবাগণ তার বিরুদ্ধাচরণ করতে পারেন না।

নামাযের পর মুনাজাত সম্পর্কে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশ

عن معاذ بن جبل رض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أوصيك يا معاذ! لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عباد تك.(رواه النساءى : ١/١٤٦، وأبو داود : ١/٢١٣ الحديث ١٥٢٢)

১। হযরত মু'আয বিন জাবাল রা. বর্ণনা করেন যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, হে মু'আয! আমি তোমাকে ওসীয়ত করছি যে, প্রত্যেক নামাযের পর এ দু'আ পড়াকে তুমি কখনো ছাড়বে না-হে আল্লাহ! আমাকে তোমার জিকির, শোকর এবং উত্তম ইবাদত করার জন্য সাহায্য কর। (নাসাঈ শরীফ ১/১৪৬, আবু দাউদ শরীফ ১/২১৩ হাঃ নং ১৫২২)

عن أنس رض عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : قل بعد صلاة بعد ما ترفع يدك : اللهم إلهى إله إبراهيم. (ابن السني في عمل اليوم والليلة : ٦١ ضعيف ١٣٨)

২। হযরত আনাস রা. বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে নির্দেশ করেন যে, তুমি প্রত্যেক নামাযের পর হাত উঠিয়ে এ দু‘আ করবে হে আল্লাহ! যিনি আমার এবং ইবরাহীম আ. এর মাবূদ। (ইবনুস ছুন্নী : ৬১)

عن أبي أمامة الباهلي قال قيل يا رسول الله! أى الدعاء أسمع؟ قال : جوف الليل الأخر ودبر الصلوات المكتوبة. رواه الترمذى : ١/٨٧. وكذا. (وابن ماجة : ٩٣ الحديث ٣٤٩٩)

৩। হযরত আবু উমামা বাহেলী রা. বর্ণনা করেন যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হল যে, কোন দু‘আ কবূল হওয়ার সম্ভাবনা বেশী? ইরশাদ হলো, শেষ রাত্রে (তাহাজ্জুদের পর) এবং ফরজ নামায সমূহের পরে। (তিরমিযী শরীফ পৃঃ ১/৮৭ হাঃ নং ৩৪৯৯)

عن المطلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صلاة الليل مثنى مثنى، وتشهد في كل ركعتين، وتبائس وتمسكن، وتقنع وتقول اللهم اغفر لي فمن لم يفعل ذلك فهو خداج. (رواه ابن ماجة : ٩٣، ورواه أيضا أبو داود : الحديث ١٢٩٦)

৪। হযরত মুত্তালিব রা. বর্ণনা করেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, “রাত্রের নামাযে দু-দু রাকাআতের পর বসবে, এবং প্রত্যেক দু রাকাআতের পর তাশাহহুদ পড়বে এবং নামাযের মধ্যে নিজের নিঃস্বতা এবং বিনয়ীভাব প্রকাশ করবে। তারপর নামায শেষে দু হাত উঠাবে এবং দু‘আ করবে, হে আল্লাহ! আমাকে মাফ করে দাও। যে ব্যক্তি এরূপ করবে না, তার নামায অসম্পন্ন থাকবে। (আবু দাউদ শরীফ : ১/১৮৩, ইবনে মাজাহ শরীফ পৃঃ ৯৩ হাঃ নং ১২৯৬)

عن فضل بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة مثنى مثنى تشهد في كل ركعتين وتخشع وتضرع وتمسكن وتقنع يديك يقول ترفعهما إلى ربك مستقبلا بطونهما وجهك وتقول : يارب! يا رب! فمن لم يفعل ذلك فهو كذا(رواه الترمذى الحديث ٣٧٥)

৫। হযরত ফযল ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘নামায দুই দুই রাক’আত; প্রত্যেক দুই রাক’আতে আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করতে হয়। ভয়-ভক্তি সহকারে কাতরতার সহিত বিনত হয়ে নামায আদায় করতে হয়। আর (নামায শেষে) দু’হাত তুলবে এভাবে যে, উভয় হাত প্রভু পানে উঠিয়ে চেহারা কিবলামুখী করবে। অতঃপর বলবে-প্রভু হে! প্রভু হে! যে ব্যক্তি এরূপ করবে না, সে অসম্পূর্ণ নামাযী। (তাঁর নামায অঙ্গহীন সাব্যস্ত হবে)। (তিরমিযী শরীফ : ১৮৭ হাঃ নং ৩৮৫)

عن عبد الله بن عباس رض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغت من الدعاء فامسح بيديك وجهك. (رواه ابن ماجة : ٢٧٥، وأبو داود : ١/٢٠٩ الحديث ١٤٩٢)

৬। হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, দু‘আ করার তরীকা হল যে তুমি উভয় হাত কাঁধ বরাবর তুলবে। (আবু দাউদ শরীফ : ১/২০৯ হাঃ নং ১৪৯২)

عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : المسئلة أن ترفع يديك حذو منكبيك. (رواه أبو داود : ١/٢٠٩ الحديث ١٤٨٩ صيحح)

৭। হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা. বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, যখন তুমি দু‘আ শেষ করবে তখন উভয় হাতকে চেহারার মধ্যে মুছবে। (ইবনে মাজা : ২৭৫ হাঃ নং ১৪৮৯)

عن سلمان رض قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما رفع قوم أكفهم إلى الله تعالى يسألونه شيئا إلا كان حقا على الله أن يضع فى أيديهم الذى سألوا. رواه الطبر انى في الكبير : ٦/٢٥٤ الحديث ٦١٤٢

৮। হযরত সালমান রা. বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, কোন জামাআত কিছু প্রার্থনা করার জন্য আল্লাহর দরবারে হাত তুললে আল্লাহ তাআলার উপর ওয়াজিব হয়ে যায় তাদের প্রার্থিত বস্তু তাদের হাতে তুলে দেয়া। (তাবারানী কাবীর : ৬/২৫৪ হাঃ নং ৬১৪২)

عن سلمان رض قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن ربكم حي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما صفرا. (رواه أبو داؤد عن سلمان ١/٧٠٩ برقم ١٤٨٨)

৯। হযরত আলী ইবনে আবী তালিব থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ নিশ্চয়ই তোমাদের প্রভু অত্যন্ত লাজুক, এবং দয়ালু। কোন বান্দা তার হাত দুটি উঠিয়ে মুনাজাত করলে তার হাত খালি অবস্থায় ফিরিয়ে দিতে তিনি লজ্জাবোধ করেন। (আবু দাউদ হাঃ নং ১৪৮৮)

ما من عبد مؤمن بسط كفيه في دبر كل صلاة ثم يقول : اللهم إلهى. (ابن السنى فى عمل اليوم ١٣٨)

১০। হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে বান্দা প্রত্যেক নামাযের পর দু’হাত তুলে এ দু‘আ পড়বে- “আল্লাহুম্মা ইলাহী ..... “আল্লাহু তা’আলা নিজের উপর নির্ধারিত করে নিবেন যে, তার হস্তদ্বয়কে বঞ্চিত ফেরত দিবেন না। (ইবনুস সুন্নী হাঃ নং ১৩৮)

عن حبيب ابن مسلمة --- قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يجتمع ملأفيدعو بعضهم ويؤمن البعض إلا أجابهم الله --- رواه الحاكم فى مستدركه : ٣٤٧/٣ الحديث ٥٤٧٨

১১। হযরত হাবীব ইবনে মাসলামা রা. বর্ণনা করেন, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন “যদি কিছু সংখ্যক লোক একত্রিত হয়ে এভাবে দু‘আ করে যে, তাদের একজন দু‘আ করতে থাকে, আর অপররা ‘আমীন’ ‘আমীন’ বলতে থাকে, তবে আল্লাহ তা’আলা তাদের দু‘আ অবশ্যই কবুল করে থাকেন।’ (তালখীসুয যাহাবী, ৩:৩৪৭ পৃঃ, মুস্তাদরাকে হাকেম : হাঃ নং ৫৪৭৮)

عن ثوبان عن النبى صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرإ أن ينظر فى جوف بيت امرء حتى يستأذن، فإن نظر فقد دخل ولا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم ولا يقوم إلى الصلاة وهو حقن (رواه الترمذى : ٨٢/١ الحديث ٣٥٧)

১২। হযরত সাওবান রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘কোন ব্যক্তি লোকদের ইমাম হয়ে এমন হবে না যে, সে তাদেরকে বাদ দিয়ে দু‘আতে কেবল নিজেকেই নির্দিষ্ট করে। যদি এরূপ করে, তবে সে তাদের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করল।” (তিরমিযী শরীফ : ১:৮২ হাঃ নং ৩৫৭)

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, ইমাম সাহেব সকল মুসল্লীদের সঙ্গে নিয়ে সকলের জন্য দু‘আ করবেন। নতুবা তিনি খয়রাতী হবেন।

উল্লেখিত হাদীসসমূহ দ্বারা বুঝা যায়ঃ

(ক) ফরজ নামাযের পর দু‘আ কবুল হওয়ার বেশী সম্ভাবনা। তাই ফরজ নামাযের পর সকলের জন্য দু‘আয় মশগুল হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(খ) নামাযের পর হাত তুলে দু‘আ করা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আমল। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং নামাযের পর দু‘আয় হাত উঠাতেন এবং মুনাজাত শেষে উভয় হাত চেহারার মধ্যে মুছতেন এবং অন্যদেরকে এর প্রতি উৎসাহিত করতেন। সুতরাং এটাই দু‘আর আদব। আর এ কথা তো হতেই পারে না যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযের পর হাত তুলতেন কিন্তু সাহাবা রা. গণ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিরোধিতা করে হাত তুলতেন না।

(গ) একজন দু‘আ করবে; আর অন্যরা সবাই আমীন বলবে; এভাবে সকলের দু‘আ বা ‘সম্মিলিত মুনাজাত’ কবুল হওয়া অবশ্যম্ভাবী। আর ইমাম সাহেব শুধু নিজের জন্য দু‘আ করবেন না। দু‘আতে মুসল্লীদেরকে শামিল করবেন। নতুবা তিনি খয়রাতী সাব্যস্ত হবেন।

(ঘ) উল্লেখিত হাদীস সমূহের সমষ্টিগত বর্ণনা দ্বারা নামাযের পর একাকী মুনাজাতের পাশাপাশি ফরজ নামাযের পর ইমাম-মুক্তাদী সকলের সম্মিলিত মুনাজাতের প্রমাণ দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। অতএব, তা মুস্তাহাব হওয়াই হাদীস সমূহের মর্ম ও সমষ্টিগত সার কথা। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুনঃ কিফায়াতুল মুফতী, ৩:৩০০ পৃঃ, সুনান ৩:১৬১ পৃঃ/ইমদাদুল ফাতাওয়া ১:৭৯৬)

মুনাজাতের স্বপক্ষে হাদীস বিশারদগণের রায়ঃ

১। জগত বিখ্যাত হাদীস বিশারদ আল্লামা হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে বলেন, "যে সকল নামাযের পর সুন্নাত নামায নেই, সে সকল ফরজ নামাযের পর ইমাম ও মুক্তাদীগণ আল্লাহর যিকিরে মশগুল হবেন। অতঃপর ইমাম কাতারের ডান দিকে মুখ করে দু'আ করবেন। তবে সংক্ষিপ্তভাবে মুনাজাত করতে চাইলে কিবলার দিকে মুখ করেও করতে পারেন।"(ফাতহুল বারী ২: ৩৯০পৃঃ)

وأما الصلاة التي لايتطوع بعدها فيتشاغل الإمام ومن معه بالذكر الماثور ولا يتعين له مكان بل إن شاء وا انصرفوا وذكروا وإن شاء وا مكثوا وذكروا، وعلى الثاني إن كان للإمام عادة أن يعلمهم أو يعظهم فيستحب أن يقبل عليهم بوجهه جميعا وإ كان لا يزيد على الذكر المأثور. فهل يقبل عليهم جميعا أو يتفتل فيجعل يمينه من قبل المأمو مين ويساره من قبل القبلة ويدعو الثاني هو الذى جزم به أكثر الشافعية، ويحتمل ان قصر زمن ذلك ان يستمر مستقبلا للقبلة (فتح البارى : ٢/٣٩٠)

২। প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাদাতা আল্লামা বদরুদ্দীন 'আইনী রহ. বলেন,"এ হাদীস দ্বারা নামাযের পরে মুনাজাত করা মুস্তাহাব বুঝা যায়। কারণ-সময়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং ঐ সময় দু'আ কবুল হওয়ার বেশী সম্ভাবনা।" (উমদাতুল ক্বারী ৬:১৩৯ পৃঃ)

ومن فوائد الحديث --- منها : فضل الذكر عقيب الصلاة بأنها أوقات فاضلة ترجى منها إجابة الدعاء (عمدة القارى : ٦١٣/٤)

৩। আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে বলেন, 'নামাযের পরে হাত উঠিয়ে মুনাজাত করা বিদ'আত নয়। কারণ-এ ব্যাপারে প্রচুর কাওলী রিওয়ায়াত বিদ্যমান। আমলী রিওয়ায়াতের মধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাঝে মধ্যে এ মুনাজাত করেছেন' বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। আর এটাই সকল মুস্তাহাবের নিয়ম। তিনি নিজে মুনাসিব মত আমল বেছে নিতেন, আর অবশিষ্ট মুস্তাহাবসমূহের ব্যাপারে উম্মতদেরকে উৎসাহ দিতেন। সুতরাং এখন যদি আমাদের কেউ নামাযের পরে হাত উঠিয়ে দায়িমী (স্থায়ী) ভাবে মুনাজাত করতে থাকে, তাহলে সে ব্যক্তি এমন একটা বিষয়ের উপর আমল করল, যে ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উৎসাহ দিয়ে গেছেন। যদিও তিনি নিজে সর্বদা আমল করেননি।” (ফাইযুল বারী, ২:১৬৭ পৃঃ ও ৪৩১ পৃঃ/৪:৪১৭ পৃঃ)

---لا أن الرفع بدعة فقد هدى إلىه في قوليات كثيرة، وفعله بعد الصلاة قليلا، وهكذا شانه في باب الأذكار والأوراد اختاره صلى الله عليه وسلم لنفسه ما اختار الله له صلى الله عليه وسلم وبقي أشياء رغب فيها الأمة، فإن التزم أحد منا الدعاء بعد الصلاة برفع اليد فقد عمل بما رغب فيه وإن لم يكثره لنفسه، فاعلم ذلك. (فيض البارى : ١٦٧/٢)

৪। কুতুবুল আলম শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া রহ. বললেন,“ফরজ নামাযের পরে হাত উঠিয়ে মুনাজাত করাকে কিছু লোক অস্বীকার করে থাকে। কিন্তু তা ঠিক নয়। কারণ-এর ব্যাপারে প্রচুর হাদীস বিদ্যমান রয়েছে। এ সকল হাদীস দ্বারা নামাযের পর মুনাজাত করা মুস্তাহাব প্রমাণিত হয়”। (আল-আবওয়াব ওয়াত-তারাজিম ৯৭ পৃঃ)

৫। সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা ইউসুফ বিন্নূরী রহ. মুনাজাত সম্পর্কিত হাদীসসমূহ উল্লেখ পূর্বক বলেন, “মুনাজাত অধ্যায়ে যে সকল হাদীস পেশ করা হল, এগুলোই যথেষ্ট প্রমাণ যে, ফরজ নামাযের পর সম্মিলিত মুনাজাত জায়িয। এ হাদীস সমূহের ভিত্তিতেই আমাদের ফুক্বাহা কেরাম উক্ত মুনাজাতকে মুস্তাহাব বলেছেন। (মা’আরিফুস সুনান : ৩:১২৩ পৃঃ)

فهذه وما شاكلها من الروايات في الباب تكاد تكفي حجة لما اعتاده الناس في البلاد من الدعوات الاجتماعية دبر الصلوات... (معارف السنن : ١٢٣/٣)

৬। মুসলিম শরীফের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাকার আল্লামা নববী রহ. বলেন, “সকল ফরজ নামাযের পরে ইমাম, মুক্তাদী ও মুনফারিদের জন্য দু‘আ করা মুস্তাহাব। এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই।” (শারহে মুহাযযাব লিন-নাওওয়াবী ৩:৪৬৯)

قد ذكرنا استحباب الذكر والدعاء للإمام والمأموم والمنفرد وهو مستحب عقب كل الصلوات بلا خلاف--- . (شرح المهذب للنووى : ٤٦٩/٣)

৭। প্রখ্যাত হাদীস সংকলক হযরত মাওলানা জাফর আহমাদ উসমানী রহ. বলেন, “আমাদের দেশে যে সম্মিলিত মুনাজাতের প্রথা চালু আছে যে, ইমাম সাহেব নামাযের পর কেবলামুখী বসে দু‘আ করে থাকেন, এটা কোন বিদ‘আত কাজ নয়। বরং হাদীসে এর প্রমাণ রয়েছে। তবে ইমামের জন্য উত্তম হলো-ডানদিক বা বামদিকে ফিরে মুনাজাত করা।” (ই’লাউস সুনান ৩:১৬৩, ৩:১৯৯ পৃঃ)

তিনি আরো বলেন, “হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হল যে, প্রত্যেক ফরজ নামাযের পর হাত উঠিয়ে মুনাজাত করা মুস্তাহাব। যেমন- আমাদের দেশে এবং অন্যান্য মুসলিম দেশে প্রচলিত আছে।” (ঐ ৩:১৬৭ পৃঃ, ৩:২০৪)

এর পর তিনি নামাযের পর মুনাজাত অস্বীকারকারীদের কঠোর সমালোচনা করেছেন। (৩: ২০৩)

قلت والحاصل أن ما جرئ بہ العرف في ديارنا من أن الإمام يدعو فی دبر بعض الصلواش مستقبلا للقبلہ ليس ببد عۃ بل لہ أصل فی السنۃ، وإن کان الأولی أن ينحرف الإمام بعد کل صلاۃ يمينا أو يسارا ---. (إعلاء السنن : ٣/١٩٩)

তেমনিভাবে ফকীহুন নফ্স হযরত মাওলানা মুফতী রশীদ আহমদ গাংগুহী (রাহঃ)ও মুনাজাত অস্বীকারকারীদের সমালোচনা করেছেন। (আল কাওকাবুদ্দুররী- ২ : ২৯১)

মুহাদ্দিসীনে কিরামের বর্ণিত এ রায়সমূহ দ্বারা বুঝা গেলঃ

(ক) সকল নামাযের পর হাত উঠিয়ে মুনাজাত করা মুস্তাহাব। এ সময় দু'আ কবুল হওয়ার খুবই সম্ভাবনা।

(খ) মুনাজাত ইমাম-মুক্তাদী; মুনফারিদ সকলের জন্যই মুস্তাহাব আমল।

(গ) ফরয নামাযের পর ইমাম-মুক্তাদী সকলের ইজতিমায়ী মুনাজাত করা মুস্তাহাব।

(ঘ) ফরয নামাযের পর মুস্তাহাব মনে করে দায়িমীভাবে মুনাজাত করলেও কোন ক্ষতি নেই।

(ঙ) নামাজের পর মুনাজাত কোন ক্রমেই বিদ'আত নয়। বহু কাওলী হাদীস দ্বারা এ মুনাজাত ছাবেত আছে। মুস্তাহাব আমল হেতু রাসূল ﷺ নিজে যদিও তা মাঝে মধ্যে করেছেন, কিন্তু সকলকে তিনি এর প্রতি মৌখিকভাবে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়েছেন।

(চ) প্রচলিত মুনাজাতকে বিদ'আত বলা বা বিরোধিতা করা হঠকারিতার শামিল। প্রচলিত মুনাজাত মুস্তাহাব। সকল মাযহাবেই এ মুনাজাত মুস্তাহাব সাব্যস্ত হয়েছে।"(প্রমাণের জন্য হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ.এর প্রসিদ্ধ ফাতওয়া দ্রষ্টব্য পৃঃ ১/৭৯৬)

মুনাজাতের স্বপক্ষে ফিকহের কিতাবসমূহের দলীলঃ

ফিকহের কিতাবসমূহে মুনাজাতের স্বপক্ষে বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। নিম্নে তার কিয়দাংশ উদ্ধৃত হলঃ

(١) قال في شرعۃ الإسلام : ويغتنم أی المصلي الدعاء بعد المكتوبۃ

(٢) في مفاتيح الجنان : قولہ بعد المكتوبۃ أی قبل السنۃ، كذا في السعايۃ

(٣) في نور الإيضاح وشرحہ المسمی بإمداد الفتاح ثم بعد الفراغ عن الصلاۃ يدعو الإمام لنفسہ وللمسلمين رافعي أيديہم حذو الصدور وبطونہا مما يلی الوجہ بخشوع وسكون ثم

يمسحون بها وجوههم في اخره اى عند الفراغ من الدعاء. انتهى. كذا في التحفة المرغوبة والسعاية.

(۴) قد أجمع العلماء على استحباب الذكر والدعاء بعد الصلاة وجائت فيه أحاديث كثيرة. انتهى (تهذيب الأذكار للرملي كذا في التحفة المرغوبة)

(۵)--- أى اذكروا الله تعالى وادعوا بعد الفراغ من الصلاة.

(فتاوى صوفيه كذا في التحفة)

(۶) إن الدعاء بعد الصلاة المكتوبة مسنون وكذا رفع اليدين ومسح الوجه بعد الفراغ. (منهج العمال والعقائد السنية كذا في التحفة) بحواله كفايت المفتي : ۳/

১। ফিকহে হানাফীর অন্যতম মুল কিতাব 'মাবসূত'-এর বর্ণনাঃ....."যখন তুমি নামায থেকে ফারিগ হবে, তখন আল্লাহর নিকট দু'আয় মশগুল হয়ে যাবে। কেননা-এ সময় দু'আ কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশী।"

২। প্রসিদ্ধ ফিকহের কিতাব 'মিনহাজুল উম্মাল ও আকায়িদুছ ছুন্নিয়্যাহ এর বর্ণনাঃ "ফরজ নামাযের পর দু'আ করা সুন্নত। অনুরূপভাবে দু'আর সময় হাত উঠানো এবং পরে হাত চেহারায় মুছে নেয়াও সুন্নত।"

৩। ....."আততাহজীবুল আজকার'-এর বর্ণনা,"এ কথার উপর উলামাগণের ইজমা হয়েছে যে, নামাযের পর যিকর ও দু'আ করা মুস্তাহাব।"

৪। ....."শির'আতুল ইসলাম' এর বর্ণনা, "ফরয নামাযের পর মুসল্লীরা দু'আ করাকে গণিমত মনে করবে।"

৫। ....."তুহফাতুল মারগুবা' ও 'সি'আয়া'-এর বর্ণনাঃ "নামাজ শেষে ইমাম ও মুসল্লীগণ নিজের জন্য এবং মুসলমানদের জন্য হাত উঠিয়ে দু'আ করবেন। অতঃপর মুনাজাত শেষে হাত চেহারায় মুছবেন।" (তুহ্ফা পৃঃ ১৭)

৬। ..... 'ফাতাওয়া বাজ্জাজিয়া'-এর বর্ণনাঃ নামায শেষে ইমাম প্রকাশ্যভাবে হাদীসে বর্ণিত দু'আ পড়বেন এবং মুসল্লীগণও প্রকাশ্য আওয়াজে দু'আ পড়বেন। এতে কোন অসুবিধা নেই। তবে মুসল্লীদের দু'আ ইয়াদ হয়ে যাওয়ার পর সকলে বড় আওয়াজে দু'আ করা বিদ'আত হবে। তখন মুসল্লীগণ দু'আ আস্তে পড়বেন।

৭। 'নূরুলঈযাহ'-এর বর্ণনাঃ "নামাযের পরে জরুরী বা ওয়াজিব মনে না করে হাত উঠিয়ে সম্মিলিতভাবে আল্লাহর নিকট দু'আ করা মুস্তাহাব।" (নূরুল ঈযাহ পৃঃ ৮২)

উল্লেখিত বর্ণনাসমূহ দ্বারা স্পষ্টতঃ প্রমাণিত হলো যে, নামাযের পর দু'আ করা মুস্তাহাব। আর তা বিভিন্ন হাদীসে দু'আর আদব হিসাবে হাত উঠাতে উৎসাহিত করার আলোকে হাত উঠিয়ে করা বাঞ্ছনীয়। আরো প্রমাণিত হল যে, মুনাজাত করা ইমাম-মুক্তাদী সবার জন্যই পালনীয় মুস্তাহাব আমল।

মুনাজাত অস্বীকারকারীগণের কতিপয় অভিযোগ ও তার জাওয়াবঃ

অভিযোগ-১ বর্ণিত হাদীসমূহ সম্পর্কে ফরয নামাযের পর মুনাজাত ভিত্তিহীন হওয়ার দাবীদারগণ আপত্তি তুলেন যে, 'এ হাদীসমূহের কোন একটিতেও ফরয নামাযের পর সম্মিলিত মুনাজাত করার কথা উল্লেখ নেই। কেননা, এগুলোর কোনটিতে শুধু দু'আর কথা আছে, কিন্তু হাত তোলার কথা নেই। আবার কোনটিতে শুধু হাত তোলার কথা আছে, কিন্তু তা একাকীভাবে, সম্মিলিতভাবে নয়। আবার কোনটিতে সম্মিলিত মুনাজাতের কথা আছে; কিন্তু ফরয নামাযের পরে হওয়ার কথা উল্লেখ নেই। অতএব, এ হাদীসসমূহ দ্বারা প্রচলিত সম্মিলিত মুনাজাত প্রমাণিত হয় না!!

জওয়াব-১ তাদের অভিযোগের ভিত্তিই সহীহ নয়। কারণ শরীয়তে এমন কোন বিধান নেই যে, প্রত্যেকটা ইবাদতের সকল অংশ কোন একটা আয়াত বা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হতে হবে। নতুবা তা অগ্রহণযোগ্য হবে। তাদের এ আপত্তির জবাবে হযরত মাওলানা মুফতী কিফায়াতুল্লাহ রহ. মুফতী আজম হিন্দুস্তান "কিফায়াতুল মুফতী" গ্রন্থে বলেন- "বিষয়গুলো যেমন কোন এক হাদীসে একত্রিতভাবে উল্লেখিত হয়নি, তেমনি কোন হাদীসে তা নিষিদ্ধও হয়নি। কোন জিনিসের উল্লেখ না থাকার দ্বারা তা নিষিদ্ধ হওয়া বুঝায় না। সুতরাং এ কথা বলা যাবে না যে, এ সব হাদীস নামাযের পরের দু'আর জন্য প্রযোজ্য নয় বরং উল্লেখিত হাদীসমূহের বর্ণনা ভাব এমন ব্যাপকতা সম্পন্ন, যা সম্ভাব্য সকল অবস্থাকেই শামিল করে। তা ছাড়া বিভিন্ন রিওয়ায়াতে এ অবস্থাগুলোর পৃথক পৃথক উল্লেখ রয়েছে-যার সমষ্টিগত সামগ্রিক দৃষ্টিকোণে ফরজ নামাযের পর হস্ত উত্তোলন পূর্বক সম্মিলিত মুনাজাত অনায়াসে সাবিত হয়। এটা তেমনি, যেমন নামাযের বিস্তারিত নিয়ম, আযানের সুন্নত নিয়ম, উযূর সুন্নাত তরীকা ইত্যাদি একত্রে কোন হাদীসে বর্ণিত নেই। বিভিন্ন হাদীসের সমষ্টিতে তা সাবিত হয়" তারপরেও তা সকল উলামাদের নিকট গ্রহণযোগ্য। (দেখুনঃ কিফায়াতুল মুফতী, ৩:৩০০ পৃঃ)

অভিযোগ-২ নামাযের পর মুনাজাতের স্বপক্ষে হাদীসমূহ কেবল নফল নামাযের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অতএব, এর দ্বারা ফরয নামাযের পর মুনাজাত মুস্তাহাব হওয়া প্রমাণিত হয় না।

জওয়াব-২ বর্ণিত হাদীসসমূহের কয়েকটিতে ফরয নামাযের কথা উল্লেখ আছে। আর কয়েকটির মধ্যে "প্রত্যেক নামাযের পর" কথাটির উল্লেখ আছে। যার মধ্যে ফরয ও নফল সবই শামিল। সুতরাং এ প্রশ্নই অবান্তর। তাদের এ প্রশ্নের জওয়াবে হযরত মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে বলেন, "নামাযের

পর মুনাজাত করার পক্ষের হাদীসগুলোর ব্যাপারে ফিকাহবিদগণ নফল এবং ফরয উভয় নামাযকেই শামিল করেছেন।" (ফাইযুল বারী, ৪:৪৭ পৃঃ)

মাওলানা জাফর আহমদ উসমানী রহ. বলেন, "ফরজ নামাযের পর মুনাজাত নফল নামাযের অপেক্ষা উত্তম।"(ই'লাউস সুনান, ৩:১৬৭ পৃঃ)

সুতরাং কিছুক্ষনের জন্য যদি মেনে নেয়া হয় যে, উক্ত হাদীসসমূহে নফল নামাযের পর মুনাজাত করতে বলা হয়েছে তাহলে উক্ত কথার দ্বারা ফরজ নামাযের পর মুনাজাত আরো উত্তমভাবে প্রমাণিত হবে। এ কারণে যে, নফল নামাযের পর দুআ কবূল হওয়ার কোন ঘোষণা করা হয় নাই, আর ফরয নামাযের পর দুআ কবূল হওয়ার ঘোষণা করা হয়েছে। তো যে ক্ষেত্রে কবুল হওয়ার ঘোষণা নেই, সে ক্ষেত্রে যদি দু'আ ও মুনাজাত করতে হয় তাহলে যেখানে দু'আ কবুল হওয়ার ঘোষণা আছে সেখানে অবশ্যই দু'আ করা কর্তব্য। সুতরাং উক্ত অভিযোগ দ্বারা ফরয নামাযের পরে মুনাজাতকে অস্বীকার করা যায় না।

অভিযোগ-৩ মুনাজাত মুস্তাহাব হয়ে থাকলে, প্রচুর হাদীসে এ ব্যাপারে রাসূল ﷺ হতে আমল সাবিত থাকতো। অথচ এ ব্যাপারে একটি আমলী রিওয়ায়াতও সাবিত নেই।

জওয়াব-৩ প্রথমতঃ মুনাজাতের ব্যাপারে 'রাসূল ﷺ-এর আমল সম্পর্কিত একটি রিওয়ায়াতও সাবিত নেই'-এ কথাটি সম্পূর্ণ গলদ। কারণ এ প্রসঙ্গে অনেকগুলো স্পষ্ট রিওয়ায়াত দ্বারা আমরা রাসূল ﷺ-এর আমল অধ্যায়ে রাসূল ﷺ-এর মুনাজাত করার হাদীস বর্ণনা করেছি। দ্বিতীয়তঃ মুস্তাহাব আমল প্রমাণের জন্য রাসূল ﷺ-এর কওলী বা মৌখিক হাদীস যথেষ্ট, নবী কারীম ﷺ-এর আমল এর মাধ্যমে সাবিত হওয়া মোটেই জরুরী নয়। কারণ-বহু মুস্তাহাব আমল এমন রয়েছে, যা রাসূলে পাক ﷺ বিশেষ হিকমতের কারণে বা সুযোগের অভাবে নিজে করতেন না, কিন্তু সে সবের প্রতি মৌখিকভাবে উম্মতদেরকে উৎসাহ দিতেন। যাতে উম্মত তা আমল করে নিতে পারে। যেমন তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায, চাশতের নামায, আযান দেয়া যাকে আফজালুল আ'মাল বলা হয়ে থাকে ইত্যাদি। এগুলো রাসূলে পাক ﷺ থেকে আমল করার মাধ্যমে সাবিত নেই। অথচ তিনি এসব নেক কাজসমূহের প্রতি উম্মতকে মৌখিকভাবে যথেষ্ট উৎসাহিত করে গিয়েছেন। সকল উলামায়ে কেরাম এগুলোকে মুস্তাহাব আমল হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তদ্রূপ মুনাজাতের ব্যাপারে রাসূলে করীম ﷺ হতে আমলী রিওয়ায়াত স্বল্প বর্ণিত হলেও মৌখিক রিওয়ায়াত প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। অতএব, মুস্তাহাব প্রমাণ হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।

হযরত মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. বলেন, যারা বলে থাকেন যে, মুস্তাহাব প্রমাণ হওয়ার জন্য রাসূলে পাক ﷺ-এর মৌখিক বর্ণনার পাশাপাশি আমলও থাকতে

হবে, তারা সঠিক সরল পথ থেকে দূরে সরে পড়েছেন এবং একটি ফাসিদ ও গলদ জিনিসের উপর ভিত্তি করে কথা বলেছেন। (দ্রষ্টব্যঃ ফাইযুল বারী, ২:৪৩১ পৃঃ)

অভিযোগ-৪ মুনাজাতের স্বপক্ষে যে সকল হাদীসের উদ্ধৃতি দেয়া হয়, তার অনেকটাই জ'য়ীফ। অতএব, তা গ্রহণযোগ্য নয়।

জওয়াব-৪ এ অধ্যায়ের অনেক সহীহ হাদীসের পাশাপাশি কিছু হাদীস জ'য়ীফ থাকলেও যেহেতু তার সমর্থনে অনেক সহীহ রিওয়ায়াত বিদ্যমান রয়েছে, অতএব, তা নির্ভরযোগ্যই বিবেচিত হবে। দ্বিতীয়তঃ সেই হাদীসসমূহ ফজীলত সম্পর্কে। আর ফজীলতের ব্যাপারে জ'য়ীফ হাদীসও গ্রহণযোগ্য। (দেখুনঃ আল আযকার লিন নববী পৃঃ ৭-৮, তাদরীবুর রাভী লিস সুয়ূতী পৃঃ ১৯৬, কিতাবুল মাউযূআত লি মুল্লা আলী ক্বারী পৃঃ ৭৩)

অভিযোগ-৫ হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি ফরজ নামাযের পর যখন সালাম ফিরাতেন, তখন এত তাড়াতাড়ি উঠে পড়তেন যে, মনে হতো-তিনি যেন উত্তপ্ত পাথরের ওপর উপবিষ্ট ছিলেন। (উমদাতুল কারী, ৬:১৩৯ পৃঃ)

এতে বুঝা যায়, হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. সালাম ফিরিয়ে মুনাজাত না করেই দাঁড়িয়ে যেতেন।

জওয়াব-৫ হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা.-এর উল্লেখিত আমলের এ অর্থ নয় যে, তিনি সালাম ফিরানোর পর মাসনূন দু'আ-যিকর না করেই দাঁড়িয়ে যেতেন। কেননা-তিনি রাসূলে পাক ﷺ-এর বিরুদ্ধাচরণ কখনও করতে পারেন না। রাসূলে পাক ﷺ হতে সালাম ফিরানোর পর দু'আ যিকর এর কথা প্রচুর হাদীসে বর্ণিত আছে। সুতরাং রিওয়ায়াতটির সঠিক মর্ম হল-হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. সালাম ফিরানোর পর সংক্ষিপ্ত দু'আ-যিকর পাঠের অধিক সময় বসে থাকতেন না।

অতএব, উল্লেখিত রিওয়ায়াত দ্বারা হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা.-এর মুনাজাত করা ব্যতীত উঠে পড়া প্রমাণিত হয় না। (আল আবওয়াব ওয়াত তারাজিম, ৯৭ পৃঃ)

তাম্বীহঃ

যারা ফরজ নামাযের পরে সর্বাবস্থায় ইজতিমায়ী মুনাজাতের বিরোধী, তারা হযরত আবু বকর রা.-এর আমলের ভুল অজুহাত দেখিয়ে সালাম ফিরানোর পর দেরী না করেই সুন্নত ইত্যাদির জন্য উঠে পড়েন। অথচ এর দ্বারা নামাযের পর যে মাসনূন দু'আ ইত্যাদি রয়েছে, তা তরক করা হয়। দ্বিতীয়তঃ ফরজ ও সুন্নাতের মাঝখানে কিছু সময়ের ব্যবধান করার যে হুকুম হাদীস শরীফে পাওয়া যায়, তাও লঙ্ঘন করা হয়। তাদের জন্য নিম্নোক্ত হাদীসটি বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্যঃ

হাদীসঃ আবু রিমছা রা. বর্ণনা করেন, একদা আমি নবী কারীম ﷺ-এর সাথে নামায পড়তে ছিলাম। হযরত আবু বকর ও উমর রা. ঐ নামাযে উপস্থিত ছিলেন। তারা প্রথম সারিতে নবী কারীম ﷺ-এর ডান পার্শ্বে দাঁড়িয়ে থাকতেন। আমাদের সাথে এক

ব্যক্তি ছিল, যে উক্ত নামাযে তাকবীরে উলা হতেই উপস্থিত ছিল। (অর্থাৎ সে মাসবুক ছিল না) নবী কারীম ﷺ নামায শেষ করে সালাম ফিরালেন এমনভাবে যে, উভয় দিকে আমরা তাঁর গন্ডদ্বয় দেখতে পেলাম। অতঃপর নবী কারীম ﷺ ঘুরে বসলেন। তখন ঐ তাকবীরে উলায় উপস্থিত ব্যক্তি দাঁড়িয়ে পড়ল সুন্নাত নামায পড়ার জন্য। তৎক্ষণাৎ হযরত উমর রা. লাফিয়ে উঠলেন এবং ঐ ব্যক্তির উভয় কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন-"বসে পড়! পূর্ববর্তী কিতাবধারীদের (ধর্মীয়) পতন হয়েছে, যখন তারা (ফরজ ও সুন্নাত) নামাযের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করত না।" নবী কারীম ﷺ হযরত উমর রা.-এর এ কাজ দেখে দৃষ্টি উঠালেন এবং বললেন, "হে খাত্তাবের পুত্র! আল্লাহ তোমাকে সঠিক পন্থী বানিয়েছেন।" (আবু দাউদ শরীফ হাঃ নং ১০০৫)

পরিশিষ্ট: এ সকল বর্ণনার দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল যে, নামাযের পর ইমাম-মুক্তাদী সকলের জন্য ওয়াজিব মনে না করে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করা মুস্তাহাব। এ মুনাজাতকে বিদ'আত বলার কোন যুক্তি নেই। কারণ-বিদ'আত বলা হয় সেই আমলকে, শরীয়তে যার কোনই অস্তিত্ব নেই। আর মুনাজাত সেই ধরনের মূল্যহীন কোন আমল নয়। তবে যেহেতু মুনাজাত 'মুস্তাহাব আমল', তাই এটাকে জরুরী বা ওয়াজিব মনে করা এবং এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করা অনুচিত। মুস্তাহাব নিয়ে বাড়াবাড়ি করা নিষিদ্ধ।

অতএব, কেউ মুনাজাতের ব্যাপারে যদি এমন জোর দেয় যে, মুনাজাত তরককারীকে কটাক্ষ বা সমালোচনা করতে থাকে, বা মুনাজাত না করলে তার সাথে ঝগড়া-ফাসাদ করতে থাকে তাহলে তারা যেহেতু মুস্তাহাবকে ফরজে পরিণত করছে সুতরাং সেরূপ পরিবেশে মুনাজাত করা মাকরূহ। মুনাজাত মাকরূহ হওয়ার এই একটি মাত্র দিক আছে। আর এটা শুধু মুনাজাতের বেলায় নয়, বরং সমস্ত মুস্তাহাবেরই এ হুকুম; মুস্তাহাব আমল নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে, ঝগড়া বিবাদ শুরু করলে তা নিষিদ্ধ করে দেয়া হবে। অতএব, মুনাজাতও পালন করতে হবে এবং বিদ'আত থেকেও বাঁচতে হবে। আর এর জন্য সুষ্ঠু নিয়ম আমাদের খেয়াল মতে এই যে, মসজিদের ইমাম সাহেবান মুনাজাতের আমল জারী রেখে মুনাজাত সম্পর্কে মুসল্লীগণকে ওয়াজ-নসীহতের মাধ্যমে বুঝাবেন এবং ফরয-ওয়াজিব ও সুন্নাত-মুস্তাহাবের দরজা ও মর্তবা (ব্যবধান) বুঝিয়ে দিয়ে বলবেন, সালামের পর ইমামের ইকতিদা শেষ হয়ে যায়। ইমাম সাহেব মুস্তাহাব আমল হিসাবে মুনাজাত করতে পারেন, কোন জরুরী কাজ থাকলে মুনাজাত নাও করতে পারেন। তেমনিভাবে মুসল্লীগণের জন্য ইমামের সাথে মুনাজাতে শরীক হওয়া উত্তম, যদি কোন মুসল্লীর জরুরী কাজ থাকে তাহলে তিনি সালাম বাদ ইমামের সাথে মুনাজাতে শামিল নাও হতে পারে। বা মুনাজাত করা যেহেতু মুস্তাহাব, সুতরাং যার সুযোগ আছে, সে মুস্তাহাবের উপর আমল করে নিবে। আর যার সুযোগ নেই; তার জন্য মুস্তাহাব তরক করার অবকাশ আছে। এমন কি কেউ যদি ইমামের সাথে মুনাজাত শুরু করে, তাহলে ইমামের সাথে শেষ করা জরুরী নয়।

কারণ সালাম ফিরানোর পর ইকতিদা শেষ হয়ে যায়। সুতরাং কেউ চাইলে, ইমামের আগেই তার মুনাজাত শেষ করে দিতে পারে। আবার কেউ চাইলে, ইমামের মুনাজাত শেষ হওয়ার পরও দীর্ঘক্ষণ একা একা মুনাজাত করতে পারে। কিন্তু এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা শরী'আতে নিষেধ। এভাবে বুঝিয়ে দেয়ার পর ইমাম সাহেবান প্রত্যেক ফরয নামাযের পর দায়িমীভাবে মুনাজাত করলেও তাতে কোন ক্ষতি নেই। অনেকের ধারণা মুস্তাহাব আমল দুয়ম করলে তা বিদ'আত হয়ে যায়। সুতরাং 'মুস্তাহাব প্রমাণের জন্য মাঝে মাঝে তরক করতে হবে।' তাদের এ ধারণা সঠিক নয়। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, হযরত আয়িশা সিদ্দীকা রা. দায়িমীভাবে চাশতের নামায পড়তেন। কখনও পরিত্যাগ করতেন না। উপরন্তু তিনি বলতেন, "চাশতের নামাযের মুহূর্তে আমার পিতা-মাতা জীবিত হয়ে এলেও আমি তাদের খাতিরে এ নামায পরিত্যাগ করব না। (মুয়াত্তা মালেক পৃঃ ১১৬, হাঃ নং ১৯১) অথচ চাশতের নামায মুস্তাহাব পর্যায়ের। হযরত আয়িশা রা. দুয়ম পড়ার কারণে কি তা বিদ'আত বলে গণ্য হয়েছিল? কখনোই নয়। তেমনিভাবে মুস্তাহাব প্রমাণের জন্য মাঝে মধ্যে তরক করার কোন আবশ্যকীয়তা নেই। যেমন-সকল ইমামই টুপি পরে, জামা পরে নামায পড়ান। কেউ একথা বলেন না যে, মাঝে মধ্যে টুপি ছাড়া জামা ছাড়া নামায পড়ানো উচিত-যাতে মুসল্লীগণ বুঝতে পারেন যে টুপি পরা বা জামা পরা ফরজ-ওয়াজিব আমল নয়। তাহলে মুস্তাহাব প্রমাণের জন্য মুনাজাতকে কেন ছাড়া হবে? অতএব মাঝে মধ্যে মুনাজাত তরক করে নয়, বরং ওয়াজ-নসীহতের মাধ্যমেই মুনাজাত মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারটি বুঝিয়ে দেয়া যুক্তিযুক্ত। এটাই অদ্ভুত পরিস্থিতির উত্তম সমাধান। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে শরীয়তের সঠিক বিধান বুঝার এবং সুন্নাত মুতাবিক সহীহ আমল করার তাওফীক দান করুন-আমীন।

মুনাজাতের সুন্নাত তরীকা

১. মুনাজাতের শুরুতে আল্লাহর প্রশংসা করা এবং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দরূদ পাঠ করা। (তিরমিযী হাঃ নং- ৩৪৭৬)

২. উভয় হাত সিনা বরাবর উঠানো। (মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক হাঃ নং - ৩২৩৪)

৩. হাতের তালু আসমানের দিকে প্রশস্ত করে রাখা। (রদ্দুল মুহতার : ১/৪৭৭, তাবারানী কাবীর হাঃ নং - ৩৮৪২)

৪. হাতের আঙ্গুলসমূহ স্বাভাবিক ফাঁক রাখা। (হিসনে হাসীন : ২৭)

৫. দু'হাতের মাঝখানে সামান্য ফাঁক রাখা। (তুহ্ত্বাবী টীকাঃ মারাকিল ফালাহ : ২০৫)

৬. মন দিয়ে কাকুতি-মিনতি করে দু'আ করা। (সূরা আ'রাফ : ৫৫)

৭. আল্লাহ তাআলার নিকট দু'আর বিষয়টি বিশ্বাস ও দৃঢ়তার সাথে বারবার চাওয়া। (বুখারী শরীফ হাঃ নং - ৬৩৩৮)

৮. নিঃশব্দে দু'আ করা মুস্তাহাব। তবে দু'আ সম্মিলিতভাবে হলে এবং কারো নামাযে বা ইবাদতে বিঘ্ন সৃষ্টির আশংকা না থাকলে সশব্দে দু'আ করাও জায়িয আছে। (সূরা আরাফ : ২০৫, বুখারী শরীফ হাঃ নং - ২৯৯২)

৯.আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা, যেমনঃ 'সুব্হানা রাব্বিকা রাব্বিল ইয্যাতী' শেষ পর্যন্ত পড়া; দরূদ শরীফ ও আমীন বলে দু'আ শেষ করা। (তাবারানী কাবীর হাঃ নং - ৫১২৪, মুসান্নাফে আঃ রাজ্জাক হাঃ নং - ১১৭, আবু দাউদ হাঃ নং- ৯৮৩)

১০. মুনাজাতের পর হস্তদ্বয় দ্বারা মুখমণ্ডল মুছে নেওয়া। (আবু দাউদ হাঃ নং - ১৪৮৫)

তথ্যসূত্র

তাফসীরগ্রন্থ	**হাদীসের ব্যাখ্যাগ্রন্থ**
১. তাফসীরে দুররে মানসূর	১. ফাতহুল বারী
২. তাফসীরে ইবনে আব্বাস	২. উমদাতুল কারী
৩. তাফসীরে মাযহারী	৩. আল কাওকাবুদ্দুররী
হাদীসগ্রন্থ	৪. ফয়যুল বারী
১. বুখারী শরীফ	৫. মা'আরেফুস সুনান
২. নাসায়ী শরীফ	৬. আল আবওয়াব ওয়াত তারাজিম
৩. আবু দাউদ শরীফ	৭. ফাতহুল মুলহিম
৪. তিরমিযী শরীফ	৮. শরহে মুহায্যাব লিন্নাববী
৫. ইবনে মাজাহ শরীফ	৯. তাদরীবুর রাবী
৬. তারীখে কাবীর	১০. কিতাবুল মাওযূ'আত
৭. ই'লাউস সুনান	**ফাতাওয়া ও ফিক্হগ্রন্থ**
৮. মুস্তাদরাকে হাকেম	১. মাবসূত
৯. তালখীসে যাহাবী	২. ফাতাওয়া বায্যাযিয়া
১০. তাবারানী কাবীর	৩. ফাতাওয়া শামী
১১. তাবারানী আওসাত	৩. নূরুল ঈযাহ
১২. কানযুল উম্মাল	৪. ইমদাদুল ফাতাওয়া
১৩. ইবনুস সুন্নী	৫. কিফায়াতুল মুফতী

তালাক কখন দেয়া যায় ?

মুফতী মনসূরুল হক

www.islamijindegi.com

তালাক কখন দেয়া যায় ?

মুফতী মনসূরুল হক
জামি‘আ রাহমানিয়া আরাবিয়া
খতীব, খিলগাঁও বাজার জামে মসজিদ
সাত মসজিদ মাদ্রাসা
মুহাম্মাদপুর ঢাকা

প্রকাশনায় :
মাকতাবাতুল মানসূর

প্রথম প্রকাশঃ
রমাজান-১৪২৭ হিজরী
ঈসায়ী - ২০০৬
মূল্য : চৌদ্দ (১৪) টাকা মাত্র

www.islamijindegi.com

সূচীপত্র

তালাক দেয়া কখন জায়িয হয়?	৪
স্ত্রী পছন্দ হয়না এই কারণে তলাক দেয়ার হুকুম	৬
মাঝে মধ্যে মনোমালিন্য হয় এই কারণে তালাক দেয়ার হুকুম	৭
বিশেষ কোন দোষের কারণে তালাক দেয়ার বিধান	৮
হযরত যায়েদ ইবনে হারেসার তালাক দেয়ার প্রেক্ষাপট	৮
স্বামীর পক্ষ থেকে জুলুম হলে স্ত্রীর তালাক গ্রহণের পদ্ধতি	৯
দাম্পত্য কলহের মধ্যে অযথা অন্যের হস্তক্ষেপ অবাঞ্ছনীয়	১৩
একান্ত অপারগতার সুরত দুটি হতে পারে	১৫

باسمه تعالي

প্রশ্ন : তালাক দেয়া কখন জায়িয হয় ?

উত্তর: ইসলামের দৃষ্টিতে বিবাহের চুক্তি অন্যান্য চুক্তির মত নয় বরং এতে একদিকে যেমন চুক্তি রয়েছে অপর দিকে এটি একটি ইবাদতও বটে। এ কারণেই হাদীসে পাকে বিবাহ শাদীর ব্যাপারে যেভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে অন্যান্য মুআমালা তথা বেচা কেনা ইত্যাদির ব্যাপারে তেমন উৎসাহিত করা হয় নাই। কাজেই শরীআতে বিবাহের চুক্তি একটি অত্যন্ত মূল্যবান চুক্তি যা সারা জীবনের জন্য সম্পাদন করা হয়। এ চুক্তি যেন ভঙ্গ করার মত কোর অবস্থা সৃষ্টি না হয়। সে দিকে ইসলাম বিশেষ ভাবে লক্ষ রেখেছে। কেননা এই সম্পর্ক ছিন্ন করার পরিণাম শুধু স্বামী-স্ত্রী পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে না বরং এতে উভয় পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সন্তানাদি থাকলে তাদের জীবনও বরবাদ হয়ে যায়। এবং সংশ্লিষ্ট অনেকেই এর ফলে ক্ষতি গ্রস্ত হয় । এই জন্য শরীআতে বিবাহের চুক্তি ভঙ্গ করা তথা তালাকের বিষয়টিও অন্যান্য মুআমালার চেয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র । কুরআন ও হাদীসে তার জন্য অনেক আহকাম ও পরামর্শ বয়ান

করা হয়েছে যাতে করে পরত পক্ষে বিবাহ বিচ্ছেদ সমস্যার সম্মুখীন হতে না হয় । অতএব যদি কখনো স্বামী-স্ত্রীর মাঝে অমিল দেখা দেয়, বনি-বনা না হয় এবং একজন অপরজনের হক আদায় করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় তখন শরিআত তালাক দেয়ার পূর্বে সমস্যা সমাধানের জন্য দুটি ব্যবস্থা নিয়েছে । কোন অবস্থায় উক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের পূর্বে তালাক দেয়ার অনুমতি দেয়া হয় নাই। আল্লাহ না করুন যদি উক্ত দুটি ব্যবস্থা দ্বারাও সমস্যা সমাধান না হয় তখন কয়েকটি বিষয় খেয়াল রেখে স্বামীকে তালাক দেয়ার পরামর্শ দিয়েছে ।

প্রথম ব্যবস্থাটি কার্যকরী হলে উদ্ভূত সমস্যা স্বামী স্ত্রী দুজনের মধ্যেই মিট মাট হয়ে যায় তৃতীয় কোন লোকের প্রয়োজন হয় না। এতে স্বামীকে লক্ষ করে কয়েকটি ধাপ অতিক্রম করতে বলা হয়েছে।কুরআনে কারীমে স্বামীকে লক্ষ করে ইরশাদ হচ্ছে “তুমি যদি স্ত্রীর অবাধ্যতা কিংবা আনুগত্যের কিছু অভাব অনুভব কর, তবে

(ক) সর্বপ্রথম সবর কর এবং তাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে মানসিক ভাবে তাকে সংশোধন কর। এতে যদি কাজ হয়ে যায় তাহলে বিষয়টি এখানেই মিটে গেল।

www.islamijindegi.com

(খ) আর যদি এতে কাজ না হয় তাহলে তাকে সতর্ক করার জন্য এবং নিজের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে একই ঘরে পৃথক বিছানায় শয়ন করবে।

(গ) আর যদি এটাতেও কাজ না হয় তাহলে তৃতীয় পর্যায়ে হালকা শাসন তথা শরীরের যে সব স্থানে মারলে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা নাই এবং চেহারা বাদ দিয়ে অন্যত্র হালকা প্রহারের অনুমতি আছে। কিন্তু এই পর্যায়েও স্ত্রীকে প্রহার করা রাসূলে কারীম ﷺ পছন্দ করেননি। বরং তিনি বলেছেন আমার উম্মতের মধ্যে শরীফ ত্ববকা অর্থাৎ ভদ্র লোকেরা এমনটি করবে না। (বুখারী শরীফ - ৫২০৪)

মোট কথা শরিআত এই ব্যবস্থাটি এই জন্যেই দিয়েছে যে, যাতে ঘরের বিষয় ঘরেই মীমাংসা হয়ে যায়।

কিন্তু অনেক সময় মনোমালিন্য বা বিবাদ দীর্ঘায়িত হয়ে যায় যা স্ত্রীর কোন বদ স্বভাবের কারণে স্বামীর পক্ষ থেকে অহেতুক কড়াকড়ি ইত্যাদির কারণে হয়ে থাকে। যে কোন কারণেই হোক এমতাবস্থায় ঘরের ব্যাপার আর ঘরে সীমিত থাকে না। তখন বাইরে নিয়ে যাওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কেননা সাধারণত এসব ক্ষেত্রে

স্বামী স্ত্রী উভয় পক্ষের লোকেরা একে অপরকে মন্দ বলে বেড়ায় এবং তাদের মাঝে ফেৎনা ফাসাদ সৃষ্টি হয়। এই ফেৎনা ফাসাদের পথ বন্ধ করার জন্য শরিআত সালিশী ব্যবস্থা নিয়েছে যে, একজন সালিস স্বামীর পরিবারের পক্ষ থেকে আর একজন সালিস স্ত্রীর পরিবারের পক্ষ থেকে মনোনীত করা হবে। তাঁরা উভয়ে ইসলাহের নিয়তে স্বামী স্ত্রীর মাঝে বনি বনা করানোর জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করবে । উক্ত সালিসগণ যদি ব্যর্থ হন তখন কয়েকটি শর্তের সাথে ابغض الطلاق المباحات তথা সবচেয়ে নিকৃষ্ট হালাল কাজ তালাক দেওয়া) এই ভিত্তিতে স্বামীর জন্য এক তালাক দেওয়া জায়িয হবে। শর্তগুলি হচ্ছে (ক) স্ত্রী হায়েয থেকে পাক অবস্থায় হবে। (খ) উক্ত তুহুরে তার সাথে মিলন না হতে হবে। (গ) ঠাণ্ডা মস্তিস্কে অর্থাৎ রাগান্বিত অবস্থায় নয় (ঘ) এক সাথে একাধিক তালাক না দেয়া জরুরী । কারণ এক সাথে একাধিক তালাক বা তিন তালাকের কোন প্রয়োজন শরীআতে রাখে নাই। এক সাথে তিন তালাক জায়িযও করে নাই। জরুরতের ক্ষেত্রে এক তালাকই যথেষ্ট। মোট কথা উপরের বর্ণিত স্তর অতিক্রম না করে হঠাৎ করে তালাক দেয়া জায়িয নয়

আর এর পূর্বে মাসআলা জানার জন্য ফাতওয়া নিতে হবে। সংশোধনের সকল রাস্তা অবলম্বন করতে হবে। তারপর তালাক দেয়ার মুহূর্তে উল্লেখিত কথাগুলি খেয়াল রাখতে হবে। এতে করে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ চাহে তো তালাক দেয়ার প্রয়োজন না ও থাকতে পারে। (তাকমীলায়ে ফাতহুল মুলহিম .১:১৩৩ # هماری عائلي مسائل ج1 ص 118 # ফাতাওয়ায়ে শামী.৩:৪৪১)

প্রশ্ন: স্ত্রীর কোন ত্রুটি নাই। তবে স্বামীর নিকট স্ত্রী ভাল লাগে না এ কারণে তালাক দেয়া জায়িয হবে কি?

উত্তর: তালাক সবচেয়ে নিকৃষ্ট হালাল কাজ । একান্ত প্রয়োজনের ক্ষেত্রে মারাত্মক সমস্যা থেকে মুক্তি লাভের জন্য শরিআত তালাকের অনুমতি দিয়েছে। স্ত্রীর কোন ত্রুটি নাই তবে স্ত্রীকে ভাল লাগেনা এটা বিবাহ বিচ্ছেদের গ্রহণযোগ্য কারণ নয় । বরং এ ভাল না লাগার অন্য কোন কারণ থাকলে তা নিরসনের চেষ্টা করে যেতে হবে। কুরআনে কারীমে এরশাদ করা হয়েছে,

وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن اخ

অর্থ- বিবিদের সাথে সদ্ভাবে জীবন-যাপন কর অতঃপর যদি তাদেরকে অপছন্দ কর, তবে হয়ত তোমরা এমন

এক জিনিসকে অপছন্দ করছ যাতে আল্লাহ তাআলা তোমার জন্য অনেক কল্যাণ রেখেছেন। (সুরা নিসা.আয়াত নং-১৯)

উক্ত আয়াতে বিবিদের সামান্য ত্রুটির কারণে তালাক হতে বিরত থেকে সবর করতে বলা হয়েছে এবং আল্লাহ এতে অনেক কল্যাণও নিহিত রেখেছেন ।

এমনি ভাবে একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে

خيركم خيركم من اهله واناخيركم لاهلي--رواه ابن ماجه (1977)

অর্থ- "তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম এবং আমি আমার স্ত্রীদের নিকট উত্তম"।

অন্য এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে:

عن ابن عمر(رض)عن النبي صلي الله عليه وسلم قال –ابغض الحلال الي الله الطلاق-ابوداؤد(٢١٧٨)

অর্থ: তালাক সবচেয়ে নিকৃষ্ট হালাল কাজ। উক্ত আয়াত ও হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে একান্ত প্রয়োজনের ক্ষেত্রে মারাত্মক সমস্যা ছাড়া তালাকের অনুমতি নেই। এরূপ ক্ষেত্রে স্বামীর উচিৎ তাবলীগে দ্বীন নামক কিতাব থেকে "রেজা বিল কাযা"অর্থাৎ আল্লাহর ফায়সালায় সন্তুষ্টি

থাকা” এবং “সবর ও শোকরের” বয়ান ভাল ভাবে পড়ে নেয়া। তাহলে ইনশাআল্লাহ সব পেরেশানী হালকা হয়ে যাবে। ঐ বিবিকে খোদা প্রদত্ত নিয়ামত মনে করে নিজের জন্য সর্বোত্তম নিয়ামত মনে করবে, যেহেতু আল্লাহ তাকে এ বিবি দান করেছেন আর আল্লাহ তাআলা কাউকে কিছু দিলে বুঝতে হবে তার জন্য এর চেয়ে ভাল আর কিছু হতে পারে না।

প্রশ্ন: উভয়ের মধ্যে সামান্য বিষয় নিয়ে মাঝে মধ্যে বিতর্ক হয় কখনো কথা বন্ধ থাকে। আবার ঠিক হয়ে যায়। এ কারণে কি তালাক দেয়া জায়িয হবে ?

জবাব: উভয়ের মধ্যে সামান্য বিষয় নিয়ে তর্ক বিতর্ক হওয়া এবং ঠিক হয়ে যাওয়া ইত্যাদি নিতান্তই স্বাভাবিক ব্যাপার। এ কারণে তালাক না দেওয়া চাই। তবে যদি তা নিত্য দিনের অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায় এবং তা এমন পর্যায় চলে যায় যে, তাদের মাঝে শান্তিপূর্ণ জীবন বিঘ্নিত হয় তাহলে উক্ত অবস্থায় তালাক দেওয়ার অবকাশ রয়েছে। যেমনটা হযরত যায়িদ রা. ও হযরত যাইনাব রা. এর মাঝে হয়েছিল। শেষ পর্যায়ে তাঁদের

দুজনের মধ্যে বনি-বনা না হওয়ার কারণে হযরত যায়িদ রা. হযরত যায়নাব রা. কে তালাক দিয়েছিলেন।

অবশ্য এ ক্ষেত্রেও যদি কোন স্বামী বিবাহ বিচ্ছেদর পথে না গিয়ে ধৈর্য্য ধারণ করে তাহলে পরকালে বিরাট বিনিময়ের উপযুক্ত হবে।

প্রশ্ন: এক জনের মধ্যে কিছু দোষ ত্রুটি আছে- যেমন খুব রাগী, কখনো মিথ্যাও বলে বা এ জাতীয় ত্রুটি আছে। তখন কি এ কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ করা জায়িয আছে ?

উত্তর: স্থান কাল পাত্র ছাড়া অধিক মাত্রায় রাগ করা এটা অন্তরের দশটি রোগের মধ্য থেকে একটি রোগ যা আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক নর-নারীর মধ্যে স্বভাবগত ভাবে পরীক্ষামূলক সৃষ্টি করে রেখেছেন এবং আল্লাহ ওয়ালাদের সুহবতে যেয়ে এগুলোর চিকিৎসা করে সম্পূর্ণ নিজের কন্ট্রোলে রাখার ব্যবস্থাও দিয়েছেন। অতএব এ জাতীয় ত্রুটি পাওয়া গেলেই বিবাহ বিচ্ছেদ করা শরিআত সম্মত নয়। বরং এ জাতীয় ত্রুটির উপর প্রথমত খুব ধৈর্যধারণ করবে এবং আল্লাহর কাছে দু'আ করতে থাকবে । এবং কোন আল্লাহ ওয়ালার মাধ্যমে উক্ত রোগ গুলোর ইসলাহ করানোর ব্যাপারে চেষ্টা

করবে। যদি ইসলাহ করানো দ্বারা ইসলাহ হয়ে যায় তাহলে আল্লাহর শোকর। আর খোদা না খাস্তা যদি তার রাগ কন্ট্রোলে না আসে এবং পরস্পরে ঘর-সংসার করা এবং একে অপরের হক আদায় করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় তাহলে পরহেযগার ও অভিজ্ঞ কোন মুফতীর পরামর্শ নিয়ে স্বামী কর্তৃক তালাক বা স্ত্রী কর্তৃক খুলা'র ভিত্তিতে বিবাহ বিচ্ছেদ করানোর অনুমতি রয়েছে।

প্রশ্ন:- হযরত যায়িদ বিন হারেছা কি কি সমস্যার কারণে হযরত যাইনাবকে তালাক দিয়েছিলেন। সে সব সমস্যা সমাধানের জন্য মুরব্বীগন কোন প্রচেষ্টা চালিয়ে ছিলেন কী?

উত্তর:- হুজুর ﷺ এর নির্দেশ মোতাবেক হযরত যায়িদ বিন হয়হয়র সাথে হযরত যাইনাবের বিয়ে সম্পাদন হয়ে যায়। কিন্তু বিয়ের পর তাঁদের পরস্পরে স্বভাব প্রকৃতিতে মিল হচ্ছিল না। বিভিন্ন তাফসীর ও হাদীসে তার কারণ পাওয়া যায় যে,

১। হযরত যাইনাব নিজেকে বংশগত শ্রেষ্ঠ হওয়ার কারণে হযরত যায়িদকে (যিনি পূর্বে ক্রীতদাস ছিলেন)

কিছুটা কম গুরুত্ব দিতেন এবং তার প্রতি অনীহা প্রকাশ করতেন।

২। হযরত যাইনাব কথা বার্তার সময় কর্কশ শব্দ ব্যবহার করতেন।

৩। হযরত যাইনাব হযরত যায়িদের আনুগত্যে শৈথিল্য প্রদর্শন করতেন।

উক্ত তিনটি সমস্যার কারণে হযরত যায়িদ বিন হয়হয়র সাথে হযরত যাইনাবের বনি বনা না হওয়ায় হযরত নবী কারীম ﷺ এর নির্দেশক্রমে হযরত যায়িদ তাকে তালাক দেন। একদিন হযরত যায়িদ বিন হারেছা হুজুর ﷺ এর খেদমতে এসব অভিযোগ পেশ করতে গিয়ে হযরত যাইনাবকে তালাক দেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। হুজুর ﷺ যদিও আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অবগত হয়ে ছিলেন যে, ঘটনা একপর্যায় গিয়ে গড়াবে যে, হযরত যায়িদ হযরত যাইনাবকে তালাক দিয়ে দিবেন। অতপর হযরত যাইনাব হুজুর ﷺএর সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবেন। কিন্তু হুজুর ﷺ দুই কারণে হযরত যায়িদ কে তালাক দেওয়া থেকে বাহ্যত বারণ করেন ।

প্রথমত: এ ক্ষেত্রে তালাক দেয়া যদিও শরীআতে জায়িয । কিন্তু অপছন্দনীয় ও তা কাম্য নয়। বরং বৈধ বস্তু সমূহের মাঝে নিকৃষ্টতম। একারণে হুজুর ﷺ বললেন, তুমি তোমার স্ত্রীর সহিত বিবাহের সম্পর্ক বজায় রাখ । এবং তালাক দেওয়া থেকে আল্লাহ কে ভয় কর।

দ্বিতীয়ত: হুজুর ﷺ-এর অন্তরে এরূপ ধারণা সৃষ্টি হয় যে, যদি হযরত যায়িদ তালাক দেয়ার পর তিনি যাইনাব কে গ্রহণ করেন তাহলে আরবের লোকেরা তাদের কু-প্রথানুযায়ী এই অপবাদ দিবে যে, তিনি নিজ পুত্রবধূকে বিয়ে করেছেন। এই আশংকার কারণে হযরত যায়িদ কে তালাক দেয়া থেকে বারণ করেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আরবের ভ্রান্ত আক্বীদা ও কুপ্রথা খণ্ডন করার জন্য নিম্নে বর্ণিত আয়াত সমূহ নাযিল করেন এবং নবী ﷺ কে যাইনাব রা. কে বিবাহ করার নির্দেশ জারী করেন। (তাফসীরে রুহুল মাআনী-১১:৩৫# তাফসীরে মাজহারী.৭:৩৪৬)

প্রশ্ন:- কোন মহিলা স্বামী কর্তৃক জুলুমের শিকার হলে এর সমাধানে কুরআন ও সুন্নাহতে কী বলা হয়েছে ?

উত্তর: আল্লাহ তাআলা নারী জাতীকে সৃষ্টির করার রহস্য ও উপকারিতার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন

ومن اياته ان خلقكم من انفسكم ازواجا لتسكنواإليها

অর্থ-“আর এক নিদর্শন হল এই যে, তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা তাদের কাছে পৌঁছে শান্তিতে থাকো এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক মহব্বত ও দয়া সৃষ্টি করেছেন”। পুরুষের যত প্রয়োজন নারীর সাথে সম্পৃক্ত সবগুলোর সর্ম্পকে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, সবগুলোর সারমর্ম হচ্ছে মানসিক শান্তি ও সুখ। কুরআনে পাকের একটি মাত্র শব্দ لتسكنواإليها এর দ্বারাই সবগুলি বলে দেয়া হয়েছে।

একথা থেকে জানা গেল যে, বৈবাহিক জীবনে যাবতীয় কাজ কারবারের সারমর্ম হচ্ছে মনের শান্তি ও সুখ। যে পরিবারে এটা বিদ্যমান আছে সেই পরিবারে সৃষ্টির উদ্দেশ্য সফল। আর যেখানে মানসিক শান্তি নেই। সেখানে আর যাই থাকুক বৈবাহিক জীবনের সাফল্য নেই। এবং একথাও বলাবাহুল্য যে, নর-নারীর দাম্পত্য জীবনে মনের শান্তি ও সুখ তখনই সম্ভবপর যখন উভয় পক্ষ একে অপরের হুকুক তথা অধিকার সমূহের

আদায়ের ব্যাপারে সজাগ হয় এবং একে অপরের হক আদায় করতে থাকে। এক হাদীসে হুজুর ﷺ বলেন যে, “যে স্ত্রী তার স্বামীর হক আদায় করল না সে প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর হক আদায় করতে ব্যর্থ। (সহীহ ইবনে হিব্বান - ৪১৭১)

অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমি যদি দুনিয়াতে আল্লাহ তা‘আলা ব্যতীত কাউকে সিজদাহ করার হুকুম করতাম তাহলে নারী জাতিকে হুকুম করতাম যে, তারা যেন স্বামীর সিজদাহ করে। (তিরমিযী শরীফ-১১৫৯)

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. “নারী জাতির সংশোধন” নামক কিতাবে লিখেছেন “শরিআত নারী জাতিকে আল্লাহর হুকুম পালনের সাথে সাথে গুরুত্বপূর্ণ একটা দায়িত্ব দিয়েছে যে, স্বামীকে শান্তি পৌঁছাবে”। (সূত্র-তাকমীলয়ে ফাতহুল মুলহিম .৪:২৮৬)

উক্ত আয়াত ও হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, সর্বদা নারীরা সজাগ থাকবে যেন তাদের দ্বারা স্বামীরা কষ্ট না পায়।

তেমনি ভাবে স্বামীদের পক্ষ থেকে নারীরা জুলুম এর শিকার না হয় সে প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা স্বামীদের লক্ষ করে বলেন “আমার কুদরতী ফায়সালার ভিত্তিতে তোমাদের কাছে আমার এক বান্দি কে দিলাম তোমরা তার সাথে সৎ ব্যবহার কর এবং উত্তম রূপে তাদের হক আদায় করতে থাকো এবং তাদের কোন খাছলাত বা স্বভাবকে অপছন্দ মনে করে তাদেরকে ছেড়ে দিও না। বরং এমতাবস্থায় সবর কর, আমি মাওলা এতে অনেক কল্যাণ নিহিত রেখেছি। (তাফসীরে মাজহারী.২:৫০)

এমনি ভাবে হুজুর ﷺ বিদায় হজের ভাষণে পুরুষদের লক্ষ করে উপদেশ দেন “সাবধান ! বিবিদের সাথে উত্তম ব্যবহার কর, তাদের কে তোমাদের অধীনস্থ করে দেওয়া হয়েছে । সাবধান! তাদের হক তোমাদের উপর এটা যে, উত্তম রূপে তাদের খোর-পোশ আদায় কর। (তিরমিযী. ১১৬৩)

এমন কি হুজুর ﷺ দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার সময় ও الصلوة وما ملكت ايمانكم তথা নামাযের প্রতি খেয়াল রাখ এবং তোমরা তোমাদের অধীনস্থদের সাথে সদ্ভাবে

জীবন-যাপন কর” বলে উম্মতকে সতর্ক করে গেছেন। (ইবনে মাজাহ -১৬২৫)

মোট কথা কুরআন ও হাদীসে নর-নারীর দাম্পত্য জীবনের প্রতিটি দিক সর্ম্পকে পথ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বিধায় প্রত্যেক নর নারীর জন্য বিবাহ তালাক, স্বামী স্ত্রীর হক ইত্যাদির মাসআলা মাসায়িল ভাল ভাবে জেনে নেয়া ফরজে আইন। এ ফরজকে অবহেলা করে ছেড়ে দিলে একদিকে যেমন মারাত্নক গুনাহগার ও জুলুমের শিকার হতে হয় অপর দিকে বিপদের সম্মুখীন হওয়াও অনিবার্য।

এতদসত্বেও যদি কোন মহিলা বাস্তবিক পক্ষে স্বামী থেকে জুলুম এর শিকার হয় এবং তা অভিভাবকদের দৃষ্টিতেও জুলুম বলে গণ্য হয় সে ক্ষেত্রে কুরআন ও হাদীসে এর সমাধান হিসাবে মহিলাকে তিনটি পথ নির্দেশ করেছে।

উক্ত আয়াতটি وان مرأة خافت من بعلها اخ প্রথম পদ্ধতি এমন একটি সমস্যা সম্বন্ধে নাযিল হয়েছে যা অনিচ্ছাকৃত ভাবে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ফাটল সৃষ্টি করে, নিজ নিজ হিসাবে উভয়ে নিরপরাধ হওয়া স্বত্বেও

পারস্পরিক মনের মিল না হওয়ার কারণে উভয়ে নিজ নিজ ন্যায্য অধিকার হতে বঞ্চিত হওয়ার আশংকা করে। যেমন, একজন সুদর্শন সুঠামদেহী স্বামীর স্ত্রী স্বাস্থ্যহীনা, অধিক বয়স্কা , অথবা সুশ্রী না হওয়ার কারণে তার প্রতি স্বামীর মন আকৃষ্ট হয় না আর এর প্রতিকার করাও স্ত্রীর সাধ্যের বাহিরে। এমতাবস্থায় স্ত্রীকেও দোষারোপ করা যায় না। অন্যদিকে স্বামীকেও নিরপরাধ সাব্যস্ত করা যায়। এমতাবস্থায় স্ত্রী যদি তার সন্তানের খাতিরে অথবা নিজের অন্য কোন আশ্রয় না থাকার কারণে বিবাহ বিচ্ছেদে অসম্মত হয়, তবে তার জন্য সঠিক পন্থা এই যে, নিজের প্রাপ্য মোহর বা খোর পোষের ন্যায্য দাবীর আংশিক বা পুরোপুরি প্রত্যাহার করে স্বামীকে বিবাহ বন্ধন ঠিক রাখার জন্য সম্মত করবে। দায়দায়িত্ব ও ব্যয় ভার লাঘব হওয়ার কারণে স্বামীও হয়ত এ সমস্ত অধিকার থেকে মুক্তি পেয়ে এ প্রস্তাব অনুমোদন করবে। এভাবে সমঝোতা হয়ে যেতে পারে । কুরআনে কারীমের অত্র আয়াতে এধরনের সমঝোতার সম্ভাব্যতার প্রতি পথ নির্দেশ করতে গিয়ে অর্থাৎ প্রত্যেক واحضرت الانفس الشح বলা হয়েছে অন্তরেই লোভ বিদ্যমান রয়েছে কাজেই স্ত্রী হয়ত মনে

করবে যে, আমাকে বিদায় করে দিলে সন্তানাদির জীবন বরবাদ হতে পারে অথবা অন্যত্র আমার জীবন আরো দুর্বিষহ হতে পারে । তার চেয়ে বরং কিছু ত্যাগ স্বীকার করে এখানে পড়ে থাকাই লাভজনক । স্বামী হয়ত মনে করবে যে, দায় দায়িত্ব হতে যখন অনেকটা রেহাই পাওয়া গেল, তখন তাকে বিবাহ বন্ধনে রাখতে ক্ষতি কি? অতএব এভাবে উভয়ের মাঝে সহজে সমঝোতা হতে পারে । এব্যাপার আল কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে

وان امرة خافت من بعلها نشوزا اواعراضا فلا جناح عليها ان يصلحا بينهما

যদি কোন নারী স্বামীর পক্ষ থেকে কলহ বিবাদ বা বিমুখ হওয়ার আশংকা বোধ করে তবে উভয়ের কারোই কোন গুনাহ হবে না, যদি তারা নিজেদের মধ্যে শর্ত সাপেক্ষে পারস্পরিক সমঝোতায় উপনীত হয়। এখানে গুনাহ না হওয়ার কথা বলার কারণ এই যে, ব্যাপারটি বাহ্যিক দৃষ্টিতে ঘুষের আদান প্রদানের মত মনে হয়। কারণ স্বামীকে মোহরানা ইত্যাদি ন্যায্য দাবী হতে অব্যাহতির প্রলোভন দিয়ে দাম্পত্য বন্ধন ঠিক রাখা হয়েছে । কিন্তু কুরআন পাকের এ ভাষ্যের দ্বারা স্পষ্ট ভাবে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, বস্তুত : এটা ঘুষের

অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং উভয় পক্ষ কিছু কিছু স্বার্থ ত্যাগ করে মধ্যপন্থা অবলম্বন ও সমঝোতার ব্যাপার । অতএব এটা সম্পূর্ণ জায়িয এবং কুরআনের ভাষ্যনুযায়ী الصلح خير তথা বিবাহ বিচ্ছেদ করার চেয়ে সমঝোতার মাধ্যমে বিবাহ বন্ধন ঠিক রাখাটাই উত্তম ।

দাম্পত্য কলহের মধ্যে অযথা অন্যের হস্তক্ষেপ অবাঞ্ছনীয়

তাফসীরে মাযহারীতে বর্ণিত আছে ان يصلحا بينهما صلحا অর্থাৎ স্বামী স্ত্রী নিজেদের মধ্যে কোন সমঝোতা করে নিবে। এখানে بينهما শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে,স্বামী স্ত্রীর ঝগড়া কলহ বা সন্ধি সমঝোতার মধ্যে অহেতুক কোন তৃতীয় ব্যক্তি নাক গলাবে না। বরং তাদের নিজেদেরকে সমঝোতায় উপনীত হওয়ার সুযোগ দিবে। কারণ তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতির ফলে স্বামী স্ত্রীর দোষ ত্রুটি অন্য লোকের নজরে পড়ে যা তাদের উভয়ের জন্যই লজ্জাজনক ও স্বার্থের পরিপন্থী। তদুপরি তৃতীয় পক্ষের কারণে সন্ধি সমঝোতা দুষ্কর হয়ে পড়াও বিচিত্র নয়। অত্র আয়াতের শেষ অংশে আল্লাহ তা‘আলা স্বামীদের লক্ষ করে এরশাদ করেন وان

تحسنواوتتقوا فان الله كان بما تعملون خبيرا অর্থাৎ আর যদি তোমরা অনুগ্রহ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর তবে অবশ্যই আল্লাহ তাআলা তোমাদের কার্য কলাপ সর্ম্পকে অবহিত রয়েছেন। এখানে বুঝানো হয়েছে যে, অনিবার্য কারণ বশত: স্বামীর অন্তরে যদি স্ত্রীর প্রতি কোন আকর্ষণ না থাকে এবং তার ন্যায্য অধিকার পূরণ করা অসম্ভব মনে করে তাকে বিদায় করতে চায় । তবে আইনের দৃষ্টিতে স্বামীকে সে অধিকার দেয়া হয়েছে । এমতাবস্থায় স্ত্রীর পক্ষ থেকে কিছুটা স্বার্থ ত্যাগ করে সমঝোতা করা ও জায়িয আছে। কিন্তু এতদসত্বেও স্বামী যদি সংযম ও খোদা ভীতির পরিচয় দেয় এবং স্ত্রীর সাথে সহানুভূতি পূর্ণ ব্যবহার করে ,মনের মিল না হওয়া স্বত্বেও স্ত্রীর মন যুগিয়ে চলে এবং তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ না করে বরং তার চাহিদা মত যাবতীয় ন্যায্য অধিকার ও প্রয়োজন পূরণ করে তবে তার এই ত্যাগ ও উদারতা সর্ম্পকে আল্লাহ তাআলা ওয়াকিবহাল রয়েছেন। অতএব তিনি এহেন ধৈর্য্য, উদারতা, সহনশীলতার এমন প্রতিদান দিবেন যা কেউ কল্পনাও করতে পারে না ।

www.islamijindegi.com

অত্র আয়াতের শানে নুযূল প্রসঙ্গে বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত সওদা বিনতে জামা রা. নিজের অনিচ্ছাকৃত সমস্যার কারণে যখন আশংকা বোধ করলেন যে, হুজুর ﷺ তাঁকে তালাক দিয়ে দিবেন তখন তিনি হুজুর ﷺ এর কাছে দরখাস্ত করলেন যে, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার বিবাহ থেকে আমাকে পৃথক করবেন না। আমি আমার অধিকার হযরত আয়েশা রা. কে দিয়ে দিলাম। হুজুর ﷺ উক্ত দরখাস্ত কবুল করলেন। অতঃপর উপরে উল্লেখিত আয়াত নাযিল হয়।

মোট কথা শরিআত প্রশ্নে বর্ণিত সুরতে স্বামী-স্ত্রী উভয় কে স্বীয় অভাব অভিযোগ জুলুম দুর করা ও ন্যায্য অধিকার লাভ করার আইনত: অধিকার দিয়েছে। অপর দিকে ত্যাগ, সংযম ও উত্তম চরিত্র আয়ত্ব করার উপদেশ দিয়েছে। এখানে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, যথাসাধ্য বিবাহ বিচ্ছেদ থেকে বিরত থাক কর্তব্য। বরং এমতাবস্থায় উভয় পক্ষেই কিছু কিছু ত্যাগ স্বীকার করে সমঝোতায় আসা বাঞ্ছনীয়। এটা হল প্রথম উপদেশ।

দ্বিতীয় পদ্ধতি: পক্ষান্তরে সমঝোতার সমস্ত পথ ও প্রচেষ্টা হতে ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যায়ে তারা উভয়ে যদি

www.islamijindegi.com

স্বেচ্ছায় বিবাহ বিচ্ছেদ করতে প্রস্তুত হয়ে যায় সে সুরতে শরিআত তাদের কে অবকাশ দিয়েছে।
এই ক্ষেত্রে সর্ব শেষ আয়াত

وان يتفرقايغن الله كلا من سعته

অর্থ-যদি শেষ পর্যায় মিলে মিশে থাকার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর পৃথক হতে চায় তবে পেরেশান হওয়ার কোন কারণ নেই। আল্লাহ তাআলা স্বীয় প্রচেষ্টা দ্বারা প্রত্যেক কে অমুখাপেক্ষী করে দিবেন। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা নিজ কুদরত দ্বারা নারীকে তার চাহিদা মত পাত্র দিয়ে আশ্রয়স্থলের ব্যবস্থা করে দিবেন এবং পুরুষকেও ভাল পাত্রীর ব্যবস্থা করে দিবেন। অতএব এহেন অবস্থায় তাদের পরস্পরের এই বিবাহ বিচ্ছেদকে ইস্যু বানিয়ে তাদের পরিবারগণ কলহ-বিবাদ বা হানা-হানিতে লিপ্ত হওয়া এটা সম্পূর্ণ অবাঞ্ছনীয় ও শরিআত পরিপন্থী কাজ।

তৃতীয় পদ্ধতি: তবে সমঝোতা না হওয়ার পর স্বামী যদি তালাক দিতে প্রস্তুত না হয় এবং স্বামী জুলুম করা থেকে ও বিরত না থাকে এবং স্ত্রী জুলুমে অনিষ্ট হয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ করতে ইচ্ছুক হয়। এমতাবস্থায় শরিআত স্ত্রী কে অনুমতি দিয়েছে যে, উক্ত জুলুম থেকে মুক্তি

লাভের জন্য স্বামী যদি তাকে তালাকের অধিকার দিয়ে থাকে তাহলে সেই বলে নিজের নফসের উপর এক তালাকে বায়েন গ্রহণ করে বিবাহ বিচ্ছেদ করবে, আর যদি স্বামী তাকে তালাকের অধিকার না দিয়ে থাকে তাহলে স্বামীকে খোলা করার প্রস্তাব করবে এবং খোলা তালাকের মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদ করবে।

যদি তাতেও স্বামী রাজী না হয় তবে একান্ত অপারগতার সময় মালেকী মাযহাব অনুযায়ী আমল করার অবকাশ রয়েছে। অর্থাৎ স্ত্রী উক্ত জালেম স্বামী থেকে বিবাহ বিচ্ছেদ করানোর অধিকার প্রাপ্ত হবে।

একান্ত অপারগতার সুরত দুটি হতে পারে

১। মহিলার ভরন-পোষণের কোন ব্যবস্থা যদি না থাকে অর্থাৎ উক্ত মহিলার খরচ বহন কারী কেউ না থাকে এবং সে নিজেও পর্দার সাথে কামাই রোজগার করার উপর সামর্থবান নয়।

২। যদি ও তার ভরন-পোষণের ব্যবস্থা হয়ে যায়। কিন্তু স্বামী থেকে পৃথক থাকার কারণে কোন গুনাহের মধ্যে লিপ্ত হওয়ার প্রবল ধারণা হয়। সেক্ষেত্রে বিবাহ বিচ্ছেদের সুরতটি হল মহিলা স্বীয় মুকাদ্দমা মুসলমান

বিচারক অথবা তাদের না থাকায় মুফতী বোর্ডের কাছে মুকাদ্দমা দায়ের করবে। মুফতী বোর্ড শরঈ সাক্ষীর ভিত্তিতে উক্ত বিষয়টি যাচাই করবে। যদি যাচাই দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মহিলার দাবী সত্য; স্বামী সামর্থবান থাকা সত্ত্বে ও স্ত্রীর ন্যায্য খোরপোষ আদায় করে না। তখন কাজী বা মুফতী বোর্ড স্বামীকে ডেকে বলবে হয়ত তুমি তোমার স্ত্রীর ন্যায্য অধিকার আদায় করে তাকে ভালভাবে রাখ, নতুবা তালাক দিয়ে দাও। যদি এগুলো না করো, তাহলে আমরা বিবাহ বিচ্ছেদ করে দিব। অতঃপর সে জালেম স্বামী যদি কোন সুরতের উপরও আমল না করে তাহলে কাজী বা মুফতী বোর্ড শেষ পর্যায় তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে তালাক দিয়ে দিবে। এই ক্ষেত্রে মালেকী মাযহাবের সমস্ত উলামায়ে কেরাম একমত যে, উক্ত অবস্থায় কোন সময় বা সুযোগের অপেক্ষা করা জরুরী নয়। অর্থাৎ যে কোন সময় বিবাহ বিচ্ছেদ করে দিবে এবং মহিলাটি তালাকের ইদ্দত (অর্থাৎ তিন হায়েয) পূর্ণ করে অন্য স্বামীর নিকট বিবাহ বসতে পারবে। এ ভাবে আল্লাহ চাহেতো তার দাম্পত্য জীবনের অশান্তির অবসান ঘটবে। উপরে উল্লেখিত বর্ণনা অনুযায়ী বিবাহ বিচ্ছেদ করানোর পদ্ধতি শরিআত

সম্মত। তবে অনেক সময় জনসাধারণ মুসলমান বিচারক বা মুফতী বোর্ডে মামলা দায়ের না করে নিজেরাই দাও ছুরি ধরিয়ে বা লাঠির ভয় দেখিয়ে স্বামী থেকে টিপসই বা দস্তখত নিয়ে নেয়। অথচ মৌখিক ভাবে তালাক শব্দ উচ্চারণ না করিয়ে শুধু টিপসই বা দস্তখত দ্বারা তালাক হবে না এবং তাদের এ পন্থাও শরীয়াতের দৃষ্টিতে খুবই গর্হিত কাজ। (সূত্র- হীলাতুন নাজেযাহ ১:৭৩)

প্রমাণপঞ্জি :

- 1 واذ تقول للذى انعم الله عليه ..... امسك عليك اى زينب بنت جحش وذالك انها كانت ذاحدة تفخر علي زيد لشرفها ويسمع منها ما يكره فجاء رضي الله عنه يوما اتي النبي فقال يارسول الله ان زينب قد اشتدعلي وانا اريد ان اطلقها فقال له عليه الصلاة والسلام امسك عليك واتق الله في امرها ولاتطلقها ضررا وتعللا يمكبرها واشتداد لسانها عليك – وتعديه امسك بعلي لتضمنه معني الحبس - روح المعاني ج 11 ص-35

-2 امسك عليك زوجك يعني زينب بنت جحش واتق الله في امرها فلا تطلقها فان الطلاق من ابغض المباحات – التفسير المظهرى ج7ص346

-3 قال تبارك وتعالي – الرجال قوامون علي النساء بمافضل الله بعضهم علي بعض وبماانفقوا من اموالهم فالصلحت قنتت حفظت للغيب بماحفظ الله ولتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا وان خفتم شقاق بينهما فابعثواحكمامن اهله وحكمامن اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا – سورة النساء – 35

-4 وعارشوهن بالمعرف اى بالانصاف في الفعل واداء الحقوق والاحسان في القول عطف علي لاتعضلو او لايحل لكم .....

ولا تفارقوهن ولاتضاروهن ..... فعسي ان تكرهوا شيئاويجعل الله فيه في ذالك خيرا كثيرا يعني ثوابا جزيلا – التفسير المظهرى ج2ص50

-5 عن ثوبان رض عن النبي قال – ايما امرئة سألت زوجها طلاقها من غيرباس فحرام عليها رائحة الجنة – رواه ابوداؤد (2226)

– 6 عن عمروبن الاحوص الحبشي سمعت رسول الله في جحة الوداع يقول بعد ان حمد الله ..... ثم قال الا! واستوصوا بالنساء خيرا فانما هن عوان عندكم – ليس تملكون منهن شيئا غيرذالك الا! ان يأتين بفاحشة مبية فان فعلن فاهجروهن في المضاجح واضربوهن ضرباغير مبرح فان اطعنكم فلا تبغلوا عليهن سبيلا اخ رواه الترمذى (1163)

ولابأس به عند الحاجة للشقاق – قوله للشقاق اى لوجود الشقاق وهو الاختلاف والتخاصم – وفي القهستاني عن شرح الطحاوى – النسة اذاوقع بين الزوجين اختلاف ان يجتمع اهلمها لبصلحوا بينهما وان لم يصلحا جاز الطلاق والخلع ان يجتمع اهلهما ليصلحوا بينهما وان لم يصطلحا جاز الطلاق والخلع - الدر المختار مع رد المحتارج3ص441

www.islamijindegi.com

খতমে কুরআনের

বিনিময় গ্রহণ করার বিধান

মুফতী মনসূরুল হক

www.darsemansoor.com
www.islamijindegi.com

কুরআন খতম করে তার বিনিময় গ্রহণ করা সম্পর্কে শরী'আতের বিধান

সংকলনে
মুফতী মনসূরুল হক
প্রধান মুফতী ও শাইখুল হাদীস
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া
সাত মসজিদ মাদরাসা
মোহাম্মাদপুর,ঢাকা

মাকতাবাতুল মানসূর
প্রথম সংস্করণঃ
জুলাই ২০১১ ইং
শাবান ১৪৩২ হিজরী

মূল্যঃ ৪০ টাকা মাত্র।

www.darsemansoor.com
www.islamijindegi.com

www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com

সূচিপত্র

বিষয়	পৃঃ
* সাধারণভাবে ইবাদত বন্দেগী ৩ প্রকার	৫
* দ্বিতীয় প্রকার ইবাদত আবার দুই ভাগে বিভক্ত	৭
* খতম ও জিয়ারতের উজরতের মীমাংসা	৮
* মরহুম মাওলানা সাহেবের কিতাবের ৫নং পৃষ্ঠা	৯
* মরহুম লেখক তার বইয়ের ৫নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন	১৩
* ১ম ভাগের ইবারতের জবাব	১৪
* মরহুম লেখক তার বইয়ের ৮নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন	১৭
* মরহুম লেখক তার বইয়ের ৯নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন	১৮
* মরহুম লেখক তার বইয়ের ১০ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন	১৯
* মরহুম লেখক তার বইয়ের ১২ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন	২১
* মরহুম লেখক তার বইয়ের ১২ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন	২৩
* মরহুম লেখক তার বইয়ের ১০৩ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন	২৩
* মরহুম লেখক তার বইয়ের ১০৬ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন	২৩
* মরহুম লেখক তার বইয়ের ১১৯ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন	২৬
* পরিশিষ্ট	৩০

باسمه تعالى

প্রথম অধ্যায়

কুরআন খতম করে বিনিময় গ্রহণ করা সম্পর্কে শরী'আতের বিধান

সাধারণভাবে ইবাদত বন্দেগী ৩ প্রকার। যথাঃ

১. মাকাসিদ তথা খালিস ও মূল ইবাদত। যেমনঃ নামায, রোযা, হজ্ব ও সওয়াবের উদ্দেশ্যে কুরআন তিলাওয়াত, যিকির-আযকার ও দু'আ-দুরুদ ইত্যাদি।

এই প্রকার তথা মাকাসিদ জাতীয় ইবাদত করে তার বিনিময় নেয়া দেয়া সর্ব সম্মতভাবে হারাম। (ফাতাওয়ায়ে শামী, ৬:৫৫-৫৮; আল-মুগনী, ৫:২৩; আল-মুদাওয়ানাতুল কুবরা, ৩:৪৩১; ফাতাওয়ায়ে রশীদিয়া, ৪১৭ পৃ.)

২. ওয়াসাইল তথা সহায়ক পর্যায়ের ইবাদত। যেমনঃ ইমামতি, আযান, ইকামত, দ্বীনি শিক্ষা দান, ওয়াজ-নসীহত ইত্যাদি।

দ্বিতীয় প্রকার ইবাদত আবার দুই ভাগে বিভক্তঃ

(ক) যে সকল ইবাদত ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাতে মুআক্কাদাহ এবং শিয়ারে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত দ্বীনের স্থায়িত্ব তার ওপরে নির্ভরশীল বিধায় তার বিনিময় গ্রহণ ও প্রদান অন্যান্য মাযহাবে জায়িয থাকলেও হানাফী মাযহাবের আলেমগণ জরুরতের কারণে শরী'আতের বিশেষ উসূলের ভিত্তিতে বিশেষ কতক সহায়ক পর্যায়ের ইবাদতের বিনিময় গ্রহণ প্রদানকে বৈধ বলেছেন। ফিকাহবিদগণ সে সকল ইবাদতকে চিহ্নিত করেছেন। সেগুলো হলঃ ফরয ও ওয়াজিব নামাযের ইমামতি, আযান, ইকামত, দ্বীনি শিক্ষাদান ইত্যাদি।

(খ) যে সকল ইবাদত ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাতে মুআক্কাদাহ এবং শিয়ারে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত দ্বীনের স্থায়িত্ব তার ওপরে নির্ভরশীল নয় যথাঃ খতমে তারাবীতে কুরআন শুনানো, মৃত ব্যক্তিকে সাওয়াব পৌঁছানোর জন্য খতম পড়া ইত্যাদি।

এ প্রকার ইবাদতের বিনিময়ের লেনদেনে হারাম হওয়ার বিষয়টা শরী'আতের সকল প্রকার দলীল অর্থাৎ কুরআন, হাদীস, ইজমা এবং কিয়াস দ্বারা সুপ্রমাণিত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত। এজন্য কোন কালে কোন মাযহাবের কোন নির্ভরযোগ্য আলেম-ফকীহ এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেননি। (ফাতাওয়া রশিদিয়া, ৩২৪; ইমদাদুল ফাতাওয়া, ১:৪৮৪; ইমদাদুল মুফতীন, ৩১৫; ইমদাদুল আহকাম, ৩:৫১৭; আহসানুল ফাতাওয়া, ৩:৫১৪; মাহমুদিয়া, ৮:২৪৭)

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ. বলেন, এ ব্যাপারে (সওয়াব রেসানীর উদ্দেশ্যে কুরআন তিলাওয়াত করে বিনিময় লেনদেন নাজায়িয হওয়ার ব্যাপারে) কুরআন, হাদীস, ইজমা, কিয়াস সব দলীলই বিদ্যমান আছে। (ফাতাওয়ায়ে শামী, ৬:৫৫-৫৮; আল-মুগনী, ৫:২৩; আল-মুদাওয়ানাতুল কুবরা ৩:৪৩১; ফাতাওয়া রশীদিয়া, ৪১৭ পৃ.)

৩. রুকইয়াতঃ তথা বালা-মুসীবত থেকে পরিত্রাণ, রোগ মুক্তি, ব্যবসায় উন্নতি ইত্যাদি দুনিয়াবী উদ্দেশ্যে দু'আ, খতম, ঝাড়-ফুঁক, তাবীয-কবয ইত্যাদি।

এই তৃতীয় প্রকার ইবাদতের বিনিময় গ্রহণ করা সর্বসম্মতভাবে জায়িয। (রদ্দুল মুহতার, ৬:৫৫-৫৮, আল মুদাওয়ানাতুল কুবরা, ৩:৪৩১, ফাতাওয়া রশিদিয়া, ৪১৭)

কুরআন

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, তুচ্ছ মূল্যে তোমরা আমার আয়াতসমূহকে বিক্রি কর না। (সূরা বাকারা:৪১) তবে এর অর্থ নয় যে, বেশি মূল্যে বিক্রি করা যাবে। কারণ গোটা পৃথিবীর মূল্য একেবারেই সামান্য, এমনকি আল্লাহর নজরে এর মূল্য মশা-মাছির একটি পাখর সমতুল্যও নয়।

হাদীস

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা কুরআন পড়, তবে তার দ্বারা বিনিময় গ্রহণ কর না। (মুসনাদে আহমাদ ৩:৩৫৭; হাদীস নং ১৫৫৩৫)

২. সাহাবী হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রা. সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি একবার এক বক্তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যে কিনা কুরআন পড়ে মানুষের নিকট সাওয়াল করেছিল। তিনি এই অবস্থা দেখে ইন্নালিল্লাহ...পড়লেন এবং বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে কুরআন পড়ে সে যেন আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে। শীঘ্রই কিছু লোকের আবির্ভাব হবে যারা কুরআন পড়ে মানুষের কাছে ভিক্ষা চাইবে। (তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ২৯১৭)

৩. হযরত বুরাইদা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি মানুষের কাছ থেকে খাবার গ্রহণের উদ্দেশ্যে কুরআন পড়বে, কিয়ামতের দিন সে এমন অবস্থায় আসবে যে, তার চেহারায় কোন গোশত থাকবে না, শুধুমাত্র হাড় থাকবে। (বাইহাকী, হাদীস নং ২৬২৫)

অর্থাৎ যারা দুনিয়া অর্জনের জন্য কুরআন পড়বে পরকালে তাদের কোন অংশ নেই। চেহারায় গোশত না থাকার অর্থ হল, যে ব্যক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ জিনিষকে নিকৃষ্ট বিষয় অর্জন করার জন্য ব্যয় করল আল্লাহ তা'আলা তার সর্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ চেহারাকে বিকৃত করে দেবেন।

ইজমা

সকল উম্মত এ ব্যাপারে একমত যে, নিয়ত ছাড়া আমল দ্বারা সওয়াব লাভ করা যায় না। আর আলোচ্য বিষয়ে সাওয়াবের নিয়ত অনুপস্থিত কেননা এক্ষেত্রে পড়নে ওয়ালার নিয়ত হল বিনিময় গ্রহণ করা। তাই তো টাকা ছাড়া তিলাওয়াত করতে বলা হলে উক্ত তিলাওয়াতকারী রাজী হবে না। ফলে তার দ্বারা সওয়াব লাভ হবে না। সুতরাং এর ইজারাই সহীহ হবে না।

কিয়াস

কিরাআত ইবাদতে মাহযা তথা শারীরিক ইবাদত হওয়ার দিক দিয়ে নামায, রোযার মত। সুতরাং নামায রোযার বিনিময় যেমন জায়িয নেই। তদ্রুপ কিরাআতের বিনিময় জায়িয হবে না। (রাসায়েলে ইবনে আবিদীন, ১:১৮২)

কুরআন হাদীস, ইজমা এবং কিয়াস দ্বারা সুপ্রমাণিত এ বিষয়ে কোন কালে কোন আলেম-ফকীহ দ্বিমত পোষণ করেননি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

“খতম ও জিয়ারতের উজরতের মীমাংসা” নামক বইয়ের মুখোশ উন্মোচন

অধুনা কিছু লোক নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য সুপ্রমাণিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত এ সত্যকে অস্বীকার করে সওয়াব রেসানির উদ্দেশ্যে কুরআন খতম ও তিলাওয়াতের বিনিময় লেন-দেনকে জায়িয বলে ফাতাওয়া দিয়ে সাধারণ মুসলমানদের বিভ্রান্ত করছে এবং নিজেদের ফাতাওয়ার স্বপক্ষে মূল কিতাব থেকে কাট ছাট করে কিছু কিছু লেখা ছেপেও বিলি করছে।

কিছুদিন পূর্বে জনৈক মাওলানা রুহুল আমীন সাহেব খতম ও জিয়ারতের উজরতের মীমাংসা নামে একটি বই দাঁড় করিয়েছেন এবং নিজের দাবীর স্বপক্ষে অর্ধশতাধিক ভুয়া দলীলের বাহার দেখিয়ে সাধারণ মুসলমানদের গোলক ধাঁধাঁয় ফেলার অপচেষ্টা করেছেন। কিন্তু শরয়ী মূলনীতির আলোকে সে সব দলীলের চুলচেরা বিশ্লেষণ করলেও সেগুলোর অশুদ্ধতা ও অসারতা অবাস্তবতা ধরা পড়ে যায়।

আমরা উক্ত দলীলগুলো পরখ করার জন্য তিনভাবে বিশ্লেষণ করব।

ক. হাওয়ালা বা উদ্ধৃতি যাচাই করে।

খ. উদ্ধৃত গ্রন্থের মান নির্ণয় করে।

গ. উদ্ধৃত দলীল-প্রমাণ পর্যালোচনা করে।

নিম্নে উক্ত কিতাবের দলীলগুলোর মধ্য থেকে পাঠকদেরকে দীর্ঘসূত্রিতা থেকে বাঁচানোর লক্ষ্যে- কয়েকটি দলীলের বিশ্লেষণ করা হল। বাকীগুলোর জবাব পরবর্তীতে আগ্রহী পাঠকদের জন্য প্রকাশ করা হবে। ইনশাআল্লাহ।

১. মরহুম মাওলানা তার কিতাবের ৫নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন

(৩) বাহারোর রায়েক ৫/২২৮ পৃষ্ঠা

ان المفتى به جواز الأخذ على القرائة.

"কুরআন পড়িয়া বেতন গ্রহণ করা জায়েয হওয়া ফাতাওয়াগ্রাহ্য মত।"

ক. হাওয়ালার বাস্তবতাঃ

বাহরোর রায়েক নামের কোন কিতাব নেই। হ্যাঁ! আল বাহরুর রায়েক নামে যয়নুদ্দীন ইবনে নুজাইম রহ. এর কিতাব আছে। সুতরাং উদ্ধৃত গ্রন্থের নামের মধ্যেই ভুল করেছেন। আল বাহরুর রাইক কে বাহরোর রায়েক বলা যেত কত বড় ভুল তা আরবী ভাষা সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিও বুঝতে পারবেন। সে ক্ষেত্রে একজন সংকলক থেকে আমরা এ ধরনের ভুল আশা করতে পারি।

খ. উদ্ধৃত গ্রন্থের মান

ইবনে নুজাইম রহ. (মৃত্যু ৯৭০ খৃ.) কৃত আলবাহরুর রাইক ফিকহে হানাফীর একটি নির্ভরযোগ্য কিতাব। الأشباه النظائر এর মুহাক্কিক আল্লামা ইউসুফ তাওলূভী সাহেব বলেনঃ

فقد شرحه (الكنـــز) شرحا فجمع واوعى واكثر من النقول فاغنى (مقدمة المحقق للاشباه صـــ ১৩مكتبة فقيه الامة كشف الظنون(২:১৫১৫)

তবে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থের সব বর্ণনাই যে গ্রহণযোগ্য হতে হবে এ রকম কোন কথা নেই। বরং وكل احديؤخذ بقوله و يرد প্রত্যেক ব্যক্তির কথা যেমন গ্রহণ করা হয়, তেমনি তার কিছু কথা প্রত্যাখ্যানও করা হয়। (আসারুল হাদীস:১২৭ পৃষ্ঠা)

গ. জবাব ও পর্যালোচনা

আলবাহরুর রাইকের উক্ত উদ্ধৃতি সম্পর্কে ঐ কিতাবের টীকাতেই উল্লেখ আছে যে, ইবারতটি যথাস্থানে ব্যবহৃত হয়নি। কারণ মুফতা বিহী (ফাতাওয়াযোগ্য) বর্ণনা হল, কুরআন শিক্ষা দেওয়ার বিনিময় গ্রহণ করা তো জায়িয, কিন্তু তিলাওয়াত করার বিনিময় গ্রহণ করা জায়িয নেই।

قال : فقوله فان المفتى به جواز الأخذ على القرائة ليس في محله لأن المفتى به جوازه على التعليم لاعلى القراءة المجردة كما مر. حاشية البحر الرائق৫:৩১৮

"কুরআন তিলাওয়াত করে বেতন গ্রহণ করা জায়েয হওয়া ফাতাওয়াযোগ্য মত" এ বক্তব্যটি স্বস্থানে ব্যবহৃত হয়নি। কেননা ফাতাওয়াযোগ্য মত হল কুরআন

শিক্ষা দিয়ে বিনিময় গ্রহণ করা জায়িয, তিলাওয়াত করে নয়। (আল বাহরুর রাইক টীকা, ৫:৩৮১)

বরং উক্ত ইবারতের ভুলের ওপর স্বয়ং আল বাহরুর রাইকের অপর দুটি বর্ণনা প্রমাণ বহন করে।

(১)قال في كتاب الحج باب الحج عن الغير مانصه : و لم أر حكم من أخذ شيئا من الدنيا يجعل شيئا من عبادته للمعطى. وينبغي ان لايصح ذلك. البحر الرائق١٠٦ : ٣

অর্থঃ নিজের ইবাদতের কোন অংশ অপরকে দান করার শর্তে যে ব্যক্তি পার্থিব কোন বিনিময় গ্রহণ করে তার বিধান আমি দেখিনি। তবে জায়িয না হওয়াই সমীচীন। (আল বাহরুর রাইক ৩:১০৬)

(২)وقال في كتاب الوصايا. باب الوصية بالخدمة والسكنى مانصه : وإذا أوصى ان يدفع الى انسان كذا من ماله ليقرأ القران على قبره فهذه الوصية باطلة. قال ان كان القارى معينا ينبغي ان يجوز الوصية له على وجه الصلة دون الآخر قال ابونصر : وكان يقول : لامعنى لهذه الوصية. لان هذا بمنـــزلة الأجرة والاجارة في ذلك وهو بدعة و لم يفعلها احد الخلفاء. البحر الرائق٣٠٢/٨ :

অর্থঃ কবরের নিকটে কুরআন পড়ার উদ্দেশ্যে কেউ যদি কাউকে তার কিছু মাল দেয়ার অসিয়ত করে যায় তাহলে সে অসিয়ত বাতিল গণ্য হয়। তিনি আরো বলেন, যদি কুরআন পাঠকারী নির্দিষ্ট হয়ে থাকে তাহলে তার জন্য কৃত অসিয়তটি হাদিয়া হিসাবে জায়িয হওয়ার কথা; তিলাওয়াতের বিনিময় হিসাবে নয়। আবু নস্র রহ. বলেন, এ ধরনের অসিয়ত নিরর্থক, কেননা এটা পারিশ্রমিক ও ইজারার পর্যায় আর তা বিদ` আত। তাছাড়া খুলাফায়ে রাশেদীনের কেউ এমন করেননি। (আল বাহরুর রাইক, ৯:৩২)

আল্লামা শামী রহ. বলেন, কিতাবুল হজ্বের এই উক্তিটিই সহীহ, নির্ভরযোগ্য এবং যুক্তিযুক্ত। (শিফাউল আলীল রসায়েল, ১:১৬৭)

সুতরাং একই কিতাবের তিনটি উক্তি থেকে শুধু একটিকে গ্রহণ করে তার উদ্ধৃতি দেওয়া আর বাকী দুটি থেকে চোখ ফিরিয়ে নেওয়া দুই কারণে হতে পারে।

১. হয়ত অপর দুটি জনাব সংকলক অবগত হতে পারেনি, ফলে তার ক্ষেত্রে আরবী প্রবাদ বাক্য حفظت شيئا وغابت عنك الأشياء অর্থাৎ "তুমি কিছু কথা মনে রেখেছ, কিন্তু অধিকাংশ কথা সম্পর্কে বেখবর রয়েছ" প্রয়োগ হতে পারে।

২. অথবা অবগত হয়েও তা গ্রহণ করেন নাই। এটা একটা হটকারিতা এবং হারামকে হালাল করার অপচেষ্টা। আর শরঈ ব্যাপারে এ রকম করা মারাত্নক অন্যায়।

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ. বলেন, কোন কোন মাস` আলা সম্পর্কে ২০টি কিতাবে একই ধরনের বক্তব্য পাওয়া যায়। অথচ বুনিয়াদী কিতাবের আলোকে ঐ মাস` আলা ভুল। তন্মধ্যে শুধু তিলাওয়াত করে (অর্থাৎ শিক্ষাদান ব্যতীত) বিনিময় গ্রহণ করার মাস` আলা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সর্বপ্রথম আস সিরাজুল ওয়াহহাজ এবং আল জাওহার এর সংকলক কুরআন তিলাওয়াতের বিনিময় গ্রহণ করার কথা উল্লেখ করেছেন। অনেক লেখক ও সংকলক তাদের অনুসরণ করে ভুলের শিকার হয়েছেন।

আমাদের তিন ইমাম হযরত আবু হানীফা, আবু ইউসুফ এবং মুহাম্মাদ রহ. এর ঐক্যমত্য হল, ইবাদতের (চাই মাকসূদা হোক যেমন, নামায, রোযা বা গায়ের মাকসূদা হোক যেমন, ফরজ নামাযের ইমামতি, দ্বীনের শিক্ষকতা করা) বিনিময় গ্রহণ করা নাজায়িয। পরে পরবর্তী উলামায়ে কেরাম জরুরত ও দ্বীনের স্থায়িত্বের কারণে শরী'আতের বিশেষ উসূল বা মূলনীতির ভিত্তিতে কয়েকটি ইবাদতে গায়র মাকসূদার বিনিময় গ্রহণ জায়িয বলে ফাতাওয়া দিয়েছেন। আর শুধু তিলাওয়াতের মধ্যে দ্বীনের স্থায়িত্ব বা কোন জরুরত নেই। কারণ যুগ যুগ ধরে যদি কোন ব্যক্তি কাউকে নির্দিষ্ট বিনিময়ে তিলাওয়াতের জন্য ভাড়া না নেয় তাহলে এতে দ্বীনের কোন ক্ষতি হবে না। (শরহু উকূদি রসমিল মুফতী, ৬২ পৃষ্ঠা)

২. মরহুম লেখক তার বইয়ের ৫নং পৃষ্ঠায় লিখেছেনঃ

(৫) আশবাহোন্নাজায়েরের টীকা, ২৭৫ পৃষ্ঠা

الثالثة لو شرط على ان يقرأ على قبره قالتعيين باطل. قوله الثالثة لوشرط على ان يقرأ على قبره الخ هكذا وقع في القنية. وهو كما في البحر مبني على قول أبي حنيفة رحـــ من كراهة القراءة على القبور فلذا بطل التعيين والصحيح المختار للفتوى قول محمد انتهى. وفي مجمع الفتاوى : الوصية بالقراءة على قبره باطلة ولكن هذا اذا لم يعينه القارى اما اذا عينه ينبغي ان يجوز على وجه الصلة ويفهم منه ان الوصية بالقراءة انما بطلت لعدم جواز الاجارة على القراءة ينبغي ان تكون صحيحة على المفتى به من جواز الاجارة على الطاعة كما هو مذهب عامة علماء المتأخرين انتهى.

"তৃতীয় এই যে, যদি সে শর্ত করে যে, তার গোরের নিকট কুরআন পড়িবে। তবে (এইরূপ স্থান) নির্দেশ করা বাতিল। আশবাহ এর লেখক উল্লিখিত কথা লিখিয়েছেন, উহা কিনয়া কিতাবে আছে। বাহরোর রায়েক প্রণেতার মতে উহা

(ইমাম) আবু হানীফা রহ. এর মতানুযায়ী বলা হয়েছে, উহা এই যে, গোরসমূহের নিকট কুরআন পড়া মাকরূহ। এই হেতু স্থান নির্দেশ করা বাতিল হইবে। (ইমাম) মুহাম্মাদের মত ছহিহ ও ফাতাওয়ার উপযুক্ত। বাহরোর রায়েকের কথা শেষ।

মাজমায়োল ফাতাওয়াতে আছে, নিজের গোরের নিকট কুরআন পড়ার অসিয়ত বাতিল, যদি সে ব্যক্তি কোন ক্বারীকে নির্দিষ্ট না করিয়া থাকে তবে এইরূপ ব্যবস্থা। আর যদি উহা নির্দেশ করিয়া থাকে, তবে দানভাবে জায়েয হওয়া উচিত। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, কুরআন পড়িয়া বেতন গ্রহণ করা নাজায়েয হওয়ার রেওয়ায়েত অনুসারে কুরআন পড়ার অসিয়ত করা বাতিল বলা হয়েছে। ফাতাওয়াগ্রাহ্য মতে ইবাদাত করিয়া বেতন গ্রহণ করা জায়েয, ইহা জামানার অধিক সংখ্যক আলেমের মত, এই হিসাবে উক্ত অসিয়ত জায়েয হবে।" মাজমায়োল ফাতাওয়ার কথা শেষ। আরও উক্ত পৃষ্ঠা-

وفي شرح المنظومة لابن الشحنة نقلا عن مآل الفتاوى فيمن أوصى ان يطين قبره او تضرب عليه قبة او يدفع شيء لقارئ يقرأ على قبره قالوا الوصية باطلة انتهى. قال في البحر : فدل على ان المكان لايتعين وقد تمسك به بعض الحنفية من اهل العصر وفيه ان صاحب الاختيار علله بان أخذ شيء للقراءة لا يجوز لأنه كالأجرة فأفاد أنه مبني على غير المفتى به فان المفتى به جواز الأخذ على القراءة فيتعين المكان قال بعض الفضلاء : والذى ظهر لي انه مبني على قول الإمام ابي حنيفة رحـــ بكراهة القراءة عند القبر فلهذا بطل التعيين والفتوى على قول محمد رحـــ من عدم الكراهة عنده كما في الخلاصة فيلزم التعيين انتهى فعلم من هذا ان قول المصف هنا فالتعيين باطل ضعيف.

এবনোশ নেহনার শরহে মনজুমাতে মায়ালোল ফাতাওয়া হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে যে, ব্যক্তি অসিয়ত করে যে, যেন তাহার গোর মৃত্তিকা দ্বারা লেপন করা হয়। তাহার গোরের উপর গুম্বুজ (চূড়া) স্থাপন করা হয় কিংবা একজন ক্বারীকে কিছু দান করা হয় যে, তাহার গোরের নিকট কোরান পড়ে, তাহার ব্যবস্থা কী?

বিদ্বানগণ বলিয়াছেন, এইরূপ অসিয়ত বাতিল, উক্ত কিতাবের মর্ম শেষ হইল। বাহারোর রায়েক প্রণেতা বলিয়াছেন, উক্ত কথায় বুঝা যায় যে, স্থান নির্দিষ্ট হইবে না (আমার) সমসাময়িক কোন হানাফী বিদ্বান এই রেওয়ায়েতটা দলীলরূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

আরও উক্ত কিতাবে আছে, এখতিয়ার প্রণেতা উক্ত অসিয়ত নাজায়েয হওয়ার এই কারণ নির্ধারণ করিয়াছেন যে, কুরআন পাঠ করিয়া কিছু গ্রহণ নাজায়েয, যেহেতু উহা বেতন স্বরূপ। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, ফাতাওয়ার বিপরীত মতের হিসাবে উহা বলা হইয়াছে। কেননা কুরআন পড়িয়া কিছু বেতন গ্রহণ ফাতাওয়ার মতে জায়েয হইবে। কাজেই (অসিয়তের হিসাবে) স্থান নির্দেশ হইবে। কোন

ফাজেল বলিয়াছেন, আমার পক্ষে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে উহা এই যে, ইমাম আবু হানীফা রহ. এর এই মতানুসারে বলা হইয়াছে যে, গোরের নিকট কুরআন পাঠ করা মাকরূহ। এই হেতু স্থান নির্দেশ করা বাতিল হইয়াছে। মুহাম্মাদ রহ. এর মতে গোরের নিকট কুরআন পড়া মাকরূহ নহে। এই মতের উপর ফাতাওয়া হইবে। ইহা খোলাসা কিতাবে আছে। এই হিসাবে স্থান নির্দেশ করা জরুরী হইবে। তাহার কথা শেষ হইল।

হামাবী রহ. বলিয়াছেন, ইহাতে বুঝা গেল যে, আশবাহ লেখকের এই স্থানের এই কথা যে, স্থান নির্দেশ করা বাতিল হইবে। ইহা দুর্বল মত।

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা গেল যে, আল্লামা হামাবী কুরআন পড়িয়া বেতন গ্রহণ করা নাজায়েয হওয়ার মত জঈফ (দুর্বল) সাব্যস্ত করিয়াছেন।

ক. হাওয়ালার বাস্তবতা

কিতাবের নাম মূলত 'আল আশবাহ ওয়ান নাযায়ির' আশবাহোন্নাজায়ের লেখা ভুল। যা আরবী ব্যাকরণ সম্পর্কে সামান্য জ্ঞানও যার আছে তার নিকট সুস্পষ্ট। সেক্ষেত্রে একজন সংকলকের নিকট ইহা অস্পষ্ট থাকা কাম্য নয়।

দ্বিতীয়তঃ হাওয়ালায় বর্ণিত ইবারতটি উক্ত কিতাবের যত নুসখা (ছাপা) আমাদের কাছে আছে তার কোন সংস্করণের ২৭৫ নং পৃষ্ঠা নেই। তবে ইদারাতুল কুরআন পাকিস্তান থেকে ছাপা নুসখার ২/১০৭ নং পৃষ্ঠায় পাওয়া গেছে।

খ. উদ্ধৃত গ্রন্থের মান

নুয়াইম আশরাফ নূর মুহাম্মাদ সাহেব দা.বা. বলেন,

هو احمد بن محمد الحسى الحموى الحنفى (شهاب الدين) عالم مشارك فى في انواع من العلوم درس بالقاهر، من تصانيفه الكثيرة غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر لابن نجيم. مقدمة الناشر للاشباه صـــ٢١

অর্থাৎ তিনি হচ্ছেন আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আল হাসানী আল হামাভী আল হানাফী রহ. (মৃত্যু ১০৯৮ হিজরী) ইলমের বিভিন্ন বিষয়ে বা বিভিন্ন প্রকার ইলমে পারদর্শী একজন আলিম। তিনি কায়রোতে অধ্যয়ন করেছেন। তার বিপুল গ্রন্থভান্ডারের অন্যতম হল, আল আশবাহ ওয়ান নাযায়ির কিতাবের ব্যাখ্যা গ্রন্থ, যার নাম, غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر.

তবে এই কিতাব ব্যাখ্যাগ্রন্থ হিসাবে সুন্দর হলেও ফাতাওয়ার কোন কিতাব নয়। এজন্য ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন এর কোন বর্ণনা অন্য কোন ফাতাওয়ার কিতাবের সাথে মিলানো ছাড়া গ্রহণ করা যাবে না। (উসূলুল ইফতা, ১১৬)

গ. জবাব ও পর্যালোচনা

আলোচনার সুবিধার্থে উল্লেখিত ইবারতকে দুই ভাগে ভাগ করে জবাব দেয়া হচ্ছে।

১.وفي مجمع الفتاوى الوصية بالقرائة على قبره باطلة থেকে

كما هو مذهب عامة علماء المتاخرين انتهى পর্যন্ত।

২. পূর্বাপর বাকী ইবারতগুলো।

দ্বিতীয় ভাগের পুরো ইবারত পিছনের আল বাহরুর রাইকের বর্ণনার উপর নির্ভরশীল বা তার সদৃশ। আর আল বাহরুর রাইকের ইবারতের বিস্তারিত জবাব ৩নং হাওয়ালার জবাবের অধীনে চলে গেছে।

নিম্নে শুধু ১ম ভাগের ইবারতের জবাব প্রদত্ত হলঃ

আলোচ্য ইবারতের দাবী ২টি

১. কেউ যদি কবরে কুরআন তিলাওয়াত করার অসিয়ত করে, তাহলে ক্বারী নির্ধারিত হলে তার বিনিময় দান বা উপঢৌকন হিসাবে জায়িয।

২. ক্বারী নির্ধারিত না হলে অসিয়ত বাতিল হলেও ইবাদতের উজরত হিসাবে তা জায়িয হবে। যেমন পরবর্তী উলামায়ে কেরামের মাযহাব হল, ফাতাওয়াযোগ্য বর্ণনা মতে ইবাদতের উজরত জায়িয।

১ম দাবীর জবাব

এক্ষেত্রে তিলাওয়াতের বিপরীতে প্রদত্ত বস্তুকে মুখে দান বা উপঢৌকন বলা হলেও বাস্তবে তার উদ্দেশ্য থাকে বিনিময়। অন্যথায় ক্বারীর জন্য কুরআন তিলাওয়াত না করারও অবকাশ থাকত। অথচ যদি অসিয়তকারী অসিয়তের পূর্বে ইহা জানতে পারে তাহলে সে এ ক্বারীর জন্য অসিয়তই করবে না। যার দলীল নিম্নে প্রদত্ত হলঃ

قال ابن عابدين الشامي : ولايخفى عليك عدم ارادة الصلة في عرفنا والالجاز للقارى ترك القراءة مع ان من يوصى له في زماننا لايوصى الا في مقابلة قرائته وذكره وتسبيحه ولو علم بان القارى الموصى له لايفعل ذلك لما اوصى ومن جهل باهل زمانه فهو جاهل. شفاء العليل من رسائل ابن عابدين১/১৬৮

وفي التاترخانية : لامعنى لهذه الوصية ولصلة القارى بقرائته لأن هذا بمنزلة الأجرة والإجارة في ذلك باطلة وهي بدعة ولم يفعلها أحد من الخلفاء. قال العلامة الشامي : و ما في التاترخانية فيه رد على من قال : لو أوصى لقارئ يقرأ بكذا على قبره ينبغي أن يجوز على وجه الصلة دون الأجر وممن صرح بطلان هذه الوصية صاحب الولواجية والمحيط والبزازية كما في رد المحتار৬/৫৬

وقال الولوالجي : ولو زار قبر صديق او قريب له وقرأ عنده شيئا من القران فهو حسن. اما الوصية بذلك فلامعنى لها ولامعنى ايضا لصلة القارى لان ذلك يشبه استئجاره على قرائة القران وذلك باطل و لم يفعل مثل ذلك احد من الخلفاء اه الفتاوى الولوجية ৬/৩৩৬ : كتاب الوصايا.

২য় দাবীর জবাব

ইবাদতের বিনিময় গ্রহণ জায়িয হওয়াকে এখন পরবর্তী উলামায়ে কেরামের মাযহাব বলা হয়েছে। অথচ তারা ব্যাপকভাবে সব ইবাদতের উজরত বা বিনিময় গ্রহণকে জায়িয বলেন নাই। বরং শুধু মাত্র ঐ সব ইবাদতে গায়ের মাকসূদার উজরতকে জায়িয বলেছেন যেগুলোর ওপর দ্বীনের স্থায়িত্ব নির্ভরশীল। যেমন আযান, ইকামত, ইমামত, দ্বীনি শিক্ষা দান ইত্যাদি। কবরের নিকটে তিলাওয়াত অথবা সওয়াব রেসানীর উদ্দেশ্যে তিলাওয়াতের ওপর দ্বীনের স্থায়িত্ব নির্ভরশীল নয়। যুগ যুগ ধরে যদি কোন ব্যক্তি কাউকে নির্দিষ্ট বিনিময়ে তিলাওয়াতের জন্য ভাড়া না নেয় তাহলে দ্বীনের বা শরীয়াতের কোন ক্ষতি হবে না।

قال الشيخ الرملي : قال في التاترخانية : وقد ذكرنا مسئلة تعليم القران على استئجار للضرورة ولاضرورة في الاستئجار على القبر. رد المحتار৬/৫৬

وقال في شرح عقود رسهم المفتي وقد اطبقت المتون والشروح والفتاوى على نقلهم بطلان (الإستئجار على الطاعات) الا فيما ذكر وعللوا ذلك بالضرورة وهي خوف ضياع الدين وصرحوا بذلك التعليل فكيف يصح أن يقال إن مذهب المتأخرين (صحة الاستئجار على التلاوة المجردة) مع عدم الضرورة المذكورة. فانه لومضى الدهر و لم يستأجر أحد أحدا على ذلك لم يحصل به ضرر بل الضرر صار في الاستجار عليه. حيث صار القرآن مكسبا وحرفة يتجربها وصار القارى منهم لايقرأ شيئا لوجه الله تعالى خالصا. بل لايقرأ الا للأجرة وهو الرياء المحض الذى هو ارادة العمل لغير الله تعالى فمن اين يحصل له الثواب الذى طلب المتسأجر أن يهديه لميته؟ شرح عقود رسم المفتي صـــ৬৬

তাছাড়াও এ অসিয়তে ইয়াতীম, ফকীর, অসহায় দরিদ্র এবং বিধবা ওয়ারিশদের মালগ্রহণ ও ব্যবহার সহ বহু গুনাহের কাজ বিদ্যমান আছে। সুতরাং তা জায়িয হওয়ার কোন প্রশ্নই আসে না। (রাসায়েলে ইবনে আবেদীন, ১:১৭২)

قال وفي هذه الوصايا زيادة على ماذكرته من الشناعات اعتقاد المنكر من اعظم القربات وكثيرا مايكون الحامل عليها بعض الورثة والأقارب مع مايترتب عليها من المثالب من أخذ أموال اليتامى القاصرين وفقراء الورثة المحتاجين فان هذه الوصية حيث كانت باطلة او مع

مايترتب عليها كثيرمن الجلوس في بيوت الأيتام واستعمال أوعيتهم و فرشهم والأكل والشراب الحرام. رسائل ابن عابدين১৭২/ ১

(৩) মরহুম লেখক তার বইয়ের ৮নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন, আলমগীরী, ৪/৪৬১ পৃষ্ঠা

واختلفوا في الاستئجار على قراءة القران عند القبر مدة معلومة قال بعضهم يجوز وهو المختار كذا في السراج الوهاج.

এক নির্দিষ্ট সময়ে গোরের নিকট কুরআন পাঠ করিয়া বেতন গ্রহণ করা সম্বন্ধে বিদ্বানগণ মতভেদ করিয়াছেন, তাঁহাদের কতকে বলিয়াছেন, উহা জায়েজ নহে, আর কতকে বলিয়াছেন যে, উহা জায়েয হইবে। ইহাই মনোনীত মত, এইরূপ ছেরাজে আহহাজ কিতাবে আছে।

আলমগীর বাদশাহ বড় বড় সাতশত আল্লামা সংগ্রহ করিয়া এই ফাতাওয়ায় আলমগীরী সংকলন করিয়াছেন, সেই সাতশত আল্লামা উহা জায়েয হওয়ার মত সমর্থন করিয়াছেন।

ক. হাওলায়ার বাস্তবতা

এখানে যে ইবারত উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে وقال بعضهم لايجوز (কেউ কেউ বলেন জায়িয নেই) এর উল্লেখ নেই। অথচ উদ্ধৃত গ্রন্থে وقال بعضهم يجوز এর পরে وقال بعضهم لايجوز এরও উল্লেখ আছে। তো ইবারতকে কাটছাট করে দাবীর স্বপক্ষের অংশটুকু উল্লেখ করা আর বিপক্ষের অংশটুকু উল্লেখ না করা কোন আমানতদার ব্যক্তির কাজ হতে পারে না।

খ. উদ্ধৃত গ্রন্থের মান

১. ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী ফিকহে হানাফীর নির্ভরযোগ্য একটি কিতাব। বাদশাহ আলমগীরের বিশেষ তত্ত্বাবধানে বিজ্ঞ বিজ্ঞ সাতশত উলামায়ে কেরামের একটি বোর্ডের যৌথ মেহনত দ্বারা তা সংকলন করা হয়েছে। কিন্তু বোর্ড কর্তৃক নিজস্ব কোন মন্তব্য পেশ করা হয় নাই বরং ইবারত নকল করার পর একটি কিতাবের বরাত উল্লেখ করা হয়েছে, যা আরবী ভাষা বুঝতে সক্ষম ব্যক্তির নিকট অস্পষ্ট থাকার কথা নয়। তাই মরহুম লেখকের দাবী (সেই সাতশত আল্লামা উহা জায়েয হওয়ার মত সমর্থন করিয়াছেন) অবাস্তব। হ্যাঁ, হাদ্দাদী রহ. (মৃত্যু ৮০০ হিজরী) কৃত আস সিরাজুল ওয়াহহাজ এর হাওয়ালা উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে এ ইবারতের শুদ্ধতা অশুদ্ধতার দায়ভার আসসিরাজুল ওয়াহহাজ এর উপর গিয়ে বর্তাবে। আর আসসিরাজুল ওয়াহহাজ যেহেতু একটি অগ্রহণযোগ্য কিতাব, তাই এই কিতাবের বর্ণনার ওপর ভিত্তি করে ফাতাওয়া দেওয়া যাবে না। (মুকাদ্দামাতু উমদাতির রিআয়াহ, ১১; উসুলুল ইফতা, ১১১)

আর যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, এটা ফাতাওয়া আলমগীরীরও নিজস্ব মত, তাহলে ঐ কিতাবের টীকার মধ্যেই এর খণ্ডণ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, এটা বাতিল।

قال : قوله واختلفوا في الاستئجار على قراءة القران، رده في ردالمحتار وحقق وجزم بأنه مخالف لكلام فلايقبل لأن الخلاف في الاستئجار على التعليم وأما الاستجار على القراءة فباطل بالإجماع فراجعه. حاشية الهندية٤/٤٤٩

আল্লামা শামী রহ. রদ্দল মুহতারে ফাতাওয়ায়ে আলমগীরীর উক্ত উক্তির খন্ডণ করেছেন এবং চূড়ান্ত যাচাই-বাছাই করে বলেন, উহা ফুকাহায়ে কেরামের বর্ণনার বিপরীত। সুতরাং তা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা মতভেদ তো ছিল কুরআন শিক্ষা দানের বিনিময় নিয়ে। আর তিলাওয়াত করে বিনিময় নেওয়া সর্বসম্মতভাবে নাজায়েয এবং বাতিল। (আলমগীরী টীকা, ৪:৪৪৯)

গ. জবাব ও পর্যালোচনা

আল্লামা শামী রহ. বলেন, কুরআন, হাদীস, ইজমার মধ্য থেকে মাসায়িলে ফিকহিয়ার মূল উৎস কোনটা তা যদি প্রসিদ্ধ এবং জানা থাকে তাহলে সে মাস` আলা গ্রহণ করতে কোন মতবিরোধ নেই। আর যদি এ রকম না হয়, বরং মাস` আলা ইজতেহাদী হয় তাহলে নকলকারীকে দেখতে হবে, যদি সে মুজতাহিদ হয় তাহলে দলীল তলব করা ছাড়াই তা মানতে হবে। আর যদি সে মুজতাহিদ না হয় তাহলে যদি কোন মুজহাতিদ থেকে বিশুদ্ধভাবে নকল করে থাকে তাহলে তা মানতে হবে। আর যদি অন্য মুজতাহিদ থেকে নকল না করে বরং নিজ থেকেই অথবা অন্য কোন মুকাল্লিদ থেকে বর্ণনা করে দলীল উল্লেখ করে থাকে, তাহলে গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই। অন্যথায় যদি উসূল এবং নির্ভরযোগ্য কিতাবের মুওয়াফিক হয় তাহলে তার ওপর আমল করা জায়িয। আর যদি উসূল (মূলনীতি) এবং নির্ভরযোগ্য কিতাবের মুখালিফ হয় তাহলে তার ওপর আমল করা জায়িয নেই।

অতঃপর তিনি বলেন, ফুকাহায়ে কেরাম স্পষ্ট বলে দিয়েছেন যে, কোন মুকাল্লিদ যদি নির্ভরযোগ্য কিতাবের বরাত ছাড়া কোন ফাতাওয়া দেয় তাহলে তার ফাতাওয়া গ্রহণ করা যাবে না। অপর দিকে হাদ্দাদী রহ. সাধারণ মুকাল্লিদ। তিনি মাস` আলা ইস্তেম্বাত করতে এবং সহীহ ও ফাসেদের মাঝে পার্থক্য করতে সক্ষম নন। আর আলোচ্য মাস` আলা কোন ইমাম মুজতাহিদ থেকেও বর্ণনা করেন নাই। (বরং সকল মুজতাহিদের বর্ণনা হল তা নাজায়িয হওয়ার ওপর) উপরন্তু এটা বর্ণিত উসূলেরও খেলাফ। সুতরাং এটা গ্রহণ করা জায়িয হবে না। (রাসায়েলে ইবনে আবেদীন, ১:১৮০)

২. যদি ধরেও নেয়া হয় এখানে বিনিময় জায়িয। তাহলে তার দ্বারা উদ্দেশ্য হবে এখানে অসিয়ত কারীর উদ্দেশ্য হল, যেখানে কুরআন তিলাওয়াত করা হয়

সেখানে রহমত নাযেল হয়। ফলে তার দ্বারা মৃত ব্যক্তির এবং তার আশপাশের লোকদের ফায়দা হয়। আর বিনিময়টা হল ঐ কষ্টের বিপরীতে যার দ্বারা রহমত নাযেল হল। তিলাওয়াতের বিপরীতে নয়। (রসায়েলে ইবনে আবেদীন, ১:১৮০)

(৪) মরহুম লেখক তার বইয়ের ৯নং পৃষ্ঠায় লিখেছেনঃ

(৭) শরহে অহবানিয়াতে আছে

والمسئلة في التجنيس والمزيد وهي فرع عدم جواز أخذ الأجرة على القربات والفتوى على الجواز وهو اختيار المتأخرين.

এই মাস` আলাটি তজনিছ ও মাজিদে আছে, উহা ইবাদতে কার্য্যগুলিতে বেতন গ্রহণ করা নাজায়েয শাখা স্বরূপ, অথচ উহা জায়েয হওয়ার প্রতি ফাতাওয়া হইবে। ইহাই শেষ জামানায় আলেমগণের মনোনীত মত।

ক. হাওয়ালার বাস্তবতাঃ

এখানে দুটি বিষয় লক্ষণীয়

১. হাওয়ালায় বলা হয়েছে وهو اختيار المتأخرين অথচ কিতাবে আছে وهو قول المتأخرين আর ১ম টা আরবী ব্যাকরণের দৃষ্টিতে মারাত্মক ভুল।

২. এখানে ইবারতকে কাট ছাট করে নিজের দাবী প্রমাণের চেষ্টা করা হয়েছে, যা মারাত্মক অপরাধ। মূল ইবারত এভাবেঃ

تحقيق المسئلة اشتمل البيت على مسئلة جواز الشركة في تعليم القران والفقه وغيرهما والمسئلة في المحيط والتجنيس والمزيد وهو فرع القول بجواز أخذ الأجرة على القربات والفتوى على الجواز وهو قول المتأخرين.

واختار مشايخ بلخ والمتقدمون المنع من الجواز لأن القربة إنما تقع على العامل ولهذا تعتبر اهليته ونية الامر من شركة شرح الوهانية لابن الشحنة ১/২৩৭ الوقف المدنى الخير ديوبند.

এখানে দাগটানা ইবারত টুকুর উদ্দেশ্য থাকলেও পূর্বাপর ইবারতের স্পষ্ট বক্তব্য হল বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী তিলাওয়াত করে বিনিময় নেওয়া জায়িয নেই। হ্যাঁ কুরআন ফিকাহ শিক্ষা দিয়ে বিনিময় নেওয়া জায়িয।

খ. উদ্ধৃত গ্রন্থের মান

এই কিতাবটি আল্লামা আব্দুল বার ইবনুশ শিহনা রহ. (মৃত্যু ৯২৯ হিজরী) কর্তৃক রচিত। কিতাবটির পূর্ণ নাম হলোঃ

تفضيل عقد الفرائد بتكميل قيد الشرائد المعروف بشرح منظومة ابن وهران ৭৬৮ م

এই কিতাব সম্পর্কে আল্লামা আরশাদ মাদানী সাহেব দা.বা. বলেন,

واما الشروح المخطوطة المتواجدة بين المكتبات فثلاثة والشرح الثالث للعلامة عبد البر بن الشحنة وبما أن هذا الشرح يحتل مكانه المرموق لكون الشارح متبحرا في العلوم ولكون الشرح اوضح الشروح...فارتايت أن أقوم بطبع هذا الشرح...مقدمة شرح الوهبانية ص ৫ الوقف المدني الخيرى ديوبند.

অর্থাৎ বর্তমান গ্রন্থাগারসমূহে মানযুমায়ে ওয়াহবানিয়ার ব্যাখ্যাসমূহের যে কয়টি পান্ডুলিপি পাওয়া যায় তার সংখ্যা তিনটি। তৃতীয় ব্যাখ্যাটি হল আল্লামা আব্দুল বার ইবনুশ শিহনা রহ. এর। আর এই ব্যাখ্যাটি তার কাঙ্ক্ষিত অবস্থান লাভ করতে সক্ষম হয়েছে, যেহেতু এর সংকলক গভীর জ্ঞানের অধিকারী এবং ব্যাখ্যা গ্রন্থটি অন্যান্য ব্যাখ্যাগ্রন্থের তুলনায় অধিক স্পষ্ট। (মুকাদ্দামায়ে শরহে ওয়াহবানিয়া, পৃষ্ঠা ৫)

উদ্ধৃত ইবারত দ্বারা সওয়াব রেসানীর উদ্দেশ্যে কুরআন তিলাওয়াত করে বিনিময় নেয়া যে জায়িয তো মোটেও প্রমাণিত হয় না। বরং এতটুকু প্রমাণিত হয় যে, কুরআন-ফিকহ শিক্ষা দিয়ে বিনিময় গ্রহণ করা জায়েয। তাও আবার পরবর্তী উলামায়ে কেরামের মতানুযায়ী। পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরামের নিকটতো এটাও নাজায়িয। নিম্নে উদ্ধৃত ইবারতের তরজমা তুলে ধরা হলোঃ

এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সমাধান হল, উক্ত পঙক্তিটিতে রয়েছে কুরআন-ফিকহ ইত্যাদি শিক্ষাদানে অংশীদারিত্ব জায়িয হওয়ার মাস'আলাটির বিস্তারিত বর্ণনা মুহীত, তাজনীস এবং মাযীদ নামক কিতাবত্রয়ে রয়েছে। আর এ মাস` আলাটি নেক কাজ করে বিনিময় নেওয়া জায়েয মাস'আলার শাখা। আর ফাতাওয়াযোগ্য বর্ণনা হল জায়িয হওয়া। এটা পরবর্তী উলামায়ে কেরামের মত।

কিন্তু বলখ শহরের মাশায়েখগণ এবং পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরাম না জায়েয হওয়ার মত গ্রহণ করেছেন। কেননা নৈকট্য ও সাওয়াব তো আমলকারীর অর্জিত হয়ে থাকে। এই কারণে আমলকারীর যোগ্যতা অযোগ্যতার এবং আদেশকারীরর নিয়্যত বিবেচনা করা হয়। (শরহে ওয়হবানিয়া, ১:২৩৭)

লক্ষ্য করা গেল যে, এখানে লেখক আলোচনা করছিলেন কুরআন, ফিকহ ইত্যাদি শিক্ষাদান করার বিনিময় নিয়ে। পরে মূল মাস` আলা তথা নেক কাজ করার বিনিময় সম্পর্কিত মাস` আলা উল্লেখ করেছেন। অতএব এখানে সাওয়াবে রেসানীর উদ্দেশ্যে কুরআন তিলাওয়াতের বিনিময় গ্রহণ করা সম্পর্কে কোন আলোচনাই করা হয়নি।

(৫) মরহুম লেখক তার বইয়ের ১০ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেনঃ
(১০) মোলতাকার টীকা, ২/৩৮৪ পৃষ্ঠা।

لاتجوز وتبطل الاجارة عند المتقدمين على الطاعات كالأذان والحج والإمامة وتعليم القران والفقه وقراءتها ويفتى اليوم بجواز الإجارة على هذه الطاعات لفتور الرغبات ومنع العطيات.

আযান, হজ্জ, ইমামত, ফিকাহ শিক্ষা দেওয়া, কুরআন ও ফিকাহ পাঠ করার তুল্য ইবাদতগুলোতে বেতন গ্রহণ করা প্রাচীন আলেমগণের নিকট নাজায়েয ও বাতিল। বর্তমানে আগ্রহ হ্রাস ও দান খয়রাত বন্ধ হওয়া হেতু এই ইবাদতগুলিতে বেতন গ্রহণ করা জায়েয হওয়ার ফাতাওয়া দেওয়া হইবে।

ক. হাওয়ালার বাস্তবতা

এখানে ইবারত সংক্ষিপ্ত করতে গিয়ে এমন কিছু শব্দ বাদ দেওয়া হয়েছে যার কারণে ইবারতের মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়ে গেছে। কারণ ومنع العطيات এর পরে উদ্ধৃত গ্রন্থে

مثل الإمامة وتعليم القران والفقه تحرزا عن الاندراس

“যেমন ইমামতি, কুরআন ও ফিকহ শিক্ষা প্রদান, দ্বীন মিটে যাওয়ার আশঙ্কা হেতু” এরও উল্লেখ আছে। যার দ্বারা উদ্দেশ্য হল, শুধু ঐ সমস্ত ইবাদতের বিনিময় নেয়াকে জায়িয বলা হয়েছে যেগুলো না থাকলে দ্বীন মিটে যাবে। বলাবাহুল্য যে, বিনিময়ের মাধ্যমে তিলাওয়াত না থাকলে দ্বীন মিটবে না। এজন্যই তো শেষোক্ত ইবারতে وقرائتهما এর উল্লেখ নেই।

খ. উদ্ধৃত গ্রন্থের মান

এটি আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী রহ. (মৃত্যু ১০৮৮ হি.) কৃত মুলতাকাল আবহুর এর টীকা গ্রন্থ। যার নাম الدر المنتقى في شرح الملتقى (আদ্দুররুল মুনতাকা ফী শরহিল মুলতাকা) লেখক হলেন, শায়েখ ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ আল হালাবী রহ. মৃত্যু ৯৫৬ হিজরী।

হাজী খলীফা রহ. বলেন,

واجتهد في التنبيه على الأصح والأقوى وفي ترك شيء من مسائل الاريسة (القدورى والمختار والكنـــز والوقاية) ولهذا بلغ صيته في الأفاق و وقع على قبوله بين الحنفية كشف الظنون১৮৪/২ :

এ কিতাবে লেখক অধিক শুদ্ধ এবং শক্তিশালী বর্ণনার উপর অবহিত করা এবং চার কিতাবের কিছু মাস` আলা না আনার চেষ্টা করেছেন, এজন্য বিশ্ব জুড়ে এর প্রসিদ্ধি ছড়িয়ে পড়েছে এবং হানাফীদের নিকটে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে। (কাশফুয যুনুন, ২:১৮১৪)

গ. জবাব ও পর্যালোচনা

এ রকম ইবারত ফাতাওয়ায়ে শামী, আলবাহরুর রাইক, বাদায়েউস সানায়েসহ গ্রহণযোগ্য অনেক কিতাবেই উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে,

فهذا دليل قاطع وبرهان ساطع على أن المفتى به ليس هو جواز الاستئجار على كل طاعة بل على ماذكروه فقط مما فيه ضرورة ظاهرة. رد المحتار৬/২

অর্থঃ এটা সুস্পষ্ট দলীল এবং অকাট্য প্রমাণ যে, ফাতাওয়াযোগ্য মত হল, সব ধরনের ইবাদতের বিনিময়ের লেনদেন জায়িয না হওয়া। বরং ফুকাহায়ে কেরাম যে ইবাদতগুলো উল্লেখ করেছেন কেবল সেগুলোর বিনিময়ের লেনদেন জায়িয হওয়া। অর্থাৎ যে সব ইবাদতের মধ্যে দ্বীনের স্পষ্ট জরুরত আছে এবং যেগুলোর উপর দ্বীনের স্থায়িত্ব নির্ভরশীল।

এখানে এ কথা বলার কোন অবকাশ নেই যে, ঐ সব কিতাবে তো وقرائنهما শব্দ নেই, কেমন যেন তারা এটাকে নাজায়িয বলেননি, কাজেই এই ইবারত দ্বারা কুরআন তিলাওয়াতের বিনিময় গ্রহণ করার বৈধতা প্রমাণিত হয়। অবকাশ না থাকার কারণ এই যে, পরবর্তী উলামায়ে কেরাম এটাকে জায়িয বলেছেন, এটা মুসান্নিফের উদ্দেশ্য নয়। কেননা তিনি শেষে জায়েয হওয়ার কারণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন تحرزا عن الاندراس তথা "যা না থাকলে দ্বীন মিটে যাবে" এমন হতে হবে। এজন্যই তো পূর্ববর্তী উলামায়ে কিরাম তাদের নিকট যেগুলোর বিনিময় নাজায়িয, সেগুলোর বর্ণনা দিতে গিয়ে وقرائنهما শব্দ উল্লেখ করেছেন। কিন্তু পরবর্তী উলামায়ে কিরাম তাদের নিকট যেগুলোর বিনিময় জায়িয সেগুলোর বর্ণনা দিতে গিয়ে وقرائنها আর উল্লেখ করেন নাই। বিধায় সেটা নাজায়িয রয়ে গেল। অথবা এভাবেও বলা যেতে পারে যে, وقرائنهما দ্বারা উদ্দেশ্য হল, وتعلمهما অর্থাৎ তালেবে ইলমদের জন্য অযীফা বা বেতন গ্রহণ করা জায়িয।

(৬) মরহুম লেখক তার বইয়ের ১২ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেনঃ

(১৪) ফাতাওয়ায়ে আজিজিয়া ১/৯ পৃষ্ঠায় আছে

شخصے قران را نہ بروجہ طاعت بلکہ بر قصد مباحے میخوانند و بران اجرت گیرد مثل رقیہ وختم بعض سور قرانی برآے حصول مطالب دنیوی یا برآے استخلاص از عذاب گور یا برآے انس مردہ یا زندہ بصورت خوش و ایں قسم نیز جائز است بلاکراہت انتہی

অর্থঃ এক ব্যক্তি ইবাদতের উদ্দেশ্যে নহে বরং মোবাহ কার্যের নিয়তে কুরআন পাঠ করে এবং উহার বেতন গ্রহণ করে, যেরূপ ঝাড়-ফুঁক করা, পার্থিব মতলব হাছেলের উদ্দেশ্যে কুরআনের ছূরা খতম করা কিংবা গোর আজাব হইতে নিষ্কৃতি দেওয়ার উদ্দেশ্যে অথবা মৃত বা জীবিতদের শান্তিদানের উদ্দেশ্যে মিষ্ট আওয়াজে পড়া, ইহা বিনা কারহিয়াত জায়েয।

ক. হাওয়ালার বাস্তবতা

ফাতাওয়ায়ে আযীযী (উর্দু) এর ৪৯০-৪৯১ পৃষ্ঠায় ইবাদত বন্দেগীর বিনিময় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে কুরআন তিলাওয়াতের বিনিময়ের কয়েকটি সূরত উল্লেখ করা হয়েছে আর তাতে উল্লেখিত মাস` আলাটিও আছে।

খ. উদ্ধৃত গ্রন্থের মান

ফাতাওয়ায়ে আযীযী কোন গ্রহণযোগ্য ফাতাওয়ার কিতাব নয়। বরং এটা একটি অগ্রহণযোগ্য কিতাব। কেননা ইহাকে শাহ আবদুল আযীয রহ. এর দিকে সম্বোধন করা হলেও তার নিজস্ব লিখিত কোন কিতাব নয়। বরং পরবর্তীতে কোন এক ব্যক্তি তাঁর কিছু ফাতাওয়া একত্রিত করে তাঁর নামে চালিয়ে দিয়েছে। অপরদিকে সংকলকের নামও অজ্ঞাত। সুতরাং অজ্ঞাত লোকের কিতাব গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আল্লামা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী (দা.বা.) উসূলুল ইফতা ১১৮ নং পৃষ্ঠায় অগ্রহণযোগ্য কিতাবগুলোর তালিকা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন,

قال : ومنها الفتاوى العزيزية المنسوبة إلى الشيخ عبد العزيز المحدث الدهلوى فإن هذا الكتاب ليس من تأليفه وإنما جمع رجل فتاواه بعده وهو لايعرف وقد سمعت من والدى الشيخ محمد شفيع قدس سره أنه يوجد في هذا الكتاب الحاقات لاتصح نسبتها الى الشيخ الدهلوى فلاينبغي الاعتماد عليها ما لم يتأيد مضمونها بدليل اخر. اصول الافتاء صـــ১১৯ /১৮

গ. জবাব ও পর্যালোচনা

এখানে দুটি বিষয় লক্ষণীয়

১. মরহুম লেখকের দাবী ছিল সাওয়াব পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে কুরআন তিলাওয়াত করে তিলাওয়াতের বিনিময় গ্রহণ করা জায়িয হওয়া, অথচ তিনি উদ্ধৃতি দিয়েছেন দুনিয়াবী উদ্দেশ্যে কুরআন তিলাওয়াত করে বিনিময় নেওয়া জায়িয হওয়ার। লক্ষ্য করুন উদ্ধৃতির বিশেষ বাক্যটি

شخصے قران رانہ بروجہ طاعت بلکہ بر قصد مباحے میخوانند.....

অর্থঃ ইবাদতের সাওয়াবের উদ্দেশ্যে নয় বরং মুবাহ কাজের উদ্দেশ্যে এক ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে তার বিনিময় গ্রহণ করে। যেমন, ঝাড়-ফুঁক করে বিনিময় নেওয়া। এখানে যে সুরতের কথা বলা হয়েছে সে সুরতে কুরআন তিলাওয়াতের বিনিময় গ্রহণ করা সকল ইমামের নিকট জায়িয।

২. বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট করে তোলে একই কিতাবের অপর একটি ইবারত,

دوسری صورت یہ ہے کہ کسی شخص کو قران شریف ختم کرنے کےلئے اجرت پر مقرر کریں اور اس سے مقصود یہ ہے کہ ختم کا ثواب اجرت دینے والےکو ہو یہ صورت حنفی مذہب میں ناجائز ہے اور شافعی کے نزدیک اس حکم میں طول اور تفصیل ہے اس صورت کے ناجائز ہونے کی دلیل یہ کہ حنفی مذہب میں یہ قاعدہ کلیہ ہے جیساکہ شرح وقایہ وغیرہ میں لکھاہے-

الاصل عندنا أنه لايجوز الاجارة على الطاعات و على المعاصي لكن لما وقع الفتور في الامور الدينية يفتى بصحتها لتعلم القران والفقه تحرزا من الاندراس. فتاوى عزيزى৪৯০

অর্থঃ দ্বিতীয় পদ্ধতি হল, কোন ব্যক্তিকে কুরআন শরীফ খতম করার জন্য এ উদ্দেশ্যে ভাড়া করা হল যে, খতমের সাওয়াব বিনিময় প্রদানকারীর হবে, হানাফী মাযহাব অনুসারে এই পদ্ধতি নাজায়িয। আর শাফিঈ মাযহাবে এ ব্যাপারে বিশ্লেষণ হল, হানাফী মাযহাবের একটি মূলনীতি (যা শরহে বেকায়াসহ ফিকহের অন্যান্য কিতাবে আছে) এই যে, ইবাদত এবং গুনাহের উপর উজরত বা পারিশ্রমিক নেওয়া দেওয়া নাজায়িয। কিন্তু যখন দ্বীনি বিষয়ে লোকদের অনীহা এবং ত্রুটি দেখা দিল তখন কুরআন ও ফিকহ শেখার উদ্দেশ্যে পারিশ্রমিক জায়িয হওয়ার ফাতাওয়া দেওয়া হল যাতে এই ইলমসমূহ মিটে না যায়।

হ্যাঁ উক্ত ইবারত দ্বারা কুরআন শিখে বিনিময় নেওয়ার বা শিক্ষা দিয়ে বিনিময় নেওয়ার এবং দুনিয়াবী উদ্দেশ্যে কুরআন পড়ে বিনিময় জায়িয হওয়া প্রমাণিত হচ্ছে। মরহুম লেখক দুটি ইবারতের মধ্য থেকে তার মতলবের কাছাকাছি ইবারতটি গ্রহণ করেছেন। আবার তরজমা অস্পষ্টভাবে করেছেন। অথচ একই কিতাবের অপর স্থানে বিষয়টি অত্যন্ত খুলে বলা হয়েছে। যেটাকে উল্লেখ করলে এ ব্যাপার আর কোন ঝগড়াই থাকে না। কিন্তু মরহুম লেখক সে কাজটি করেননি।

(৭) মরহুম লেখক তার বইয়ের ১২ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেনঃ
(১৫) তফসিরের আজিজি ২০৮/২০৯ পৃষ্ঠা

محققين علماء قاعده مقرر كرده اندكه بسياب نافع گفته اندكه يرجه در حق شخص عبادت باشد خواه فرض عين خواه فرض كفايه خواه سنت مؤكده بران اجرت گرفتن جائز نيست مثل تعليم قران و حديث وفقه ونماز و روزه تلاوت وذكر وتسبيح وانجه بهيج وجه عبادت نيست مباح محض است برابر اجرت گرفتن جائز است مثل رقه كردن بقران ياتعويذ نوشتن و امثال ذلك عبادت كه سب تعيين مدت يا تخصيص مكان مباح ميشوند نيز برآنها اجرت گرفتن مثل تعليم قران بطفل كسے درخانه او از صبح تاشام كه باين خصوصيت وقيود هرگز عبادت نيست-

সূক্ষ্ম তত্ত্ববিদগণ একটা হিতজনক নিয়ম স্থির করিয়া বলিয়াছেন যে, ফরজে আইন হউক ফরজে কেফায়া হউক, আর সুন্নতে মোয়াক্কাদা হউক যাহা মানুষের প্রতি ইবাদাত বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে যথা কুরআন, হাদিস ও ফেকাহ শিক্ষা দান, নামায, রোযা, কুরআন পাঠ, জেকর ও তছবিহ, তৎসমস্ত করিয়া বেতন গ্রহণ করা জায়েয নহে। আর যাহা কোন প্রকার ইবাদাত নহে, বরং বিশুদ্ধ মোবাহ কার্য, যথা কুরআন পড়িয়া শরীরে ফুঁক দেওয়া ও তাবিজ লিখিয়া দেওয়া, এইরূপ কার্যের প্রতি বেতন গ্রহণ করা জায়েয আছে। সময় ও স্থান নির্ধারণ করাতে ইবাদাত

কার্যও মোবাহ হইয়া যায়। উহার বেতন গ্রহণ করা জায়েয আছে। যেইরূপ প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাহারও গৃহে থাকিয়া তাহার সন্তানকে শিক্ষা প্রদান করা, এইরূপ শর্তসহ কার্য করা ইবাদাত নহে।

ক. হাওয়ালার বাস্তবতা

তাফসীরে আযীযীর (উর্দূ) ১ম খন্ডের ৩৮০নং পৃষ্ঠায় এই মাস` আলা বিদ্যমান রয়েছে।

খ. উদ্ধৃত গ্রন্থের মান

তাফসীরে আযীযী কুরআনে কারীমের তাফসির সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ কিতাব, যার লেখক শাইখ আবদুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলবী রহ. তাফসিরই হল এ কিতাবের মূল আলোচনার বিষয়, ফাতাওয়া নয়, প্রসঙ্গক্রমে কোথাও কোথাও কোন মাস` আলা এসে যেতে পারে। আর ফাতাওয়ার কিতাব ছাড়া অন্য কোন কিতাব দ্বারা ফাতাওয়া দেওয়া ঠিক নয়। বরং এটা ফাতাওয়া অগ্রহণযোগ্য হওয়ার একটি অন্যতম কারণ।

قال العلامة محمد تقي العثماني : ولابد من معرفة وجوه كونها غير معتبرة وهي متعددة. الوجه السادس : كون الكتاب في غير موضوع الفقه ربما يكون الكتاب في موضوع اخر سوى الفقه كالتصوف والأسرار والأدعية والتفسير والحديث وإنما تذكر فيه المسائل الفقهية تبعا لامقصدا و كثيراما يوجد في مثل هذه الكتب ما هو خلاف المذهب الراجح مع جلالة قدر مؤلفيها وقد وجدت غير واحد من مثل ذلك في عمدة القارى للعيني والمرقاة لعلي القارى. (أصول الإفتاء صـــ١٢٠)

গ. জবাব ও পর্যালোচনা

নিছক উর্দূ ফারসী বা আরবী ইবারতের বাহার দেখালে যদি প্রমাণ হয়ে যায় তাহলে এ ইবারত দাবীর স্বপক্ষে প্রমাণ হতে পারে। অন্যথায় উক্ত ইবারতে সওয়াব রেসানীর উদ্দেশ্যে তিলাওয়াত করে বিনিময় নেওয়া জায়িযের কোন প্রমাণই নেই। কেননা এখানে স্পষ্টই বলা হয়েছে যে, কোন ধরনের ইবাদতের বিনিময় নেয়া জায়িয নেই। তবে কোন মুবাহ কাজ যদি দুনিয়াবী কোন উদ্দেশ্যে করা হয় যেমন, ব্যবসার উদ্দেশ্যে কুরআনে কারীম খতম করা হয় তাহলে তার বিনিময় নেওয়া জায়িয আছে। অনুরূপভাবে বাচ্চাদের (তাদের বাড়ীতে) কুরআনে কারীমের তালীম বা ফিকহ, হাদীসের তালীম দিয়ে বিনিময় নেওয়া জায়িয আছে। আর এটাকে তো সকলেই জায়িয বলেছেন। কিন্তু আলোচ্য মাস` আলাটির ব্যাপারে এখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, কুরআন তিলাওয়াত করে বিনিময় নেওয়া নাজায়িয। সুতরাং এ হাওয়ালা বা উদ্ধৃতিটি মরহুম লেখকের দাবীর পক্ষে নয় বরং

বিপক্ষে। তারপরও তিনি এটাকে কিভাবে তার স্বপক্ষের প্রমাণ হিসাবে আনলেন তা আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন।

(৮) মরহুম লেখক তার বইয়ের ১০৩ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেনঃ
শেফায়োল আলিলের ১৬২ পৃষ্ঠায় আছে

نص الخانية : إذا استأجر المحبوس رجلا ليحج عنه حجة الإسلام جازت الحجة عن المحبوس إذا مات في الحبس و لاجير مثله في ظاهر الرواية.

কাজীখানের রেওয়ায়েতে আছে, যদি কোন কারারুদ্ধ ব্যক্তি নিজের পক্ষ হইতে ফরজ হজ্ব আদায় করার জন্য এক ব্যক্তিকে চাকর নিয়োজিত করে। তবে কারারুদ্ধ ব্যক্তির হজ্ব জায়েয হইয়া যাবে যদি সে ব্যক্তি কারাগারে থাকাকালে মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়। আর চাকরকে উহার তুল্য উজরত দেওয়া হইবে। ইহা জাহেরে রেওয়ায়েত।

ক. হাওয়ালার বাস্তবতা
এখানে দুটি বিষয় লক্ষণীয়

১. যদি উদ্ধৃত কিতাবের নাম সঠিক মেনে নেওয়া হয় তাহলে ১৬২ নং পৃ. উল্লেখ করে ভুল করেছেন। কেননা শিফাউল আলীল হলো নিছক ৫৭ পৃষ্ঠার একটি রিসালা ১৬২ পৃ. আসবে কোত্থেকে।

২. যদি পৃষ্ঠা নং ঠিক ধরা হয় তাহলে কিতাবের নাম উল্লেখে ভুল করেছেন। কারণ ১৬২ নং পৃষ্ঠা শিফাউল আলীলের নয় বরং মাজমূয়ায়ে রাসায়েলে ইবনে আবেদীনের। অর্থাৎ উক্ত ইবারতটি মাজমূয়ায়ে রাসায়েলে ইবনে আবেদীনের ১৬২ নং পৃষ্ঠা ৭ নং রিসালা শিফাউল আলীলের মধ্যে রয়েছে।

খ. উদ্ধৃত গ্রন্থের মান
এই রিসালার পূর্ণ নাম হল

شفاء العليل و بل الغليل في حكم الوصية بالختمات والتهاليل.

লেখক আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ. ফিকহের মুতূন অর্থাৎ আসল কিতাবসমূহের পরেই এই রিসালার মান।

(২)اپنے فتاوی اور فقہی تحریروں کو باوزں بنانے کے لئے ضروری ہے کہ ہم کتابوں کا حوالہ دیتے وقت درجہ بندی کا لحاظ رکھیں- مثلا پہلادرجہ- فقہ کی اصل کتابیں مثلا شامی، بدائع او البحر و غیرہ-

دوسرا درجہ- وہ رسائل جو کسی خاص موضوع کی تحقیق پر مبنی ہوں مثلا رسائل ابن عابدین، رسائل ابن نجیم، جواہر الفقہ، فقہی مقالات الخ- فتوی نویسی کے رہنما اصول ص-১১১

গ. জবাব ও পর্যালোচনা

মরহুম লেখক উদ্ধৃত ইবারতটি উল্লেখ করে বলেন, তৎপরে আল্লামা শামী রহ. উক্ত হজ্বের ইজারা বাতিল প্রমাণ করার সাধ্য সাধনা করিয়াছেন, এক্ষণে আমাদের প্রশ্ন, ইজারা বাতিল হইলে, যে টাকাগুলি বদলা হজ্ব আদায়কারীকে দেওয়া হইয়াছে, উহার আদা-প্রদান হারাম হইয়াছে। দাতা-গ্রহীতা গোনাহগার হইয়াছে, এইরূপ হারাম অর্থের দ্বারা হজ্ব জায়েয হইল কীরূপে? ইহার সন্তোষজনক জওয়াব আল্লামা শামী ও চট্টগ্রামী মাওলানার নিকট চাহিতেছি।

এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়

১. মরহুম লেখকের উক্ত ইবারত দ্বারা দলীল হওয়া কোন মতেই সহীহ হয়নি। কেননা আল্লামা শামী রহ. আল আশবাহ ওয়ান নাযায়েরের একটা ভুল নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, তিনি যে মাস` আলা খানির দিকে নিসবত করেছেন সেটা সহীহ নয়। অতঃপর তার কারণসহ বিস্তারিত আলোচনা করেন। তো পূর্বাপর ইবারত বাদ দিয়ে শুধু মাঝের ইবারতকে দলীল হিসাবে নিয়ে আসা মারাত্নক খেয়ানত। সাথে সাথে এটা আল্লামা শামী রহ. এর প্রতি একটি মিথ্যা অপবাদ আরোপ। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে হেফাযত করুন এবং মাফ করুন।

২. হজ্বের বদলের জন্য টাকার আদান-প্রদান হারাম হলে তার দ্বারা আবার হজ্ব সহীহ হয় কীভাবে এ সম্পর্কে আল্লামা শামী রহ. একটু পরেই আলোচনা করেছেন। (মরহুম লেখক হয়তো পরের আলোচনাটুকু পড়েও দেখেননি। তাই তার মনে এ আপত্তি উঠেছে, অথবা পড়েও নিজ দাবীর বিপক্ষে হওয়ায় তা থেকে এড়িয়ে গেছেন।)

শামী রহ. স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন, ইজারা বাতিল হবে কিন্তু ইজারার হুকুম থাকবে। তাই ইজারার যে পরিমাণ টাকা খরচ হবে সে পরিমাণ টাকা আমের তথা নির্দেশ দাতাকে ফেরত দিতে হবে।

শামী রহ. আরো বলেন, কাযীখানের মধ্যে اجر مثله দ্বারা যে সাধারণভাবেও এটা বুঝে আসে। কেননা ইজারাই যদি সহীহ হত তাহলে اجر مثله বলা হত না, তখন তো তাদের পারস্পারিক নির্ধারিত উজরতই দিতে হবে।

قال وقد استشكل كلام قاضيخان المحقق ابن الهمام وذكر أن النفقة لاتصير ملكا للحاج لأنه لوملكها لكان بالاستئجار وهو لايجوز على الطاعة إلى أن قال : فما في قاضيخان مستشكل

لاجرم ان الذى في كافي الحاكم الشهيد وله نفقة مثله هو العبارة المحررة و زاد ايضاحها في المبسوط قال : وهذه النفقة ليس مستحقها بطريق العوض بل بطريق الكتابة. هذا وانما جاز الحج عنه لانه لما بطلت الاجارة بقي الامربالحج فيكون له نفقة مثله انتهى كلام الكمال قلت : فهذا نص الكمال على بطلان الاجارة وخالفه قاضي خان ون باشارته رسائل ابن عابدين : ১/১৬২

আল্লামা ইবনুল হুমাম রহ. কাযীখানের উক্ত ইবারতের উপর প্রশ্ন করে বলেন, হজ্বের খরচ হজ্বকারীর মালিকানা হবে না, কেননা হজ্বের খরচ যদি বদলী হজ্বকারীর মালিকানাই হয় তাহলে ইজারা বিশুদ্ধ হবে। অথচ ইবাদতের উপর ইজারা সহীহ হয় না। সুতরাং কাযীখানের বক্তব্য প্রশ্নবিদ্ধ। বিশেষ করে হাকিম শহীদ রহ. কর্তৃক লিখিত কাফীর মধ্যে যে ইবারত আছে وله نفقة مثله (সে ব্যয়িত খরচ পাবে) সেটিই সংস্কৃত ইবারত। মাবসূত কিতাবে বিষয়টি আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, এই ব্যয়িত খরচ বিনিময় হিসাবে পাচ্ছে না, বরং খরচ হিসাবে পাচ্ছে। বাকী হজ্ব জায়িয হয়েছে এ হিসাবে যে, ইজারা যখন বাতিল হয়ে গেলতখন স্থান নির্দেশকারীর পক্ষ থেকে শুধু হুকুমটাই রয়ে গেল। সুতরাং ব্যয়িত খরচ পাবে। তো কামাল ইবনুল হুমাম রহ. স্পষ্ট বলে দিয়েছেন বদলী হজ্বকারীর ইজারা বাতিল হওয়া সম্পর্কে। (রাসাইলে ইবনে আবেদীন, ১৬২ পৃ.)

(৯) মরহুম লেখক তার বইয়ের ১০৬ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেনঃ

শেফাউল আলিল, ১৬৪ পৃষ্ঠা.

قد مر في عبارة الامام العيني عد الحج والغزو من جملة مايجوز الاستئجار عليه.

ইমাম আয়নির ইবারত উল্লিখিত হইয়াছে, তিনি হজ্ব ও জেহাদের উজরত লওয়া জায়েয বলিয়াছেন।

ক. হাওয়ালার বাস্তবতা

এই ইবারতটি মাজমুআয়ে রাসায়েলে ইবনে আবেদীনের ১৬৪ নং পৃষ্ঠায় ৭ নং রিসালা শিফাউল আলীল এর মধ্যে রয়েছে।

তবে এ ইবারতের শুরুতে فان قلت (অর্থাৎ যদি আপনি প্রশ্ন করেন) উল্লেখ আছে। এটাকে মরহুম লেখক উল্লেখ করেননি। কেননা এতে তার গোমর ফাস হয়ে যাবে। কারণ উক্ত কিতাবে যে প্রশ্নের স্পষ্টভাবে খণ্ডন করা হয়েছে সেই প্রশ্নকেই তিনি দলীল হিসাবে পেশ করেছেন।

খ. উদ্ধৃত গ্রন্থের মান সম্পর্কে পিছনে আলোচনা করা হয়েছে।

গ. জবাব ও পর্যালোচনা

মরহুম লেখক যে কিতাব থেকে হাওয়ালা নকল করেছেন সে কিতাবেই এর বিস্তারিত জবাব লিখিত আছে এবং জবাব দেওয়ার জন্যই মূলত আল্লামা শামী রহ. এই ইবারত উল্লেখ করেছেন। (যদিও মরহুম লেখক সেদিকে ভ্রুক্ষেপও করেননি।

আল্লামা শামী রহ. বলেন, হজ্ব সম্পর্কে আলোচনা তো তুমি ইতিপূর্বে জানতে পেরেছে। অর্থাৎ তিনি উক্ত কিতাবের ১৬২ নং পৃষ্ঠায় এর জওয়াব উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেনঃ

لان الاجارة على الحج غير صحيحة باتفاق أئمتنا وانما جازت الحجة عن المستاجر لانه لمابطلت الاجارة بقي الامر بالحج وقد نواه الفاعل عن الامر. رسائل ابن عابدين১৬২/১

অর্থঃ কেননা হজ্বের জন্য কাউকে ইজারা নেওয়া আমাদের সকল ইমামদের ঐক্যমতে বাতিল, তবে ইজরা গ্রহণকারীর হজ্ব সহীহ হয়ে যাবে, কেননা যখন ইজারা বাতিল হল তখন ইজারা গ্রহীতার পক্ষ থেকে শুধু নির্দেশ রয়ে গেল। এদিকে হজ্ব কারীর নির্দেশ প্রদানকারীর পক্ষ থেকেই নিয়ত করেছে। এজন্য তা সহীহ হয়ে যাবে। এজন্যই এ লোক তার খরচটা শুধু পাবে। (দেখুন ১:১৬২ পৃষ্ঠা)

আর জিহাদের বিনিময় নেওয়া জায়িয জরুরতের কারণে। আর আলোচ্য মাস'আলায় কোন জরুরত নেই। সুতরাং তার উপর কিয়াস করা যাবে না।

(১০) মরহুম লেখক তার বইয়ের ১১৯ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন

স্বয়ং আল্লামা শামী রহ. শেফায়োল আলিলের ১৮০ নং পৃষ্ঠায় লিখিয়েছেন

ولوسلم ماقاله الحدادى يحمل على ان غرض الموصي ان موضع القران تنـــزل فيه الرحمة فيحصل من ذلك فائدة للميت ومن حوله فتكون الاجرة بمقابلة ذلك التعب لانه سبب لنـــزول الرحمة على القبر واستئناس الميت به.

অর্থঃ হাদ্দাদীর কথা যদি মানিয়া লওয়া যায়, তবে উহার এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিত হইবে যে, অসিয়তকারীর উদ্দেশ্য এই যে, কোরান পাঠ স্থানে রহমত নাজেল হইয়া থাকে, ইহাতে মৃতের ও তৎপার্শ্ববর্তী লোকদের উপকার হইয়া থাকে। কাজেই পরিশ্রম করার পরিবর্তে বেতন দেওয়া হইবে। কেননা উহাতে গোরের উপর রহমত নাযেল হইয়া থাকে এবং মৃতের আনন্দ লাভ হইয়া থাকে।

ক. হাওয়ালার বাস্তবতা

এখানে দুটি বিষয় লক্ষণীয় :

১। মরহুম লেখক দাবী করেছেন যে, উল্লেখিত ইবারত স্বয়ং শামী রহ. এর ইবারত, কিন্তু সহীহ কথা হল ইবারতটি তাবঈনুল মাহারিমের লেখক আল্লামা সিনানুদ্দীন ইউসুফ রহ. এর ইবারত।

২। আল্লামা শামী রহ. তাবঈনুল মাহারিমের উক্ত ইবারত সংশ্লিষ্ট আরো ইবারত উল্লেখ করেছেন, উজরত জায়িয হওয়ার পক্ষে আল্লামা হাদ্দাদী রহ. এর লিখিত একটি বক্তব্য খন্ডন করার জন্য। কিন্তু মরহুম লেখক তার অভ্যাসমত এখানেও খেয়ানতের আশ্রয় নিয়েছেন। অর্থাৎ সিনানুদ্দীন ইউসুফ রহ. এর পূর্ণ কথা উল্লেখ না করে, বরং তার কথার মাঝের এক খন্ডাংশ উল্লেখ করে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে কুরআন তিলাওয়াতের উজরত জায়িয হওয়ার স্বপক্ষে দলীল হিসাবে পেশ করেছেন। নিম্নে পুরো ইবারত উল্লেখ করা হলঃ

فاعلم أن الحدادى و أمثاله مقلدون لايقدرون على الاستنباط ولاعلى إخراج الصحيح من الفاسد بل هم ناقلون و لم ينقلوا هذه المسئلة عن أئمتنا المجتهدين بل المصرح منهم عدم الجواز مع أنه مخالف للأصول، قال في الاختيار ومجمع الفتاوى : واخذ شيئ للقران لايجوز لانه كالأجرة، فإذا نفى الجواز عن مشابه الأجرة فكيف عنها، و في الخلاصة أوصى لقارئ القران عند قبره بشئ فالوصية باطلة وكذا في التاترخانية عن المحيط، وفيها والصحيح أنه لايجوز وان كان القارئ معينا وهكذا قال ابو نصر و كان يقول : لامعنى لهذه الوصية ولصلة القارى لقرائته، لأنه بمنـــزلة الأجرة وهي باطلة وبدعة، وقال تاج الشريعة في شرح الهداية : إن القران بالأجرة لايستحق الثواب لاللميت ولاللقارى.

وقال العيني في شرح الهداية : و يمنع القارى للدنيا والأخذ والمعطي آثمان، فلم يكن ما اختاره الحدادى هو المختار لأن المعتمدين من أصحابنا ذهبوا إلى خلافه. وكتاب القنية مشهور عند العلماء الثقات بضعف الرواية مع قطع النظر عن كون مؤلفه الزاهدى معتزليا وكلامه مخالف لأصولنا ولوسلم ماقاله الحدادى يحمل على أن غرض الموصي أن موضع القران تنـــزل فيه الرحمة فيحصل من ذلك فائدة للميت ومن حوله فتكون الأجرة بمقابلة ذلك التعب لأنه سبب لنـــزول الرحمة على القبر واستئناس الميت به و لم توجد هذه المعاني إذا قرأ بعيدا عن القبر وقرأ للحي كل يوم في مكان خصوصا إذا لم يكن المقرى حاضرا ولايقاس على مايقرأ عند القبر إذ لا فائدة للمعطي في إتعاب نفس القارى بل مراده وصول الثواب إليه ولاثواب في هذا التعب والقراءة كما ذكرناه عن تاج الشريعة....

والحاصل أن ماشرع في زماننا من قراءة الأجزاء بالأجرة لاجواز لأن فيه الأمر بالقراءة وإعطاء الثواب للآمر والقراءة لأجل المال فإذا لم يكن للقارى ثواب لعدم النية الصحيحة، فأنى يصل الثواب إلى المستاجر، ولولا الأجرة ماقرأ أحد لأحد في هذا الزمان بل جعلوا

القران العظيم مكسبا و وسيلة إلى جمع الدينا، إنا لله وإنا إليه راجعون انتهى. هذا ملخص ما رأيته في تبيين المحارم . (شفاء العليل من رسائل ابن عابدين(১/১৮০

খ. উদ্ধৃত গ্রন্থের মান সম্পর্কে পিছনে আলোচনা হয়েছে।

গ. জবাব ও পর্যালোচনা।

এখানে দুটি বিষয় লক্ষণীয়

১. তাবঈনুল মাহারিমের লেখক আল্লামা সিনানুদ্দীন ইউসুফ রহ. আল্লামা হাদ্দাদী রহ. এর একটি বক্তব্য খণ্ডন প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তারই একটি ছোট্ট অংশ হল উল্লেখিত ইবারত। আল্লামা হাদ্দাদী রহ. এর এই ইবারত ফাতাওয়ায়ে আলমগীরীতে উল্লেখ করা হয়েছে

اختلفوا في الاستئجار على قراءة القران عند القبر مدة معلومة قال بعضهم يجوز وهو المختار وقال بعضهم لايجوز (كذا في السراج الوهاج .8/889)

যা মরহুম লেখক ৬ নং দলীল হিসাবে ইতোপূর্বে পেশ করেছেন। আমরা তার বিস্তারিত জবাবও দিয়েছি। সেখানে বলা হয়েছে, আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ. বলেন, কোন কোন মাস` আলা বর্ণনা করতে গিয়ে ২০টি কিতাব ঐক্যমত অথচ ঐ মাস` আলা ভুল। তন্মধ্যে শুধু তিলাওয়াত করে বিনিময় গ্রহণ করার মাস` আলা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমে হাদ্দাদী রহ. কৃত আস সিরাজুল ওয়াহহাজ এবং আল জাওহারার সংকলক এটাকে জায়িয বলে উল্লেখ করেছেন। আর পরবর্তী অধিকাংশ মুসান্নিফ তাদের অনুসরণ করে ভুলের শিকার হয়েছেন...। (শরহু উকূদি রসমিল মুফতী, ৬২)

২. রাসাইলে ইবনে আবেদীন সূত্রে উপরে বর্ণিত তাবঈনুল মাহারিমের লেখক আল্লামা সিনানুদ্দীন রহ. এর পূর্ণ বক্তব্যের আলোকে উক্ত ইবারতের জবাব সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। নিম্নে তা সংক্ষিপ্তাকারে পেশ করা হলঃ আরবী ভাষা সম্পর্কে জ্ঞাত ব্যক্তি বুঝতে পারবে যে, সংশ্লি¬ষ্ট ইবারতসহ উক্ত ইবারতের উদ্দেশ্য হলঃ কুরআন তিলাওয়াতের বিনিময় গ্রহণ তো সুস্পষ্টরূপে নাজায়িয, তথাপি হাদ্দাদ রহ. এর কথা যদি মেনেও নেওয়া হয় তাহলে তার দ্বারা উদ্দেশ্য হবে, কবরের পাশে বসে তিলাওয়াত করার কারণে কবরে রহমত অবতীর্ণ হয়। এর দ্বারা মুর্দার ফায়েদা হয়। তাই তিলাওয়াতকারী যে কষ্ট করে মুর্দা ব্যক্তিকে ফায়েদা পোঁছাল তিলাওয়াতকারী সে কষ্টের বিনিময় গ্রহণ করবে (তিলাওয়াতের বিনিময় নয়, কিন্তু যদি কবর থেকে দূরে বসে তিলাওয়াত করে তাহলে তো এই ফায়েদা হয় না। তাইলে সেক্ষেত্রে উজরত জায়িয হয় কীভাবে?

উপরন্তু আল্লামা শামী রহ. সিনানুদ্দীন রহ. এর এ বক্তব্য সম্পর্কে বলেন, সিনানুদ্দীন রহ. মূলত এই উত্তর প্রদান করেছেন কথার কথা হিসাবে। নতুবা তার

এই বক্তব্য অগ্রহণযোগ্য। কেননা তার এই কিতাবে আমাদের ইমামগণের যে অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে এটা তার বিপরীত। (রাসায়েলে ইবনে আবেদীন, ১:১৮০)

ভাবতেও অবাক লাগে, পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা যেখানে কুরআন তিলাওয়াতের উজরত নাজায়িয হওয়ার অসংখ্য প্রমাণ নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহ থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে, সেখানে সমস্ত দলীল বাদ দিয়ে এমন কাটছাঁট করা একটি ইবারত মরহুম লেখক কেন গ্রহণ করলেন? তা আমাদের বুঝে আসে না। আল্লাহ মাফ করুন।

পরিশিষ্ট

মোটকথাঃ মৃত ব্যক্তিকে সাওাব রেসানীর উদ্দেশ্যে তিলাওয়াত বা যিয়ারত করে তিলাওয়াত বা যিয়ারতের বিনিময় গ্রহণ করা শরী'আতের দৃষ্টিতে নাজায়িয এবং হারাম। এ বিষয়টি কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস দ্বারা সুপ্রমাণিত। এর বিপক্ষে উত্থাপিত সকল দলীল-প্রমাণ হয়তো অগ্রহণযোগ্য কিতাব বা ব্যক্তি থেকে সংগৃহীত, অথবা গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির এমন সব কথাবার্তা যেগুলো শরী'আতের পরিভাষায় যাল্লাত, হাফওয়াত এবং রুখছত তথা স্খলন, ত্রুটি এবং ভ্রান্তি নামে প্রসিদ্ধ। যা বড় বড় নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিত্ব থেকেও হতে পারে। কারণ তারাও মানুষ আর কোন মানুষ ভুলের উর্ধ্বে নয়।

যাল্লাত, হাফওয়াত এবং রুখছতের হুকুম এই যে, এগুলোর ওপর আমল করা জায়িয নেই বরং এগুলোর উপর আমল করলে গোমরাহ হওয়ার চরম আশঙ্কা রয়েছে। এ সম্পর্কিত কয়েকটি উক্তি নিম্নে পেশ করা হলঃ

(১)قال الامام الاوزاعي : من اخذ بنوادر العلماء خرج من الاسلام . (السنن الكبرى ١٠/٢١١)

ইমাম আউযাঈ রহ. বলেন, যে ব্যক্তি উলামায়ে কেরামের অতি দুর্লভ কথা-বার্তা গ্রহণ করবে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। (আসসুনানুল কুবরা ১০:২১১ পৃ.)

(২)وأسند ابن عبد البر إلى سليمان التيمي العالم الحجة العابد أنه قال : لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله وعلق عليه ابن عبد البر بقوله : هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا. (جامع بيان العلم(٢/٩٠

সুলাইমান তাইমী রহ. বলেন, যদি তুমি সব আলেমের অবাকশমূলক কথা-বার্তা গ্রহণ কর, তাহলে তোমার মধ্যে সব মন্দের সমাবেশ ঘটবে। হাফেজ ইবনে আব্দুল বার রহ. বলেন, এটা সর্বসম্মত অভিমত, এতে কোন মতভেদ নেই। (জামিউ বয়ানিল ইলম, ২:৯০)

(৩)وفي شرح علل الترمذى لابن رجب عن ابراهيم بن أبي عبلة احد شيوخ الامام مالك : من حمل شاذ العلماء حمل شرا كثيرا وقال معاوية بن قرة : إياك والشاذ من العلم. (شرح علل الترمذى(১/৪১০

ইবরাহীম ইবনে আবী আবলাহ রহ. বলেন, যে ব্যক্তি উলামায়ে কেরামের পদস্খলনমূলক মত গ্রহণ করে সে অনেক মন্দ একত্রিত করে। হযরত মু'আবিয়া ইবনে কুররাহ রহ. বলেন, তুমি নিজেকে উলামায়ে কেরামের পদস্খলনমূলক মত গ্রহণ করা থেকে দূরে রাখ। (শরহু ইলালিত তিরমিযী, ১:৪১০)

(8)ونقل العلامة الكوثرى رحمه الله تعالى في تعليقاته على ذيول تذكرة الحفاظ كلمة ابن عبلة بلفظ من تبع شواذ العلماء ضل (ذيول التذكرة صـــ(৭৮

আল্লামা কাউসারী রহ. ইবরাহীম ইবনে আবী আবলাহ রহ. এর কথাকে এভাবে নকল করেন, যে ব্যক্তি উলামায়ে কেরামের পদস্খলনমূলক কথাবার্তা অনুসরণ করবে সে পথভ্রষ্ট হবে।

(৫) قال الإمام يحيى بن سعيد القطان : لو أن إنسانا اتبع كل مافي الحديث من رخصة لكان به فاسقا. العلل لاحمد ১/২১৯

ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল কাত্বান রহ. বলেন, যদি কোন মানুষ হাদীসে বর্ণিত সব রুখছত বা অবকাশের উপর আমল করে তাহলে সে এর কারণে ফাসেক হবে। (ইমাম আহমদ কৃত ইলাল, ১:২১৯)

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে একথাগুলো বুঝে বিশুদ্ধ আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

সমাপ্ত

বিপদ-আপদ ও বালা-মুসীবতে

সান্ত্বনা ও পুরস্কার

মুফতী মনসূরুল হক

www.islamijindegi.com

বিপদ-আপদ ও বালা-মুসীবতে

সান্ত্বনা ও পুরস্কার

সংকলনে
মুফতী মনসূরুল হক
প্রধান মুফতী ও শাইখুল হাদীস
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া
সাত মসজিদ মাদরাসা
মোহাম্মাদপুর,ঢাকা

মাকতাবাতুল মানসূর
প্রথম সংস্করণঃ
জুলাই ২০১১ ইং
শাবান ১৪৩২ হিজরী

মূল্যঃ ৪০ টাকা মাত্র।

www.islamijindegi.com

www.islamijindegi.com

সূচিপত্র

বিষয়	পৃঃ
* দু'টি কথা	৫
* বিপদ-আপদ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার বাণী	৭
* মুমিন বান্দার প্রতি বিপদ-আপদ	৮
* প্রথম কারণঃ পরীক্ষা গ্রহণ	৯
* দ্বিতীয় কারণঃ সতর্ক সংকেত	১৩
* তৃতীয় কারণঃ গুনাহ মাফ ও মর্যাদা বৃদ্ধি	১৪
* বিপদ-আপদে করণীয়-১	১৭
* করণীয়-২: সবর ও ধৈর্য অবলম্বন কর	১৮
* ধৈর্যধারণ নবীদের (আঃ) সুন্নাত	১৯
* সবরের ফযীলত	২১
* সবর সংক্রান্ত হাদীসের বাণী	২৩
* করণীয়-৩: বিপদের সাওয়াব ও ফযীলত স্মরণ করা	২৩
* সন্তান হারানোর ফযীলত	২৩
* ঘনিষ্ঠ ব্যক্তির মৃত্যুর আঘাত সহ্য করার ফযিলত	২৬
* রোগীর রোগ-যাতনা তার গুনাহের কাফফারা স্বরূপ	২৭
* জ্বরের ফযীলত	২৮
* কাঁটা বেঁধার ফযীলত	২৯
* মহামারী ও প্লেগে নিহত ব্যক্তির ফযীলত	২৯
* পেটের পীড়ার ফযীলত	৩০
* মৃগী রোগের ফযীলত	৩১
* চক্ষু রোগের ফযীলত	৩২
* রোগীর দু'আ ফেরেশতার দু'আর মত মকবুল	৩৩
* অসুস্থ ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হওয়ার পূর্বের নেকী বহাল	৩৩
* মানুষের দেয়া কষ্টে ধৈর্যধারণ করা উত্তম	৩৪
* বিপদাপদে আক্রান্ত হওয়া ঈমানের আলামত	৩৫
* কিয়ামতে বিপদগ্রস্তদের সাওয়াব দেখে আক্ষেপ	৩৬
* নবী রাসূল আ. ও নেককার লোকদের বিপদ	৩৭
* রোগী দেখতে যাওয়ার উদ্দেশ্য, ফযীলত	৩৮
* মুসীবতগ্রস্তকে সান্ত্বনা দেয়ার ফযীলত	৩৯
* বিপদকালীন দু'আ	৪০
* প্রিয়জনের ইন্তিকালে সান্ত্বনা লাভের উপায়	৪২
* বিপদাপদে পরিস্থিতি সামলে নেয়ার উপায়	৪৬

www.islamijindegi.com

باسمه تعالى

দু'টি কথা

হামদ ও সালাতের পর, কুরআনে কারীম ও সুন্নাতে নববীর সর্বপ্রথম এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ঈমান শিক্ষা করা । ইসলামী শরীয়তে এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কোন বিষয় নাই। এমনকি শুধুমাত্র বিশুদ্ধ ঈমানই পরকালে নাজাতের উসীলা হবে । কোন ঈমানদার আমলের ত্রুটির কারণে অস্থায়ীভাবে জাহান্নামে যেতে পারে, কিন্তু সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে না । অপরদিকে খাঁটি ও বিশুদ্ধ ঈমান যদি না থাকে তাহলে সকল প্রকার ইবাদত ও বন্দেগী বেকার গণ্য হবে । কেননা ঈমান ব্যতীত কোন ইবাদত বন্দেগী আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য নয় । তবে ঈমানের সাথে আমল থাকলে আশা করা যায় যে, সে ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে বেঁচে সরাসরি জান্নাতে প্রবেশের সুযোগ লাভ করবে ।

এ ঈমান সম্পর্কে মুমিন মুসলমানকে আল্লাহ তা'আলা কয়েকটি দায়িত্ব অর্পণ করেছেন –

ক. ঈমান আনার পর ঈমানকে মজবুত ও শক্তিশালী করা, এবং তার জন্য দাওয়াতের লাইনে মেহনত অব্যাহত রাখা ।

খ. ঈমানকে কুফর ও শিরক থেকে পাক পবিত্র রাখা, অর্থাৎ এমন কোন কথা বা কাজ না করা যার দ্বারা ঈমান নষ্ট হয়ে যায়, বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায় ।

গ. মৃত্যু পর্যন্ত সহীহ ঈমান-আকীদার উপর কায়িম থাকা । ঈমানের ব্যাপারে যে ব্যক্তি এসব বিষয়গুলি স্মরণ রাখবে ইনশাআল্লাহ, আল্লাহ তাকে ঈমানী মৃত্যু নসীব করবেন ।

বালা মুসীবত ও বিপদ আপদে মানুষ ঈমান সম্পর্কীয় পর্যাপ্ত ইলম ও ইয়াক্বীন না থাকায় অনেক সময় ধৈর্যহীন হয়ে এমন কথা বলে ফেলে বা এমন কাজ করে বসে, যাতে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায় এবং পিছের যিন্দেগীর সকল ইবাদত বন্দেগী বরবাদ হয়ে যায় । এ সমস্যা থেকে বাঁচার লক্ষ্যে বক্ষ্যমাণ পুস্তিকায় বিপদ আপদ ও বালা মুসীবতের ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে যে সকল সান্তনাবাণী ও পুরষ্কারের ঘোষণা করা হয়েছে তার থেকে সামান্য কিছু বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে । যাতে করে বিপদে সান্ত্বনা লাভ ও ধৈর্য ধারণ সহজ হয় এবং দুঃখ কষ্টের ভেতরে আল্লাহ তা'আলা যে অসংখ্য সাওয়াব ও ফযীলত রেখেছেন, তা অনুধাবন করে সেটাকে যেন আমরা আল্লাহর বিশেষ এক ধরনের নিয়ামত মনে করতে পারি ।

আল্লাহ তা'আলা সমগ্র বিশ্বের মালিক; আমাদের জান-মাল, বিষয়-সম্পদ, পিতা-মাতা, স্ত্রী-সন্তান সব কিছুই আল্লাহ তা'আলার মালিকানা । আমরা যে মালিকানা

www.islamijindegi.com

দাবী করি তা ঠিক নয় । কারণ, আমাদের অস্থায়ী মালিকানাটুকুও জান্নাতের বিনিময়ে আমরা আল্লাহর নিকট বিক্রি করে দিয়েছি । আল্লাহ তা'আলা তাঁর মালিকানার মধ্যে আমাদের মঙ্গলের জন্য যে কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার রাখেন; তাঁর সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আপত্তি করার বা প্রশ্ন তোলার কেউ কোন প্রকার অধিকার রাখে না । আল্লাহ তা'আলার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে মনক্ষুন্ন হওয়া বা অভিযোগ করা কুফরি কাজ, এতে ঈমান নষ্ট হয়ে যেতে পারে । বান্দার দায়িত্ব এতটুকু যে, আল্লাহ তা'আলার সিদ্ধান্ত তার মনের অনুকূলে হলে সে আল্লাহর হামদ ও শোকর আদায় করবে । আর যদি আল্লাহর কোন সিদ্ধান্ত তার মনের বিরুদ্ধে হয় তাহলে সে আল্লাহর হামদ ও সবর করবে । সারকথা, মালিকানা যার সিদ্ধান্ত তার; এখানে নাক গলানোর কার কি অধিকার আছে?

বক্ষ্যমাণ পুস্তিকাখানা মনোযোগ সহকারে পাঠ করলে ইনশাআল্লাহ কোন প্রকার বিপদ-আপদ, কষ্ট-দুঃখে আল্লাহর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন প্রকার অভিযোগ আমাদের দিলের মধ্যে সৃষ্টি হবে না এবং আমরা আমাদের অমূল্য সম্পদ ঈমানকে হেফাযত করতে পারব ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে আল্লাহ তা'আলার দরবারে দু'আ করছি, তিনি যেন আমাদের সকলকে সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার সিদ্ধান্তের উপর খুশী থেকে ঈমানকে হেফাযত করার তাউফীক দান করেন এবং পুস্তিকাটিকে কবুলিয়াতের মর্যাদা দান করেন । এবং এ পুস্তিকা প্রস্তুত ও প্রকাশের ব্যাপারে যারা যারা আমাকে সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকে, বিশেষ করে আমার প্রিয় শাগরিদ মাওলানা মুফতী আবূ সাইমকে জাযায়ে খাইর দান করেন এবং তাদের ইলম ও আমলে বরকত দান করেন- আমীন ।

বিনীত
মনসূরুল হক
০৯.০৭.২০১১

www.islamijindegi.com

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمْوَالِ وَالأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّـهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُولَـٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ)

অর্থঃ আমি তোমাদের কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষয়-ক্ষতি দ্বারা অবশ্যই পরীক্ষা করব । আর সুসংবাদ শুনিয়ে দিন এমন ধৈর্যশীলদেরকে, যখন তাদের উপর মুসীবত আসে তখন তারা বলে, আমরা তো আল্লাহরই আয়ত্তে, আর আমরা সকলে আল্লাহরই সমীপে প্রত্যাবর্তনকারী । তাদের প্রতি বর্ষিত হবে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে বিশেষ করুণাসমূহ, এবং সাধারণ করুণাও । আর এরাই এমন লোক যারা হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়েছে । (সূরা বাকারা ১৫৫-১৫৭)

মুমিন বান্দার প্রতি বিপদ-আপদঃ

মুমিন বান্দার প্রতি বিপদ-আপদ আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসার বহি:প্রকাশ আল্লাহ তা'আলা মুমিন বান্দাকে অত্যন্ত ভালোবাসেন। তিনি কখনও তাঁর বান্দাকে বরবাদ করে দিতে চান না । এমনকি বান্দার সম্পদের সামান্য ক্ষতিও তিনি বরদাশত করেন না। তাই তা রক্ষা করার জন্য কুরআনে কারীমে সূরা বাকারার শেষের দিকে এক পৃষ্ঠাব্যাপী একটি আয়াত নাযিল করেছেন ।

হাদীসে পাকের বর্ণনা অনুযায়ী আল্লাহ তা'আলা তাঁর অফুরন্ত ভালোবাসার মাত্র এক ভাগ তামাম মাখলুকের মধ্যে বণ্টন করেছেন । আর অবশিষ্ট নিরানব্বই ভাগ তাঁর নিজের নিকট রেখে দিয়েছেন, যা দিয়ে তিনি মুমিন বান্দাকে মুহাব্বত করে থাকেন ।

তো লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, আল্লাহ তা'আলা বান্দার প্রতি বিভিন্ন সময়ে যে সব বালা-মুসীবত ও বিপদাপদ দেন তা-ও মূলতঃ তাঁর ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ । বস্তুতঃ বিপদাপদ দিয়ে তিনি বান্দাকে জান্নাতের উপযোগী করে নেন, তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন, গুনাহ মাফ করেন এবং সতর্ক সংকেত দিয়ে সুপথে ফিরে আসার সুযোগ করে দেন । নিম্নে বিষয়টি কিছুটা ব্যাখ্যাসহ তুলে ধরা হচ্ছে ।

কুরআন-হাদীসের বর্ণনার আলোকে মুমিন বান্দার প্রতি বিপদাপদ অবতীর্ণ হওয়ার প্রধানতঃ তিনটি কারণ জানা যায় ।

প্রথম কারণঃ পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে বান্দাকে যাচাই করা এবং তাকে জান্নাতের উপযোগী করে তোলা

www.islamijindegi.com

আল্লাহ তা‘আলা সবকিছু জানা সত্ত্বেও মাখলুককে সাক্ষী রাখার জন্য বান্দাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার লক্ষ্যে তার উপর বিপদাপদ ও পেরেশানী চাপিয়ে দেন । নিজে দেখেন এবং মাখলুককে দেখান যে, বান্দা বিপদে পড়ে তার প্রতিপালকের সঙ্গে কী আচরণ করে? সে কি আল্লাহর ফায়সালায় একাত্ম হয়ে ধৈর্যধারণ করে এবং আনুগত্য বাড়িয়ে দেয়, না কি হতাশ হয়ে বিদ্রোহ করে বসে এবং নাফরমানীতে লিপ্ত হয় । বাস্তবতা হল, অধিকাংশ বান্দা-ই এই পরীক্ষায় অযোগ্যতার পরিচয় দেয় । যেমন আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

وَاِذَا اَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوْا بِهَا – وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيهِمْ اِذَاهُمْ يَقْنَطُوْنَ – سورة الروم ٣٦

অর্থঃ আর যখন মানুষকে আমি কিছু অনুগ্রহ উপভোগ করাই তখন তারা আনন্দিত হয়; আর যদি তাদের উপর তাদের নিজেদের পূর্বকৃতকর্মের কারণে কোন বিপদ নেমে আসে, তখন তারা হতাশ হয় । (সূরা রুম-৩৬)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে –

وَاَمَّا اِذَا مَا ابْتَلٰهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُوْلُ رَبِّيْ اَهَانَنِ سورة الفجر - ١٦

অর্থঃ আর যখন আল্লাহ তার বান্দার রিযিক সংকুচিত করে তাকে পরীক্ষা করেন তখন সে বলে, আমার প্রতিপালক আমাকে অপমান করেছেন । (আল্লাহর পানাহ) সূরা ফাজর-১৬০

অনুরূপভাবে আল্লাহ তা‘আলা ঝালিয়ে দেখেন যে, বান্দা জান্নাতের অনন্ত-অফুরন্ত নেয়ামতরাজির উপযুক্ত কি না । কারণ জান্নাত কোন সস্তা সওদা নয়; বিনা যোগ্যতায় কাউকে তা প্রদান করা হয় না । জান্নাত তো আল্লাহ তা‘আলা মুমিনের জান ও মালের বিনিময়ে খরীদ করে নিয়েছেন। তো আল্লাহ তা’আলার তার খরীদা (বস্তুর) উপর বিপদাপদ দিয়ে পরীক্ষা করে দেখেন যে, বান্দা এসব পরিস্থিতিতে কি আচরণ করে একজন কৃতজ্ঞ বান্দার পরিচয় দেয়, না কৃতঘ্ন আচরণ করে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা‘আলার বাণী-১

الم ﴿١﴾ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿٢﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّـهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ

অর্থঃ আলিফ-লাম-মীম (এর অর্থ আল্লাহ জানেন) । তারা কি এ ধারণা করেছে যে, একথা বলেই অব্যাহতি পারে যে, ‘আমরা ঈমান এনেছি‘- আর তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? আর আমি তাদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম যারা তাদের পূর্বে অতীত হয়ে গেছে সুতরাং আল্লাহ সেই লোকদেরকে জেনে নিবেন- যারা সত্যবাদী ছিল এবং মিথ্যাবাদীদেরকেও জেনে নিবেন । (সূরা আনকাবূত-১-৩)

আল্লাহ তা ‘আলার বাণী-২

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم ۖ مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴿٢١٤﴾

অর্থঃ তোমরা কি মনে কর যে, (বিনা শ্রমে) জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ এখনও পূর্ববর্তীদের ন্যায় তোমাদের সামনে কোন কঠিন বিপদের ঘটনা ঘটেনি । যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়েছে তাদের উপর এমন এমন অভাব ও বিপদ-আপদ এসেছিল এবং তারা এমন প্রকম্পিত হয়েছিল যে, স্বয়ং রাসূল ও তার মুমিন সাথীরা বলে উঠেছিলেন, ‘আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে?‘ স্মরণ রেখো! আল্লাহর সাহায্য আসন্ন । (সূরা বাকারা-২১৪)

আল্লাহ তা‘আলার বাণী-৩

وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾

অর্থঃ আমি তোমাদেরকে কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষয়-ক্ষতি দ্বারা অবশ্যই পরীক্ষা করব । আপনি সুসংবাদ দিন ধৈর্যশীলদেরকে । (সূরা বাকারা-১৫৫)

আল্লাহ তা‘আলার বাণী-৪

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ ﴿٣١﴾

অর্থঃ আমি অবশ্যই তোমাদের সকলকে পরীক্ষা করব তাদেরকে জেনে নেয়ার জন্য, যারা তোমাদের মধ্যে দ্বীনের জন্য ত্যাগী ও দৃঢ় পদ । আর তোমাদের অবস্থাও আমি যাচাই করে নেব । (সূরা মুহাম্মদ-৩১)

আল্লাহ তা‘আলার বাণী-৫

وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۖ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٣٥﴾

অর্থঃ আমি তোমাদেরকে বিপদ ও নিয়ামত দ্বারা বিশেষভাবে পরীক্ষা করে থাকি এবং আমারই নিকট তোমরা প্রত্যানীত হবে । (সূরা আম্বিয়া-৩৫)

এ প্রসঙ্গে নবীজীর বাণী

عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضى فله الرضا ومن سخط فله السخط رواه الترمذى الحديث (২৩৯৬)

অর্থঃ হযরত আনাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, বড় প্রতিফল বড় বিপদের বিনিময়েই । আল্লাহ তা‘আলা যখন কোন সম্প্রদায়কে ভালোবাসেন তাদেরকে বিপদাপদ দিয়ে পরীক্ষা করেন । সুতরাং যে

www.islamijindegi.com

এতে সন্তুষ্ট থাকে তার জন্য আল্লাহ তা'আলার সন্তোষই রয়েছে এবং বিপদে যে অসন্তুষ্ট তার জন্য অসন্তোষই রয়েছে। (তিরমিযী)

উপর্যুক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহ দ্বারা জানা গেল যে, আল্লাহ তা'আলা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাই-বাছাইয়ের উদ্দেশ্যে বান্দার উপর বিপদাপদ চাপিয়ে দেন।

দ্বিতীয় কারণঃ সতর্ক সংকেত দিয়ে গোমরাহী থেকে হেদায়াতের পথে ফিরে আসার সুযোগ প্রদান

বান্দা যখন অপরাধের মাত্রা ছাড়িয়ে যায় এবং লাইনচ্যুত হয়ে পড়ে তখন আল্লাহ তা'আলা বিপদাপদের মাধ্যমে তরে জন্য কিছুটা শাস্তির ব্যবস্থা করেন- যেন তার হুশ হয় এবং সুপথে ফিরে আসে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন-১

(٢١) ذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَنُ

অর্থঃ আর আমি তাদেরকে নিকটবর্তী (ইহকালীন) শাস্তিও আস্বাদন করাব আখিরাতের সেই মহাশাস্তির পূর্বে যেন তারা (বিপদাক্রান্ত হয়ে সুপথে) ফিরে আসে। (সূরা আলিফ-লাম-মীম-সিজদা-২১)

আল্লাহ তা'আলা বলেন-২

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِى عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

অর্থঃ (স্থলভাগে) ও জলভাগে মানুষের নিজ কৃতকর্মসমূহের দরুন নানা প্রকার বালা-মুসীবত ছড়িয়ে পড়ছে, যেন আল্লাহ তাদের মন্দ কাজের কিছু অংশের স্বাদ উপভোগ করান, যাতে তারা (তা হতে) ফিরে আসে। (সূরা রুম-৪১)

আল্লাহ তা'আলা বলেন-৩

وَبَلَوْنَاهُم بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٦٨﴾

অর্থঃ আর আমি তাদেরকে পরীক্ষা করে থাকি, সু-অবস্থা ও দুরবস্থা দ্বারা, যেন তারা ফিরে আসে। (সূরা আরাফ-১৬৮)

আল্লাহ তা 'আলা বলেন -৪

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ﴿٤٢﴾

অর্থঃ আর আমি আপনার পূর্বে অন্যান্য উম্মতের নিকটও পয়গাম্বর প্রেরণ করেছিলাম, অনন্তর আমি তাদেরকে অভাব-অনটন ও রোগ-ব্যাধি দ্বারা পাকড়াও করেছিলাম, যেন তারা বিনীত হয়ে পড়ে। (সুরা আনআম-৪২)

www.islamijindegi.com

জানা গেল, আল্লাহ তা'আলা মানুষের উপর বিপদাপদ অবতীর্ণ করে তাদেরকে সুপথে ফিরিয়ে আনতে চান। আর বলাবাহুল্য যে, এতে আল্লাহ তা'আলার কোন ফায়দা নেই; বরং সুপথে প্রত্যাবর্তনের যা লাভ তার পুরোটাই স্বয়ং সেই বান্দার।

তৃতীয় কারণঃ বান্দার গুনাহ মাফ ও মর্যাদা বৃদ্ধি করা

আল্লাহ তা'আলা কখনও বান্দার মর্যাদা বৃদ্ধি করার জন্য তাকে বিপদাপদ ও বালা-মুসীবতে গ্রেফতার করে থাকেন। অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে একটি বিশেষ মর্যাদা প্রদান করতে চান; কিন্তু বান্দার পক্ষে আমলের দ্বারা সেই মর্যাদা লাভ করা সম্ভব নয়। অথবা তিনি বান্দার গুনাহ ক্ষমা করে দিতে চান কিন্তু বান্দা তাওবা-ইস্তিগফারে মনোযোগী নয়; তখন আল্লাহ তা'আলা বান্দার উপর বিপদাপদ চাপিয়ে দেন। ফলে বান্দা সেই বিপদে ধৈর্যধারণ করে এবং তার অন্তরও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, এর দ্বারা আল্লাহর তা'আলা তাকে নির্ধারিত সেই মর্যাদা দান করেন এবং তার গুনাহ মাফ করে দেন।

এ প্রসঙ্গে হাদীসের বাণী-১

عن اَبي هر ير ة رضي ا لله عليه قا ل قا ل رسو ل ا الله صلي الله انَّ الرَّ جُلَ لَيَكُوْ نُ لَه عِنْدَ اللهِ ا لْمَنْزِ لَةُ فَمَا يَبْلُغُهَا بِعَمَلِه فَمَا يَزَ ا لُ ا للهُ يَبْتَلِيْه بِمَا يَكْرَ هُ حَتّي يَبْلُغَهَا

অর্থঃ হযরত আবূ হুরাইরা রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলার নিকট কোন ব্যক্তির জন্য একটি উচ্চ মর্যাদা নির্ধারিত থাকে। কিন্তু সে নিজের আমলের মাধ্যমে উক্ত মর্যাদায় পৌছতে পারে না। তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে এমন এমন জিনিসের দ্বারা আক্রান্ত করতে থাকেন যা তার জন্য বাহ্যিকভাবে কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। (যেমন রোগ-শোক, দুশ্চিন্তা ইত্যাদি) অবশেষে সে এসব পেরেশানীর উসিলায় উক্ত মর্যাদায় পৌঁছে যায়। (মুসনাদে আবূ ইয়ালা, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৩/১৩)

এ প্রসঙ্গে নবীজীর বাণী-২

عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا يصيب عبدا نكبة فما فوقها أو دونها إلا بذنب وما يغفو الله عنه أكثر قال وقرأ { وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير } رواه الترمذى الحديث (٣٢٥٢)

অর্থঃ হযরত আবূ মূসা আশআরী রা. হতে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, বান্দার প্রতি যে দুঃখ পৌঁছে থাকে, চাই তা বড় হোক বা ছোট হোক- তা নিশ্চয়ই অপরাধের কারণে, অবশ্য আল্লাহ তা'আলা তার অধিকাংশ গুনাহগুলি নিজ দয়ায় ক্ষমা করে দেন। অতঃপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সমর্থনে আয়াত তিলাওয়াত করলেন-

وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير

www.islamijindegi.com

অর্থঃ তোমাদের প্রতি যে বিপদ পৌঁছে, তা তোমাদের কৃতকর্মের দরুন, আর আল্লাহ অনেক গুনাহ ক্ষমা করে দেন। (তিরমিযী)

হাদীসের বাণী-৩

عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا كثرت ذنوب العبد و لم يكن له ما يكفرها من العمل ابتلاه الله عز و جل بالحزن ليكفرها عنه رواه احمد الحديث (٢٥٢٧٥)

হযরত আয়েশা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন বান্দার গুনাহ অধিক হয়ে যায় এবং সেগুলোর প্রায়শ্চিত্তের মত তার কোন নেক আমল না থাকে তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে বিপদ দ্বারা চিন্তাগ্রস্ত করেন যাতে তার গোনাহের প্রায়শ্চিত্ত করে দিতে পারেন। (আহমদ)

হাদীসের বাণী-৪

عن محمود بن لبيد ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ان الله عز و جل إذا أحب قوما ابتلاهم فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع. رواه أحمد الحديث (٢٣٦٧٢)

অর্থঃ হযরত মাহমূদ ইবনে লাবীদ রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা যখন কোন সম্প্রদায়কে ভালোবাসেন, তখন তাদেরকে (বিপদে ফেলে) পরীক্ষা করেন। তারপর যে ধৈর্যধারণ করে তার জন্য ধৈর্যধারণ (এর অফুরন্ত সাওয়াব) লিখা হয়, আর যে অধৈর্য হয়ে পড়ে তার জন্য বে-সবরী (এর গুনাহ) লিখে দেয়া হয়। (ফলে সে কেবল কান্নাকাটি ও হা-হুতাশ-ই করতে থাকে)। (মুসনাদে আহমাদ, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৩/১১)

উপর্যুক্ত প্রমাণসমৃদ্ধ আলোচনা দ্বারা স্পষ্ট হল যে, আল্লাহ তা'আলা মুমিন বান্দাকে ধ্বংস করার জন্য বিপদে নিপতিত করেন না। বরং তাকে ভালোবাসেন বলেই বিপদাপদের মাধ্যমে তাকে জান্নাতের উপযোগী করে তুলতে চান; তার মর্যাদা বৃদ্ধি করতে ও গুনাহ মাফ করতে চান, সর্বোপরি সতর্ক সংকেত দিয়ে তাকে ভালো হওযার সুযোগ দিতে চান।

বিপদগ্রস্ত কোন ব্যক্তি তা সে যত বড় বিপদেই আক্রান্ত হোক না কেন, উপর্যুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চিন্তা করলে বিপদে তার ধৈর্যধারণ অত্যন্ত সহজ হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে প্রথমত বিপদাপদ থেকে হিফাযত করুন, দ্বিতীয়ত কোন কারণে বিপদাপদ এসে গেলে তাতে ধৈর্যধারণ করার এবং তা থেকে উপকৃত হওয়ার ও নসীহত হাসিল করার তৌফিক দান করুন -আমীন।

এখন আমরা বিপদাপদে করণীয় নিয়ে আলোচনা করব, ইনশাআল্লাহ।

www.islamijindegi.com

বিপদাপদে করণীয়-১

এটাকে সতর্ক সংকেত মনে করবে পূর্বে বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা পরীক্ষা গ্রহণ, মর্যাদা বৃদ্ধি, গুনাহ মাফ এবং সতর্ক সংকেত হিসেবে বিপদাপদ দিয়ে থাকেন, কিন্তু একজন মুমিন বিপদগ্রস্ত হলে সর্বপ্রথম সে এটাকে নিজের মন্দ আমলের প্রতিক্রিয়া মনে করবে এবং ধারণা করবে যে, সতর্ক করে দেয়ার জন্যই তাকে বিপদে গ্রেফতার করা হয়েছে । এর উপকারিতা হল, এতে সে ভীত-কম্পিত হয়ে পূর্বকৃত আমলের হিসাব-নিকাশ শুরু করবে এবং ভুল-ভ্রান্তিগুলো চিহ্নিত করবে অতঃপর তাওবা-ইস্তিগফার করে আমল সংশোধনের ফিকির করবে । পক্ষান্তরে যদি সে এটাকে সতর্ক সংকেত মনে না করে প্রথমেই মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ মনে করে বসে, তাহলে সে নিজের প্রতি সুধারণা বশতঃ আমল সংশোধনে মনোযোগী হবে না । ফলে অবশেষে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে । কেননা, হয়তো বিপদ এসেছিল তাকে সতর্ক করতে কিন্তু সে রয়ে গেল আগের মতই নিচেষ্ট ও উদাসীন । তবে আমল সংশোধন করে নেয়ার পর বিপদাপদকে গুনাহ মাফ ও মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ মনে করাতে কোন সমস্যা নেই, বরং সেটা আরও ভালো । কেননা, এতে মনোবল চাঙ্গা থাকে, হতাশা দূরীভূত হয় এবং ইহতিসাব তথা সওয়াবের নিয়ত থাকাতে অতিরিক্ত সাওয়াবও পাওয়া যায়।

করণীয়-২

সবর ও ধৈর্য অবলম্বন করা

বিপদাক্রান্ত হয়ে সবর অবলম্বন করা এবং আল্লাহ তাআলার ফায়সালায় (সন্তুষ্ট) থাকা অত্যন্ত জরুরী । তবে সেটা হতে হবে বিপদের প্রথম প্রহরে । কারণ, শেষ পর্যন্ত সকলেই ধৈর্য ধরতে বাধ্য হয়, কিন্তু তখন সেই ধৈর্যের আর কীইবা মূল্য থাকে? তবে সবর ও সন্তুষ্টি আল্লাহ ওয়ালাদের সুহবতের মাধ্যমেই হাসিল হয় ।

হাদীসের বাণী

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِامْرَأَةٍ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرٍ فَقَالَ اتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِى قَالَتْ إِلَيْكَ عَنِّي فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيبَتِي وَلَمْ تَعْرِفْهُ فَقِيلَ لَهَا إِنَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَتْ بَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِينَ فَقَالَتْ لَمْ أَعْرِفْكَ فَقَالَ إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى. رواه البخارى الحديث(١٢٨٣)

তরজমাঃ হযরত আনাস রা. বলেন, একদা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পথ চলতে চলেতে এমন এক মহিলার নিকট পৌঁছলেন, যে একটি কবরের নিকট কাঁদছিল, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, দেখ, আল্লাহকে ভয় কর এবং ধৈর্য ধর । সে বলল, আমার নিকট হতে সরে যাও, তুমি আমার বিপদে পড় নি । সে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে চিনতে পারেনি । তারপর তাকে বলা হল, ইনি তো নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.islamijindegi.com

ওয়াসাল্লাম। একথা শুনে সে নবীজীসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরজায় আসল এবং সেখানে কোন দারোয়ান দেখতে পেল না । তারপর সে বলল, হুযূরসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি আপনাকে তখন চিনতে পারিনি! হুযুরসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, প্রকৃত ধৈর্যতো বিপদের প্রথম প্রহরে । (মন শান্ত হয়ে গেলে ধৈর্যের কোন অর্থ থাকে না) । (বুখারী,মুসলিম ও মুসনাদে আহমদ-৫/২৪২)

বিপদে ধৈর্যধারণ করা আম্বিয়া কেরামের আ. সুন্নাত

আল্লাহ তাআলার বাণী

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ﴿٣٥﴾

(১) অর্থঃ (হে নবী) আপনি ধৈর্যধারণ করুন, যেমন অন্যান্য দৃঢ় সংকল্প রাসূলগণ ধৈর্যধারণ করেছিলেন। (সূরা আহক্বাফ-৩৫)

وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ (الأنبياء:85

(২) অর্থঃ আর ইসমাইল, ইদরীস ও যুলকিফলদের আলোচনা করুন, তারা সকলেই ধৈর্যশীল দৃঢ়পদ ছিলেন। (সূরা আম্বিয়া-৮৫)

وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٧﴾

(৩) (হযরত লুকমান (আঃ) তার ছেলেকে নসীহত করে বললেন!) হে বৎস! যে বিপদ তোমার উপর আপতিত হয় তাতে তুমি ধৈর্যধারণ করবে । (সূরা লোকমান)

وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا ۚ وَعَلَى اللَّـهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿١٢﴾

(৪) (রাসূলগণ কাফিরদিগকে বললেন) তোমরা আমাদেরকে যেসব কষ্ট দিয়েছো, আমরা তাতে সবর করবো; আর আল্লাহরই উপর ভরসাকারীদের ভরসা করা উচিত । (সূরা ইবরাহীম-১২)

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ ﴿١٣٠﴾

(৫) অতএব আপনি (হে মুহাম্মদ!) তাদের (কুফর মিশ্রিত) বাক্যাবলীর প্রতি ধৈর্যধারণ করুন এবং নিজ রবের প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ করতে থাকুন । (সূরা ত্ব-হা-১৩০)

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا ۚ ﴿٣٤﴾

(৬) আর বহু পয়গম্বর যারা আপনার পূর্বে অতীত হয়েছেন, তাদেরকেও মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা হয়েছিল, তাঁরা সবরই করেছিলেন তাঁদেরকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার ও তাদেরকে যাতনা দেয়ার প্রতি, যে পর্যন্ত না তাঁদের নিকট আমার সাহায্য পৌঁছেছিল । (সূরা আনআম-৩৪)

সবরের ফযীলত

আল্লাহ তাআলার বাণী

إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿١١١﴾

(১) আমি আজ তাদেরকে তাদের ধৈর্যের পুরস্কার এই দিলাম যে, তারা সফলকাম হয়েছে। (সূরা মুমিনুন-১১১)

وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿٤٣﴾

(২) আর যে ধৈর্য ধরে এবং ক্ষমা করে দেয়, এটা অবশ্য সাহসিকতাপূর্ণ কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত। (সূরা -শূরা -৪৩)

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّـهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُولَـٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾

(৩) আর সুসংবাদ শুনিয়ে দিন এমন ধৈর্যশীলদেরকে যখন তাদের উপর মুসীবত আসে, তখন বলে, আমরা তো আল্লাহরই আয়ত্তে, আর আমরা সকলে আল্লাহরই সমীপে প্রত্যাবর্তনকারী। তাদের প্রতি বর্ষিত হবে বিশেষ করুণাসমূহ তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে এবং সাধারণ করুণাও। আর এরাই এমন লোক যারা হেদায়াত প্রাপ্ত হয়েছে। (সূরা বাকারা ১৫৫-১৫৭)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّـهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٣﴾

(৪) হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামায দ্বারা সাহায্য কামনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে থাকেন। (সূরা বাকারা-১৫৩)

مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ ۖ وَمَا عِندَ اللَّـهِ بَاقٍ ۗ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾

(৫) যা কিছু তোমাদের নিকট আছে, তা নিঃশেষ হয়ে যাবে, আর যা আল্লাহর নিকট আছে, তা চিরন্তন থাকবে; আর যারা ধৈর্যধারণ করবে আমি অবশ্যই তাদের পুরস্কার প্রদান করব তাদের ভাল কাজের বিনিময়ে। (সূরা-নাহল-৯৬)

وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴿١٢﴾ مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ۖ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ﴿١٣﴾

(৬) আর তাদের ধৈর্যের বিনিময়ে তাদেরকে জান্নাত এবং রেশমী পোশাক প্রদান করবেন। এমতাবস্থায় যে, তারা তার মধ্যে পালঙ্কের উপর হেলান দিয়ে থাকবে, সেখানে তারা না উত্তাপ ভোগ করবে আর না শীত (বরং পরিবেশ হবে নাতিশীতোষ্ণ)। (সূরা- দাহর-১২-১৩)

www.islamijindegi.com

لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَـٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۖ وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

(৭) বরং নেক কাজ তো এটা যে, কোন ব্যক্তি ঈমান রাখে আল্লাহর প্রতি, কিয়ামত দিবসের প্রতি ..... আর যারা ধৈর্যধারণ করে অভাব অনটনে, অসুখে-বিসুখে ও যুদ্ধ-জিহাদে। এরাই সত্যিকারের মানুষ, এরাই সত্যিকারের খোদাভীরু। (সূরা বাকারা-১৭৭)

সবর সংক্রান্ত হাদীসের বাণী

عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « عَجَبًا لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لأَحَدٍ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ »رواه مسلم الحديث.(৭৬৯২)

অর্থঃ হযরত সুহাইব রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুমিনের অবস্থা কি অদ্ভুত যে, তার সকল অবস্থাই কল্যাণকর! আর এটা কেবল (মুমিনের) বৈশিষ্ট্য। যদি সে কল্যাণপ্রাপ্ত হয় তবে আল্লাহ শোকরগুজারী করে। তো এটা তার জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। আর যদি তার উপর মুসীবত আসে তবে সে সবর করে। তো এটাও তার জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। (মুসলিম শরীফ, হাদীস নং ৭৪৬০/৬৪)

করণীয়-৩: প্রত্যেক বিপদের বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা কী পুরস্কার ও সাওয়াব প্রদান করবেন তা স্মরণ করা এবং সেই সাওয়াব অর্জনের ইয়াক্বীন রাখা, আর এর দ্বারা সান্ত্বনা লাভ করা।

নিম্নে বিভিন্ন প্রকার বিপদের ফযীলত সম্বলিত হাদীস তুলে ধরা হচ্ছে।

সন্তান হারানোর ফযীলত

عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال (لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النار إلا تحلة القسم) رواه البخارى الحديث(৬২৮০)

হযরত আবূ হুরাইরা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছে, যে মুসলমানের তিনটি সন্তান মৃত্যুবরণ করে, দোযখের আগুন তাকে স্পর্শ করবে না। (আল আদাবুল মুফরাদ লিল বুখারী- হাদীস নং-১৪৩)

www.islamijindegi.com

عن أبي هريرة أن امرأة اتت النبي صلى الله عليه و سلم بصبي فقالت ادع له فقد دفنت ثلاثة فقال احتظرت بحظار شديد من النار

হযরত আবূ হুরাইরা রা. বলেন, একদা জনৈকা মহিলা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে একটি শিশুসন্তানসহ উপস্থিতি হল এবং বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এর জন্য দুআ করুন । আমি তো ইতিমধ্যেই তিনটি সন্তানকে সমাধিস্থ করেছি । তিনি ইরশাদ করলেন, তা হলে তো তুমি দোযখের মুকাবিলায় মজবুত প্রতিবন্ধক গড়েছো । (আল আদাবুল মুফরাদ- হাদীস নং ১৪৪)

عن خالد العبسي قال مات بن لي فوجدت عليه وجدا شديدا فقلت يا أبا هريرة ما سمعت من النبي صلى الله عليه و سلم شيئا تسخى به أنفسنا عن موتانا قال سمعت من النبي صلى الله عليه و سلم يقول صغاركم دعاميص الجنة الأدب المفرد الحديث(١٤٥)

হযরত খালিদ আবসী বলেন, আমার একটি পুত্র সন্তান মৃত্যুবরণ করল। আমি নিদারুণ মর্মাহতে হয়ে পড়লাম। তখন আমি বললাম, হে আবূ হুরাইরা! আপনি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এমন কিছু শুনেছেন- যা দ্বারা আমার পুত্রের মৃত্যুর শোকের মধ্যে একটু সান্ত্বনা লাভ করতে পারি? তিনি বললেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তোমাদের ছোট ছোট শিশু সন্তান বেহেশতের পানির জীব স্বরূপ। (আল আদাবুল মুফরাদ, হাদীস নং-১৪৫)

عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من مات له ثلاثة من الولد فاحتسبهم دخل الجنة قلنا يا رسول الله واثنان قال واثنان قلت لجابر والله أرى لو قلتم وواحد لقال قال وأنا أظنه والله. نفس المصدر الحديث (146)

হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রা. বলেন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতে শুনেছি, যার তিনটি সন্তান মৃত্যুমুখে পতিত হল এবং সে সাওয়াবের আশায় ধৈর্যধারণ করল, সে অবশ্যই বেহেশতে যাবে । আমরা বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আর যার দুটি সন্তান মৃত্যুমুখে পতিত হল (তার অবস্থা কী হবে?) ইরশাদ করলেন, এবং যার দু'টি সে-ও । জাবির রা. এর বরাত দিয়ে বর্ণনাকারী মাহমূদ ইবনে লাবীদ বলেন, আমি জাবিরকে খোদার কসম দিয়ে বললাম, আমার তো মনে হয়, যদি আপনি এক সন্তানের মৃত্যুর কথা বলতেন, তবুও তিনি তা-ই বলতেন । তিনি বললেন, কসম আল্লাহর, আমার ধারণাও তাই। (আল আদাবুল মুফরাদ- হাদীস নং - ১৪৬)

عن أبي موسى الاشعرى :(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدى ؟ فيقولون نعم فيقول اقبضتم ثمرة فؤاده فيقولون : نعم فيقول

www.islamijindegi.com

: ما ذا قال عبدى ؟ فيقولون حمدك واسترجع ، فيقول الله : ابنوا لعبدى بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد) . رواه الترمذى الحديث(٢٤٣)

হযরত আবূ মূসা আশআরী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন কোন বান্দার সন্তান মারা যায়, আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের বলেন, তোমরা কি আমার বান্দার সন্তান উঠিয়ে নিলে? তারা উত্তর দিয়ে থাকেন- হ্যাঁ খোদা । তিনি আবার জিজ্ঞেস করেন তোমরা কি তার অন্তরের ধন কেড়ে দিলে? তারা বলে, হ্যাঁ খোদা । তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, তখন আমার বান্দা কি বললো? তারা উত্তরে বলেন, তখন সে আপনার প্রশংসা করল এবং ইন্নালিল্লাহ ..... বলল । তখন আল্লাহ পাক বলেন, আমার বান্দার জন্য বেহেশতে একটি ঘর নির্মাণ কর আর এর নাম রাখ বাইতুল হামদ । (মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী)

ঘনিষ্ঠ ব্যক্তির মৃত্যুর আঘাত সহ্য করার উপর সাওয়াবের আশা রাখার ফযীলত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى مَا لِعَبْدِى الْمُؤْمِنِ عِنْدِى جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ إِلاَّ الْجَنَّةُ.رواه البخارى الحديث (٦٤٢٢)

হযরত আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ পাক বলেন, আমার মুমিন বান্দা- যখন আমি তার দুনিয়ার কোন প্রিয়ভাজনকে উঠিয়ে নেই আর সে (এই আঘাত পেয়ে সবর করে ও প্রতিদানে) সওয়াবের আশা রাখে তার জন্য আমার নিকট জান্নাত ব্যতীত কোন পুরস্কার নেই । (বুখারী হাদীস নং- ৬৪২২)

ব্যাখ্যাঃ صَفِيّ অর্থ প্রিয়ভাজন । এর মধ্যে মাতা-পিতা, স্ত্রী-সন্তান, আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-বান্ধব সবাই শামিল ।

রোগীর রোগ-যাতনা তার গুনাহের কাফফারা স্বরূপ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلاَ وَصَبٍ وَلاَ هَمٍّ وَلاَ حُزْنٍ وَلاَ أَذًى وَلاَ غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا إِلاَّ كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ. رواه البخارى الحديث(٥٦٤١)

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী ও হযরত আবূ হুরাইরা রা. বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুসলিম বান্দার উপর রোগ-শোক, দুখ-কষ্ট, দুর্ভাবনা যাই আসুক না কেন, এমনকি একটি কাঁটাও যদি তার গায়ে বিঁধে তবে তা দ্বারা আল্লাহ তাআলা তার গুনাহসমূহের কাফফারা করে থাকেন । (আল আদাবুল মুফরাদ ৪৯৪)

www.islamijindegi.com

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده وأهله وماله حتى يلقى الله عز و جل وما عليه خطيئة. رواه البخارى فى الأدب المفرد الحديث (১৯৫)

হযরত আবূ সালামা ও হযরত আবূ হুরাইরা রা. বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মুমিন পুরুষ ও নারীর জান ও মাল এবং পরিবার পরিজনের (অন্য বর্ণনা মতে এবং তার সন্তানের উপর) বালা-মুসিবত লেগেই থাকে, অতঃপর সে আল্লাহ তাআলার সন্নিধানে এমন অবস্থায় উপনীত হয় যে, তার আর কোন গুনাহই বাকী থাকে না। (আল আদাবুল মুফরাদ হাঃ নং- ৪৯৬)

عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه و سلم قال إذا اشتكى المؤمن أخلصه الله كما يخلص الكير خبث الحديد. رواه البخارى فى الأدب المفرد الحديث(৪৯৯)

হযরত আয়িশা রা. বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন কোন মুমিন ব্যক্তি অসুস্থ হয়, তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে গুনাহরাশি হতে এমনভাবে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করে ফেলেন যেমন লোহার জংকে কামারের হাপর পরিষ্কার করে দেয়। (আল আদাবুল মুফরাদ হাঃ নং ৪৯৯)

জ্বরের ফযীলত

عن أبي هريرة قال : ما من مرض يصيبنى أحب إلى من الحمى لأنها تدخل في كل عضو منى وان الله عز و جل يعطى كل عضو قسطه من الأجر. رواه البخارى فى الأدب المفرد الحديث

হযরত আবূ হুরাইরা রা. বলেন, আমার নিকট জ্বরের চেয়ে প্রিয়তর আর কোন রোগ নেই। কেননা, এটা আমার প্রতিটি অঙ্গ- প্রত্যঙ্গে প্রবেশ করে। আর আল্লাহ তাআলা এর বিনিময়ে প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে তার প্রাপ্য সাওয়াব প্রদান করে থাকেন। (আল আদাবুল মুফরাদ, হাঃ নং ৫০৫)

কাঁটা বেঁধার ফযীলত

أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقول : ما أصاب المؤمن من شوكة فما فوقها فهو كفارة. رواه البخارى فى الأدب المفرد الحديث

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায়ই বলতেন, মুমিন বান্দার গায়ে কোন কাঁটা বেঁধা হতে শুরু করে ছোট বড় যত বিপদই আপতিত হয় তাতে তার গুনাহের কাফফারা হয়ে যায়। (আল আদাবুল মুফরাদ হাঃ নং ৫০৮)

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما من مسلم يشاك شوكة في الدنيا يحتسبها إلا قضى بها من خطاياه يوم القيامة. رواه البخارى فى الأدب المفرد الحديث

www.islamijindegi.com

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে কোন মুসলমানের গায়ে এই দুনিয়ার একটি কাঁটা বিধে এবং সে তার বিনিময়ে সাওয়াবের আশা রাখে তাহলে এর জন্য কিয়ামতের দিন তার গুনাহরাশি মার্জনা করা হবে । (আল আদাবুল মুফরাদ, হাদীস নং-৫০৯)

মহামারী ও প্লেগে নিহত ব্যক্তির ফযীলত

عن العرباض بن سارية أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : يختصم الشهداء والمتوفون على فرشهم إلى ربنا في الذين يتوفون من الطاعون فيقول الشهداء إخواننا قتلوا كما قتلنا ويقول المتوفون على فرشهم إخواننا ماتوا على فرشهم كما متنا فيقول ربنا انظروا إلى جراحهم فإن أشبه جراحهم جراح المقتولين فإنهم منهم ومعهم فإذا جراحهم قد أشبهت جراحهم.رواه النسائى فى سننه الحديث

হযরত ইরবায ইবনে সারিয়া রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যুদ্ধে শহীদগণ ও ঘরে বিছানায় মৃতব্যক্তিগণ মহামারীতে মৃত ব্যক্তিদের সম্পর্কে পরওয়ারদেগারে আলমের নিকট দাবী পেশ করবেন । শহীদগণ বলবেন, এরা আমাদের ভাই । কারণ তারা আঘাতে নিহত হয়েছে, যেরূপ আমরা নিহত হয়েছি । আর ঘরে বিছানায় মৃতগণ বলবেন, এরা আমাদের দলভুক্ত; এরা তাদের ঘরে মরেছে যেরূপ আমরা মরেছি । তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, এদের শরীরের আঘাতের দিকে দেখ, এদের আঘাত যদি শহীদদের আঘাতের অনুরূপ হয় তা হলে তারা শহীদগণের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং শহীদগণের সঙ্গেই থাকবে । পরে দেখা যাবে যে, তাদের আঘাত শহীদগণের আঘাতের অনুরূপ । (আহমাদ ও নাসায়ী)

وعن انس رضـــ قال: الطاعون شهادة كل مسلم. اخرجه البخارى ومسلم

হযরত আনাস রা. বলেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহামারী প্রত্যেক মুসলমানের জন্য শাহাদাত স্বরূপ । (বুখারী,মুসলিম)

পেটের পীড়ার ফযীলত

عَنْ سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ قَالَ: قال رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَهُ بَطْنُهُ فَلَنْ يُعَذَّبَ فِي قَبْرِهِ قَالَ الْآخَرُ بَلَى. رواه أحمد

হযরত সুলাইমান ইবনে সুরাদ রা. বলেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন, যাকে তার পেটের পীড়া (পাকস্থলী, হার্ট, ফুসফুস, লিভার, কিডনি ইত্যাদি) হত্যা করেছে, তাকে কবরে শাস্তি দেয়া হবে না । (মুসনাদে আহমদ)

মৃগী রোগের ফযীলত

www.islamijindegi.com

عن عطاء بن أبي رباح قال : قال لي ابن عباس ألا أريك امرأة من أهل الجنة ؟ قلت بلى قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت إني أصرع وإني أتكشف فادع الله لي قال (إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك) . فقالت أصبر فقالت إني أتكشف فادع الله أن لا أتكشف فدعا لها. أخرجه البخارى الحديث

তাবেয়ী হযরত আতা ইবনে আবী রবাহ বলেন, আমাকে একবার হযরত ইবনে আব্বাস রা. বললেন, (আতা!) আমি কি তোমাকে একটি বেহেশতী মহিলা দেখাব না? আমি বললাম, হ্যাঁ । তিনি বললেন, এই কালো মহিলাটি । সে একবার নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি মৃগী রোগে আক্রান্ত হই এবং আমার সতরের কাপড় ঠিক থাকে না । আল্লাহর নিকট আমার জন্য দুআ করুন । হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি তুমি ইচ্ছা কর সবর করতে পারো তখন তোমার জন্য জান্নাত রয়েছে । আর যদি ইচ্ছা কর আমি দুআ করব, আল্লাহ যেন তোমাকে আরোগ্য দান করেন । (কিন্তু সেক্ষেত্রে জান্নাতের ওয়াদা নাই) সে বলল, আমি সবর করব । অতঃপর সে বলল, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাপড় ঠিক থাকে না । দুআ করুন, আমার সতর যেন খুলে না যায় । হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য সেই দুআ করলেন । (বুখারী, মুসলিম)

চক্ষু রোগের ফযীলত

عن زيد بن أرقم يقول : رمدت عيني فعادنى النبي صلى الله عليه و سلم ثم قال يا زيد لو أن عينك لما بها كيف كنت تصنع قال كنت أصبر وأحتسب قال لو أن عينك لما بها ثم صبرت واحتسبت كان ثوابك الجنة. اخرجه البخارى فى الأدب المفرد الحديث

হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম রা. বলেন, একবার আমার চক্ষুরোগ হল, তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখতে আসলেন । তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, যায়েদ! এভাবে যদি তোমার চক্ষুরোগ অব্যাহত থাকে তবে তুমি কি করবে? আমি বললাম, আমি সবর করব এবং সাওয়াবের প্রত্যাশা করব । তিনি বললেন, এভাবে তোমার চক্ষুরোগ যদি অব্যাহত থাকে আর তুমি তাতে সবর কর ও সাওয়াবের প্রত্যাশা কর তবে তুমি এর বিনিময়ে জান্নাত লাভ করবে । (আল আদাবুল মুফরাদ হাঃ নং ৫৩৪)

عن أنس قال سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول قال الله عز و جل : إذا ابتليته بحبيبتيه يريد عينيه ثم صبر عوضته الجنة. اخرجه البخارى فى الأدب المفرد الحديث

হযরত আনাস রা. বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তাআলা (কিয়ামতের দিন) বলবেন, যখন আমি আমার বান্দাকে তার প্রিয় বস্তু দুটির পরীক্ষায় (অর্থাৎ, চক্ষুদ্বয়ের পীড়ায় বা অন্ধ হয়ে

www.islamijindegi.com

যাওয়ার মুসীবতে) লিপ্ত করেছি, আর তাতেও সে ধৈর্যধারণ করেছে, বিনিময়ে (আজ) আমি তাকে বেহেশত প্রদান করলাম । (আল আদাবুল মুফরাদ- হাং নং-৫৩৬)

রোগীর দুআ ফেরেশতার দুআর মত মকবুল

عن عمر بن الخطاب ، قال : قال لى النبي صلى الله عليه وسلم " إذا دخلت على مريض فمره أن يدعو لك . فإن دعاءه كدعاء الملائكة " . أخرجه ابن ماجة فى سننه الحديث

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তুমি কোন রোগীর নিকট যাবে, তাকে তোমার জন্য দুআ করতে বলবে, কেননা তার দুআ ফেরেশতাদের দুআর ন্যায় (মকবুল)- ইবনে মাজাহ

(অসুস্থ) ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হওয়ার পূর্বের অভ্যাস অনুযায়ী ইবাদাতের সাওয়াব লাভ করে থাকে

عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ما من أحد يمرض إلا كتب له مثل ما كان يعمل وهو صحيح. أخرجه البخارى فى الأدب المفرد الحديث

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে কোন ব্যক্তি রোগগ্রস্ত হয়, সে তার রোগাক্রান্ত হওয়ার পূর্বে সুস্থাবস্থায় ইবাদত করে যেরূপ সাওয়াব লাভ করতো অসুস্থতা অবস্থায় সেরূপই ইবাদতের সাওয়াব লাভ করে । (আবু আদাবুল মুফরাদ হাঃ নং ৫০২)

عن راشد بن داود الصنعاني عن أبي الأشعث الصنعاني : انه راح إلى مسجد دمشق وهجر بالرواح فلقي شداد بن أوس والصنابحي معه فقلت أين تريدان يرحمكما الله قالا نريد ههنا إلى أخ لنا مريض نعوده فانطلقت معهما حتى دخلا على ذلك الرجل فقالا له كيف أصبحت قال أصبحت بنعمة فقال له شداد أبشر بكفارات السيئات وحط الخطايا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ان الله عز و جل يقول اني إذا ابتليت عبدا من عبادى مؤمنا فحمدني على ما ابتليته فإنه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من الخطايا ويقول الرب عز و جل انا قيدت عبدى وابتليته وأجروا له كما كنتم تجرون له وهو صحيح. أخرجه الإمام أحمد

হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওস এবং সুনাবেহী রা. হতে বর্ণিত আছে, তাঁরা উভয়ে এক পীড়িত ব্যক্তিকে দেখতে গেলেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন আজ সকাল কেমন যাচ্ছে? সে বলল আল্লাহর মেহেরবানীতে ভালই যাচ্ছে । একথা শুনে হযরত শাদ্দাদ বললেন, তোমার প্রতি গুনাহ মাফ ও অপরাধ মার্জনার সুসংবাদ হোক! কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি যখন আমার বান্দাদের মধ্যে কোন মুমিন বান্দাকে রোগগ্রস্ত করি, আর আমার এই রোগগ্রস্ত করা সত্ত্বেও সে আমার শোকর করে- সে

www.islamijindegi.com

তার রোগশয্যা হতে উঠবে সমস্ত গুনাহ হতে পাক সাফ হয়ে সে দিনের মত যেদিন তার মাতা তাকে প্রসব করেছিল। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা ফেরেশতাদেরকে বলেন- আমি আমার বান্দাকে বন্দী করে রেখেছি এবং রোগগ্রস্ত করেছি অতএব , তোমরা তার (সুস্থ) অবস্থায় তার জন্য যে সাওয়াব লিখতে তাই লিখতে থাকে। (মুসনাদে আহমদ)

মানুষের দেয়া কষ্টে ধৈর্যধারণ করা উত্তম

عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال المؤمن : الذى يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذى لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم . اخرجه البخارى فى الأدب المفرد الحديث

হযরত ইবনে উমর রা. বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ঈমানদার ব্যক্তি মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করে এবং তাদের দেয়া কষ্ট সহ্য করে, সে ব্যক্তি ঐ ব্যক্তি হতে উত্তম যে মানুষের সঙ্গে মেলামেশাও করে না আর তাদের দেয়া কষ্টও সহ্য করে না। (আল আদাবুল মুফরাদ হাদীস নং-৩৯০)

বিপদাপদে আক্রান্ত হওয়া ঈমানের আলামত

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثل المؤمن كمثل الزرع لا يزال الريح تفيئه ولا يزال المؤمن يصيبه بلاء ومثل المنافق كمثل شجرة الأرزة لا تهتز حتى تستحصد. اخرجه البخارى فى صحيحه الحديث

হযরত আবু হুরাইরা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুমিনের উদাহরণ শস্য গাছের মত, বাতাস তাকে সর্বদা এদিক সেদিক দোলায় এবং তার উপর সর্বদা মুসীবত পৌঁছে। আর মুনাফিকের উদাহরণ হচ্ছে পিলু গাছের ন্যায় যা দোলায় না, যাবৎ না তাকে কেটে ফেলা হয়। (বুখারী, মুসলিম)

عَنْ عَامِرٍ الرَّامِ قال: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الأَسْقَامَ فَقَالَ « إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَصَابَهُ السَّقَمُ ثُمَّ أَعْفَاهُ اللَّهُ مِنْهُ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا مَضَى مِنْ ذُنُوبِهِ وَمَوْعِظَةً لَهُ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ وَإِنَّ الْمُنَافِقَ إِذَا مَرِضَ ثُمَّ أُعْفِىَ كَانَ كَالْبَعِيرِ عَقَلَهُ أَهْلُهُ ثُمَّ أَرْسَلُوهُ فَلَمْ يَدْرِ لِمَ عَقَلُوهُ وَلَمْ يَدْرِ لِمَ أَرْسَلُوهُ ». فَقَالَ رَجُلٌ مِمَّنْ حَوْلَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الأَسْقَامُ وَاللَّهِ مَا مَرِضْتُ قَطُّ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « قُمْ عَنَّا فَلَسْتَ مِنَّا.

হযরত আমেরুর রাম রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার রোগ ব্যাধি সম্পর্কে আলোচনা করলেন এবং বললেন, মুমিনের যখন রোগ হয়, অতঃপর আল্লাহ তাহাকে আরোগ্য দান করেন, এটা তার অতীতের গুনাহর জন্য কাফফারা এবং ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষার বস্তু হয়; কিন্তু মুনাফিক

www.islamijindegi.com

যখন রোগাক্রান্ত হয়, অতঃপর তাকে আরোগ্য দান করা হয়; সে সেই উটের ন্যায় যাকে তার মালিক বেঁধেছিল অতঃপর ছেড়ে দিল। সে বুঝল না যে, কেন তাকে বেঁধেছিল এবং কেন তাকে ছেড়ে দিল। তখন এক ব্যক্তি বলে উঠল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! রোগ আবার কি? আল্লাহর কসম, আমি তো কখনও রোগাক্রান্ত হইনি! হুযূর বললেন, আমাদের নিকট থেকে উঠে যাও। কেননা তুমি আমাদের অন্তর্ভুক্ত নও। (আবু দাউদ)

কিয়ামতে বিপদগ্রস্তদের সাওয়াব দেখে সুখ-শান্তিভোগীরা নিজেদের জন্য আক্ষেপ করবে

عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض. اخرجه الترمذى فى سننه الحديث

হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সুখ-শান্তিভোগী ব্যক্তিরা কিয়ামতের দিন যখন দেখবে, বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রচুর সাওয়াব দেয়া হচ্ছে, তখন আক্ষেপ করবে- আহা! যদি তাদের চামড়া দুনিয়াতে কাঁচি দ্বারা কাটা হতো । (তিরমিযী)

মানুষের মধ্যে নবী-রাসূল (আলাইহিমুস সালাম) ও নেককার লোকদের উপর সর্বাধিক বিপদ-আপদ এসে থাকে

عن أبى سعيد الخدرى أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو موعوك عليه قطيفة فوضع يده عليه فوجد حرارتها فوق القطيفة فقال أبو سعيد ما أشد حماك يا رسول الله قال إنا كذلك يشتد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر فقال يا رسول الله أى الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الصالحون وقد كان أحدهم يبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يجوبها فيلبسها ويبتلى بالقمل حتى يقتله ولأحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء. أخرجه البخارى فى الأدب المفرد الحديث

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রা. বলেন, তিনি একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে উপস্থিতি হলেন । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন জ্বরাক্রান্ত এবং তাঁর গায়ে একখানা চাদর জড়ানো ছিল । তিনি (আবূ সাঈদ রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র দেহে হাত রাখলেন এবং উত্তাপ অনুভব করলেন । তখন আবূ সাঈদ রা. বললেন, আপনার শরীরে কী ভীষণ জ্বর ইয়া রাসূলাল্লাহ! জবাবে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, আমাদের এরূপই হয়ে থাকে । আমাদের উপর কঠিন বিপদাপদ দেখা দেয় এবং আমরা এর বদলে দ্বিগুণ সাওয়াব লাভ করে থাকি । তখন আবূ সাঈদ রা. বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কোন শ্রেণীর মানুষের

www.islamijindegi.com

উপর সর্বাধিক বিপদাপদ এসে থাকে? ইরশাদ করলেন, নবী-রাসূলগণের উপর। তারপর সালিহীন বা পুণ্যবানদের উপর। তাঁদের কেউ দারিদ্রের অগ্নিপরীক্ষায় পতিত হয়েছেন। এমনকি এক জুব্বা ছাড়া পরিধানের মত কোন বস্ত্র তার ছিল না। অগত্যা তাই ছিঁড়ে লুঙ্গী বানিয়ে পরিধান করেন। কারও শরীরে উকুন দিয়ে পরীক্ষা করা হয়, এই উকুনগুলোই শেষ পর্যন্ত তাঁকে হত্যা করে ফেলে, নিঃসন্দেহে তোমাদের মধ্যকার কেউ পুরস্কার লাভে যত খুশি হয় তাদের মধ্যকার কেউ বিপদ-আপদে ততোধিক খুশি হতেন। (আল আদাবুল মুফরাদ হাদীস নং-৫১২)

রোগী দেখতে যাওয়ার উদ্দেশ্য, ফযীলত ও দু'আ

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ কোন মুসলমান সকালে রোগী দেখতে গেলে সকাল পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেশতা তার জন্য দু'আ করতে থাকে। অনুরূপভাবে বিকালে রোগী দেখতে গেলে সকাল পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেশতা তার জন্য দু'আ করতে থাকে এবং তাকে জান্নাতের একটি বাগান দেয়া হয়। (তিরমিযী, হাদীস নং-৯৭০)

রোগী দেখতে যাওয়ার কয়েকটি উদ্দেশ্য। ক. তার সুস্থতার জন্য দু'আ করা, খ. তার নিকট দু'আ কামনা করা কারণ, তার দু'আ ফেরেশতাদের দু'আর ন্যায় মকবুল, গ. তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বিশাল সাওয়াব অর্জন করা। কোন অবস্থায় তাকে দেখে হা-হুতাশ করা বা কান্নাকাটি করা বা "হায়াত শেষ" এ জাতীয় কথা বলে তাকে নিরাশ করা মোটেই ঠিক নয়।

রোগী দেখতে গেলে তাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য পড়বে-

لابأس طهور إن شاء الله

অর্থঃ ঘাবড়াবার কিছু নেই। ইনশাআল্লাহ, আপনি সুস্থ হয়ে যাবেন। এবং এ রোগ (বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অপবিত্রতা হতে) পবিত্রতা সাধনকারী। (বুখারী)

বিঃদ্রঃ রোগী আলেম হলে আরবী দু'আটিই পড়বে, আর সাধারণ মানুষ হলে তরজমা কিংবা এ জাতীয় কথা বলে সান্ত্বনা দিবে। কোন অবস্থায় তাকে হায়াতের ব্যাপারে নিরাশ করবে না, যদিও তার মধ্যে মৃত্যুলক্ষণ দেখা যায়। অতঃপর সাতবার এ দুআটি পড়বে।

أسئل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك

অর্থঃ আমি আরশে আযীমের মালিক মহান আল্লাহ তা'আলার নিকট আপনার সুস্থতার জন্য দু'আ করছি। এ দু'আ সাতবার পড়লে অবশ্যই আল্লাহ তাকে (সুস্থতা) দান করবেন, যদি তার মৃত্যুর সময় না এসে থাকে। (আবু দাউদ ২/৪৪২, তিরমিযী ২/২৮)

www.islamijindegi.com

মুসীবতগ্রস্তকে সান্ত্বনা দেয়ার ফযীলত

ن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال (من عزى مصابا فله مثل أجره) أخرجه الترمذى فى سننه الحديث (1079) وابن ماجه فى سننه الحديث

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দান করে তার জন্যও বিপদগ্রস্তের ন্যায় সাওয়াব রয়েছে। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

عن أبي بزرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من عزى ثكلى كسي بردا في الجنة. أخرجه الترمذى الحديث

হযরত আবূ বরযা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কোন সন্তানহারা স্ত্রীলোককে সান্ত্বনা দান করবে তাঁকে বেহেশতে (মূল্যবান) ডোরাকাটা পোশাক পরানো হরে। (তিরমিযী)

বিপদকালীন দু'আ

عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقول عند الكرب (لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم) أخرجه البخارى فى صحيحه الحديث

নবী করীম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিপদকালে বলতেন, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই যিনি সুমহান, সহনশীল। আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, যিনি আসমানসমূহ, যমীন এবং আরশে আযীমের রব। (বুখারী হাঃ নং ৬৩৪৫)

عن ابى بكرة اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفه عين ، وأصلح لى شأني كله لا إله إلا أنت. اخرجه ابوداود فى سننه الحديث

অর্থঃ হযরত আবূ বাকরা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বিপদগ্রস্তের দু'আ এই- "আল্লাহ! আমি তোমার দয়া কামনা করি। তুমি আমাকে মুহূর্তের জন্যও আমার হাতে ছেড়ে দিও না। বরং তুমি স্বয়ং আমার সমস্ত ব্যাপার ঠিক করে দাও। তুমি ছাড়া কোন মাবুদ নেই।" (মিশকাত ২৪৪৭)

عن انس رضـــ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا كربه امر يقول: حي ياقيوم برحمتك استغيث. مشكاة المصابيح الحديث

হযরত আনাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন কোন বিষয় চিন্তাগ্রস্ত করতো, তিনি বলতেন, "হে চিরঞ্জীব! হে স্বপ্রতিষ্ঠ - সংরক্ষণকারী! তোমার দয়ার নিকট আমি ফরিয়াদ করি।" (মিশকাত-২৪৫৩)

www.islamijindegi.com

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ذَاتَ يَوْمٍ الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو أُمَامَةَ فَقَالَ « يَا أَبَا أُمَامَةَ مَا لِى أَرَاكَ جَالِسًا فِى الْمَسْجِدِ فِى غَيْرِ وَقْتِ الصَّلاَةِ ». قَالَ هُمُومٌ لَزِمَتْنِى وَدُيُونٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ « أَفَلاَ أُعَلِّمُكَ كَلاَمًا إِذَا أَنْتَ قُلْتَهُ أَذْهَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَمَّكَ وَقَضَى عَنْكَ دَيْنَكَ ». قَالَ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ « قُلْ إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ ». قَالَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَمِّى وَقَضَى عَنِّى دَيْنِى. أخرجه ابوداود الحديث

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রা. বলেন, এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে চিন্তায় ধরেছে এবং ঋণ আমার ঘাড়ে চেপে বসেছে । তিনি বললেন আমি কি তোমাকে এমন একটি বাক্য বলব না, যদি তুমি বল, তবে আল্লাহ তোমার চিন্তা দূর করে দিবেন এবং তোমার ঋণ পরিশোধ করে দিবেন ।

সাহাবী বলেন, আমি বললাম, হ্যাঁ ইয়া রাসূলুল্লাহ, বলুন! তখন তিনি বললেন, যখন তুমি সকালে উঠবে এবং যখন তুমি সন্ধ্যায় উপনীত হবে, বলবে, “আল্লাহ! আমি তোমার নিকট চিন্তা-ভাবনা হতে পানাহ চাই । অপারগতা ও অলসতা হতে পানাহ চাই এবং আমি কাপুরুষতা ও কৃপণতা হতে পানাহ চাই । এবং আমি ঋণের বোঝা ও মানুষের অত্যাচার হতে পানাহ চাই ।” তিনি বলেন, অতঃপর আমি তা করলাম, আর আল্লাহ আমার চিন্তা দূর করে দিলেন এবং আমার ঋণ পরিশোধ করার ব্যবস্থা করে দিলেন । (আবু দাউদ, মিশকাত-২৪৪৮)

প্রিয়জনের ইন্তিকালে সান্ত্বনা লাভের উপায়

আমার প্রিয় শাইখ ও মুরশিদ মুজাদ্দিদে যামান মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক হারদূয়ী (রহঃ) এ প্রসঙ্গে কয়েকটি মূল্যবান কথা ইরশাদ করেছেন-

(ক) প্রিয়জনের ইন্তিকালে মানুষ যত দুঃখিত ও মর্মাহতই হোক না কেন তা কমই বটে । এই নাযুক মুহূর্তে বেদনার্ত হওয়া মানুষের প্রকৃতিগত ও স্বভাবজাত বিষয় । এজন্য শরীয়ত এক্ষেত্রে দুঃখ-বেদনার নিন্দা করেনি । বরং মর্মাহত ব্যক্তিকে বিশেষ দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে, যাতে ধীরে ধীরে তার দুঃখ কমে আসে এবং মনোবেদনা লাঘব হয় । মানুষ যদি দুঃখ-বেদনার বৃত্তেই ঘুরপাক খেতে থাকে এবং সবসময় কেবল দুঃখ-বেদনা নিয়েই পড়ে থাকে তাহলে তার দীন-দুনিয়ার যাবতীয় কর্মকাণ্ড স্থবির হয়ে পড়বে । আর এটা মানব জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের পরিপন্থী । অপর দিকে দুঃখ প্রকাশে অশ্রু প্রবাহিত করতে এবং কাঁদতে নিষেধ করাও সমীচীন নয় । কেননা মর্মবেদনা লাঘবের জন্য অনুচ্চস্বরে কান্নার বিরাট ভূমিকা রয়েছে। তাছাড়া উদগত কান্না কষ্ট করে চেপে রাখলে শারীরিক ক্ষতিরও

www.islamijindegi.com

আশংকা থাকে । এজন্য শরীয়ত কাঁদতে নিষেধ করেনি বরং কান্না আসলে মন ভরে কেঁদে নেয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে । কিন্তু সশব্দে চীৎকার করে কাঁদা যেহেতু মানুষের আয়ত্তাধীন, এজন্য তা নিষেধ করা হয়েছে । তা ছাড়া সশব্দ কান্না অন্যদের উপরও মন্দ প্রভাব ফেলে । কারণ, কান্না হল সংক্রামক ধাঁচের, একজনের দেখাদেখি অন্যের মধ্যেও তা ছড়িয়ে পড়ে । তবে অনিচ্ছাকৃত চীৎকার ধ্বনি বেরিয়ে গেলে তাতে কোন দোষ নেই । অর্থাৎ এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি গুনাহগার হবে না ।

(খ) একথা পরম সত্য যে, যার আগমন ঘটেছে তাকে একদিন এখান থেকে বিদায় নিতেই হবে । তবে এর জন্য আল্লাহ তা'আলা একটি সময় বেঁধে দিয়েছন ।কিন্তু সুনিশ্চিত ও অনতিক্রম্য সেই সময়টি আল্লাহ তা'আলাই জানেন । তিনি ব্যতীত আর কারও তা জানা নেই। তাই তো দেখা যায়- অসুখ-বিসূখ কিচ্ছু নেই; একেবারে সুস্থ-সবল মানুষটি বিলকুল রওয়ানা হয়ে যায় । বস্তুতঃ এটিই তার নিদিষ্ট সময়।আজকাল এটাকে 'হার্ট অ্যাটাক' ও ব্রেন স্ট্রোক বলে ব্যক্ত করা হয়।

খাজা আযীযুল হাসান মাজযুব (রহঃ) তাঁর কবিতায় কি পরম সত্যটিই না তুলে ধরেছেন-

ہورہی ہے عمر مثل برف کم ۔ چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم

জীবনের বরফখন্ডটি দেখো, গলে গলে কেমন নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে । কত নিঃশব্দে, কেমন ধীরে ধীরে, প্রতি নিঃশ্বাসে ।

سانس ہے ربرو ملک عدم۔ دفعۃ اکروز یہ جائیگا تھم

শ্বাস-প্রশ্বাস যেন এক ভ্রাম্যমাণ পথিক, হঠাৎ এক বাঁকে থেমে যায় তার চলার গতি

اکدن مرنا ہے آخر موت ہے ۔ کرلے جوکرناہے آخر موت ہے

একদিন তোমাকে মরতেই হবে জেনে রেখো! আয়ু থাকতেই যা করার করে নাও হে!

(গ) মৃত্যু এক চিরন্তন সত্য । কাজেই পৃথিবীর প্রত্যেক জোড়ার এবং প্রতি দু'জনের একজনকে অবশ্যই অপরজনের বিয়োগ-বিচ্ছেদের সম্মুখীন হতে হবে । স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রীকে, স্ত্রীর মৃত্যুতে স্বামীকে, পিতা-মাতার ইন্তিকালে ছেলে-সন্তানকে, সন্তানের মৃত্যুতে পিতা-মাতাকে, ভাইয়ের তিরোধানে বোনকে অনুরূপ প্রত্যেক দুজনের একজনকে । আর একথাও স্পষ্ট যে, দু'জনার একজনকে ইচ্ছাধিকার দেয়া হলে কেউ-ই মৃত্যুযন্ত্রণা বরণ করতে স্বেচ্ছায় রাজি হতো না । এজন্য আল্লাহ তা'আলা মৃত্যুর ব্যাপারটি স্বয়ং তার আয়ত্তাধীন রেখেছেন । বস্তুতঃ তিনিই প্রাণ সঞ্চার করেন এবং তিনিই প্রাণ সংহার করেন ।

www.islamijindegi.com

(ঘ) একজন সাধারণ গ্রাম্য ব্যক্তি হযরত আব্বাস রা. এর ইন্তিকালে তাঁর পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ রা. এর খিদমতে- দেখুন কী চমৎকার সান্তনাবাণী পেশ করেছিলেন। এতে আমাদের জন্যে রয়েছে এক চমকপ্রদ শিক্ষা

وخير من العباس أجرك بعد+ والله خير منك للعباس

প্রথম পংক্তিতে বলা হয়েছে- হযরত আব্বাস রা. এর ইন্তেকালে সবর করার বিনিময়ে হে আব্দুল্লাহ! আপনাকে পুরস্কার প্রদান করা হবে। ভেবে দেখুন, পুরস্কার অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অধিক উত্তম, না আপনার নিকট হযরত আব্বাসের জীবিত থাকা? স্পষ্ট যে, আল্লাহর সন্তুষ্টিই উত্তম।

আর দ্বিতীয় পংক্তিতে বলা হয়েছে- হযরত আব্বাস রা. পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে আখিরাতে পাড়ি জমিয়েছেন,তাঁর উপর আল্লাহ তা'আলার রাশি রাশি নেয়ামত বর্ষিত হচ্ছে এবং তাকে অকল্পনীয় সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করা হচ্ছে। তো বলুন, হযরত আব্বাসের জন্য আপনি উত্তম, না আল্লাহ তা'আলার নেয়ামত ও সম্মান? জবাব সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ তা'আলার নেয়ামত ও মর্যাদাই উত্তম।

সারকথা হল, কারো মৃত্যুতে একজন অপরজন হতে পৃথক হয়ে যায় কিন্তু প্রত্যেকেই উত্তম বস্তুর অধিকারী হয়। দেখা যাচ্ছে, মৃত্যু উভয়ের জন্যই কল্যাণ বয়ে আনছে। অর্থাৎ, প্রত্যেকেই উত্তম বস্তু ও বিনিময় লাভ করছে।

(ঙ) এ কথাও চিন্তা করা দরকার যে, মৃত্যুর মাধ্যমে আলাদা হওয়া বা বিচ্ছেদ ঘটা এটা সাময়িকের জন্য; চিরদিনের জন্য নয়। যেমন দুই বন্ধুর একজন হিজরত করে অন্য কোন দেশে চলে গেল আর অপরজন কোন ওজর বশতঃ তার সঙ্গে যেতে পারল না। কিন্তু রয়ে যাওয়া বন্ধু তার হিজরত করা বন্ধুর দেশে কখনো গেলেই তার সঙ্গে সাক্ষাত করতে পারবে। এভাবে চিন্তা করলে রয়ে যাওয়া বন্ধুর দুঃখ-পেরেশানীর শিকার হতে হয় না। মৃত্যুরও এই একই অবস্থা মৃত ব্যক্তি তো পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারে না, কিন্তু এখানকার ব্যক্তি মুত্যুর মাধ্যমে সেখানে পৌঁছে তার সঙ্গে সাক্ষাত করতে পারে। এই দৃষ্টিভঙ্গিটিকে আল্লাহ তাআলা اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ বলে কুরআনে কারীমে ব্যক্ত করেছেন যে, আমরা সকলেই আল্লাহর বান্দা ও গোলাম। (আর মুনীবের জন্য তার গোলামের বাসস্থান পরিবর্তনের অধিকার থাকে। সুতরাং পরিবর্তনের দ্বারা যদি মনে কষ্ট লাগে, তাহলে এভাবে চিন্তা করবে যে,) আমরা সকলেই (মুনীবের নির্ধারিত) সে স্থানে ফিরে যাবো, (যেখানে আমাদের বন্ধু ও প্রিয়জন পূর্বে চলে গেছেন।) (মাজালিসে আবরার, 'দাফিউল গম্ম' নামক পুস্তিকা)

হযরত মির্যা মাযহার জানে জানা (রহঃ) তাঁর মৃত্যুর পূর্বে নিজের কামরার মধ্যে একটি কবিতা লিখে রেখেছিলেন। যা পরবর্তীতে তার সমাধি শিয়রে উৎকীর্ণ হয়েছে -

www.islamijindegi.com

لوگ کہتے ہیں کہ مرزا مرگیا۔ در حقیقت مرزا اپنا گھر گیا

অর্থঃ লোকেরা বলাবলি করছে যে, মির্যা সাহেব মারা গেছেন। কিন্তু আসল কথা হল মির্যা সাহেব নিজ বাড়ীতে ফিরে গেছেন।

বিপদাপদে পরিস্থিতি সামলে নেয়ার সহজ উপায়

১। সর্বদা যে কোন ধরনের বিপদাপদ থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ চাইবে। তবে এসে গেলে সবর করার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়ে যাবে।

২। বিপদাপদে পড়ামাত্রই اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ পাঠ করবে এবং এর থেকে এই শিক্ষা গ্রহণ করবে যে, মূলতঃ পেরেশানীর কারণ হল, দুটি অমূলক ধারণা-

(ক) যা হাতছাড়া হয়েছে, তার মালিক আমি নিজেই।
(খ) এবং উক্ত বস্তু আর কোন দিন ফিরে আসবে না।

এ জন্য দেখা যায়, যেখানে নিজের মালিকানা বা নিজের সম্পর্কিত বিষয় নয় সেখানে অনেক বড় বড় বিপদ হওয়া সত্ত্বেও মানুষ পেরেশান হয় না। যেমন পত্র-পত্রিকায় কত বিপদের খবর বের হয় কিন্তু কেউ তেমন পেরেশান হয় না। কারণ ওটা তার নিজের সম্পর্কিত কিছু নয়।

তেমনিভাবে ঘড়ি চুরি হলে পেরেশানী হয়। কারণ আর হয়ত ফিরে পাবে না। কিন্তু নিজের কোন কাজে ঘড়ি মেকারের নিকট কয়েক দিনের জন্য দিয়ে আসলে তাতে কোন পেরেশানী হয় না। কারণ তা স্থায়ীভাবে হাত ছাড়া হয়নি।

তো উক্ত দুআ ও আয়াত اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ এর মধ্যে উভয় অমূলক ধারণা বাতিল করে দেয়া হয়েছে। প্রথম বাক্যে বলা হয়েছে যে, আমি এবং আমার সবকিছু আল্লাহর মালিকানাধীন। এখানে আমার কোন মালিকানা নাই। সুতরাং আমার পেরেশানীর কি আছে? যার মালিকানা তারই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হবে। সেখানে আমার কি অধিকার আছে।

দ্বিতীয় বাক্যে বলা হয়েছে যে, যা হাতছাড়া হয়েছে, নষ্ট হয়েছে বা কোন নিকট আত্মীয় মারা গেছে তো ঐ ব্যক্তি বা বস্তু স্থায়ীভাবে হাত ছাড়া হয় নি। কারণ, আমরা সকলেই মৃত্যুর পর অতীত আত্মীয়-স্বজনের সাথে মিলিত হব এবং ক্ষতিগ্রস্ত মালেরও প্রতিদান আমরা আল্লাহর দরবারে ফিরে পাব। সুতরাং পেরেশানীর কিছু নাই।

৩. নিজের চেয়ে যারা আরো বেশী বিপদগ্রস্ত তাদের অবস্থা সামনে রাখবে। সুযোগ হলে কখনো হাসপাতাল পরিদর্শন করবে। এবং চিন্তা করবে যে, হাজারো লোকের বিপদের তুলনায় আমার বিপদ হালকা। সুতরাং তাদের দিকে চেয়ে আমাদের সবর করা উচিত।

www.islamijindegi.com

৪ । বিপদের সময় এ কথাও চিন্তা করবে যে, যতটুকু বিপদ এসেছে এর চেয়ে বেশীও আসতে পারত, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তার থেকে আমাকে হেফাযত করেছেন । যেমনঃ এক লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে, তো চিন্তা করবে যে, পাঁচ লক্ষ টাকার ক্ষতি থেকে আল্লাহ হেফাযত করেছেন । তেমনিভাবে একজন আত্মীয়ের মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু কোন দুর্ঘটনায় অনেক আত্মীয়ের এক সাথে মৃত্যু হতে পারত । তা থেকে তো আল্লাহ হেফাযত করেছেন ।

৫ । সর্বদা দুনিয়ার অস্থায়িত্ব ও মূল্যহীনতার কথা মস্তিস্কে গেঁথে রাখবে ।

৬ । সংশ্লিষ্ট বিপদের ফযীলত (যার কিছুটা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে) স্মরণ করে পূর্ণরূপে সবর ও ধৈর্য অবলম্বন করবে এবং সাওয়াবের আশা রাখবে ।

৭। সংশ্লিষ্ট বিপদের সর্বোচ্চ ক্ষতি মেনে নেয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখবে, কিন্তু সেটা না হওয়ার জন্য বা ক্ষতি কম হওয়ার জন্য আল্লাহর নিকট দুআ করতে থাকবে ।

৮। অতঃপর বিপদটি মৃত্যু ব্যতীত অন্য কোন ধরনের হলে ঠাণ্ডা মাথায় তা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য দুআ ও চেষ্টা-ফিকির করবে । কিন্তু হা-হুতাশ করবে না, কারণ, এতে স্বাস্থ্য, ইবাদত-বন্দেগী ও মালের ক্ষতি ছাড়া কোন লাভই নেই ।

৯ । উদ্ধার পাওয়ার কিংবা ক্ষতি কমিয়ে আনার সম্ভাব্য যত পন্থা বের হয় সেগুলোর মধ্যে পর্যালোচনা করে তুলনামূলক জরুরী, সহজ ও কম ক্ষতিকর পন্থা অবলম্বন করার সিদ্ধান্ত নিবে ।

১০ । তারপর আল্লাহর উপর ভরসা করে কাজ শুরু করে-দিবে । ইনশাআল্লাহ, বিপদ অনেক সহজ ও আসান হয়ে যাবে ।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এসকল দিকনির্দেশনার উপর আমল করার তাউফীক দান করুন । এবং ফিতনার এ কঠিন যমানায় আমাদের সকলকে দীন ও ঈমান হিফাযত করার তাউফীক দান করুন- আমীন ।

সমাপ্ত

www.islamijindegi.com

তাবলীগ কি ও কেন?

মুফতী মনসূরুল হক

www.islamijindegi.com

তাবলীগ কি ও কেন?
আপনার প্রশ্নের উত্তরগুলি জেনে নিন

মুফতী মনসূরুল হক
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া
আলী এন্ড নূর রিয়েল এস্টেট
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

প্রকাশক
মাকতাবাতুল মানসূর

[সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত]

পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত
দ্বিতীয় সংস্কারণ
সেপ্টেম্বর ২০০৯ ইং

শুভেচ্ছা বিনিময়
২০ (বিশ) টাকা মাত্র

www.islamijindegi.com

প্রারম্ভিক কথা

মানব জাতি আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির সেরা জীব। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্টভাবে ইরশাদ করেছেন-"আমি মানব জাতিকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।" (সূরাহ বনী ইসরাঈল আয়াত-৭০) শুধু তাই নয়; বরং তারা সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মতও। এতদসম্পর্কে পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- "তোমরা সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত, তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে মানবজাতির কল্যাণের জন্য । তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে ও অসৎ কাজে বাধা দিবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করবে ।" (সূরাহ আলে ইমরান, আয়াত-১১০)

উপরোক্ত আয়াতে মানব জাতিকে শ্রেষ্ঠ উম্মত ঘোষণা করার সাথে সাথে তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদানের কারণও উল্লেখ করা হয়েছে। আর তা হচ্ছে মানুষকে সৎকাজের আদেশ করা ও অসৎ কাজের নিষেধ করা ।

মূলতঃ এ দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল আম্বিয়া কিরামের উপর। গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট মানুষকে দ্বীনের পথে ফিরিয়ে আনার জন্য আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে প্রেরণ করেছেন লক্ষাধিক নবী-রাসূলগণকে। নবী প্রেরণ পরম্পরায় সর্বশেষে প্রেরিত হয়েছেন আমাদের নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাঁর পর আর কোন নবীর আগমন ঘটবে না বিধায় এ সুমহান দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তাঁর উম্মতের উপর ফলে তারা লাভ করেছে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মতের মর্যাদা।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, উম্মতে মুহাম্মাদী তাদের এ গৌরবময় দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হওয়ার কারণে পৃথিবী জুড়েই চলছে অন্যায় অবিচার, হত্যা-লুণ্ঠন, ছিনতাই-রাহাজানি, খুন-খারাবী সহ আরো নানা প্রকার মানবতা বিধ্বংসী কার্যকলাপ । উম্মাতে মুহাম্মাদী যদি পুনরায় তাদের এ দায়িত্ব যথাযথ রূপে পালনে সক্রিয় না হয়, তাহলে এ থেকে মুক্তি পাওয়া কোন ক্রমেই সম্ভব নয় । শ্রদ্ধেয় উস্তাদ মুফতী মাওলানা মনসূরুল হক

সাহেবের এতদসম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রবন্ধ ও প্রশ্নোত্তর বিভিন্ন সময়ে রাহমানী পয়গামে প্রকাশিত হয়েছিল। বিষয়গুলির গুরুত্ব অনুধাবন করে হযরতের দু'আ ও ইজাযত নিয়ে বিক্ষিপ্ত লেখাগুলি একত্রিত করে পুস্তিকাকারে প্রকাশ করতে পেরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি। যারা দাওয়াতের কাজের সাথে জড়িত এবং যারা জড়িত না, আশা করি তাদের সকলের জন্যই এটি সমান উপকারী হবে ।

দূ'আ প্রার্থী
মীযানুর রহমান কাসেমী
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া
মোহাম্মদপুর, ঢাকা ।

www.islamijindegi.com

সূচীপত্র

তাবলীগ কি ও কেন?	৩
উম্মতে মুহাম্মাদী “সর্বোত্তম উম্মত” কেন?	৫
বিশ্ববাসীর কল্যাণ সাধনের প্রকৃত পন্থা কী?	৬
“সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ” এ কথার তাৎপর্য কি?	৭
সৎ কাজের আদেশ এর শ্রেণীভেদ	৯
দ্বীনি দাওয়াতের জন্য কুরবানী	১২
দ্বীনি দাওয়াতের ফায়দা	১৩
উম্মতের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভালবাসা	১৫
তাবলীগ সম্পর্কিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর	১৭
(১) তাবলীগ করা কি ফরয?	১৮
(২) তাবলীগওয়ালারা শুধু আমর বিল মারূফ করে কেন?	২০
(৩) তাবলীগওয়ালাদের জন্য মসজিদে থাকা-খাওয়া জায়িয আছে?	২২
(৪) “তাবলীগে এক টাকা খরচ করলে ৭ লাখ টাকা খরচ করার সাওয়াব হয়” একথা কি ঠিক?	২৪
(৫) “দ্বীনের দাওয়াতে যেয়ে কারো দরজার সামনে অপেক্ষা করা শবে কদরের ইবাদতের চেয়ে উত্তম” এর দলীল কি	২৭
(৬) “তাবলীগে গেলে সব গুনাহ মাফ হয়ে যায়” এর ব্যাখ্যা কি?	৩০
(৭) তাবলীগ জামাআত কি হক?	৩৩
(৮) মহিলাদের জন্য বাড়ী বাড়ী যেয়ে তালীম করা কি ঠিক?	৩৬
(৯) আল্লাহর রাস্তা বলতে কি শুধু তাবলীগ বুঝায়?	৩৮
(১০) ১০০ বছর পূর্বে তাবলীগ ছিল না। এখন কোত্থেকে এলো?	৪০
(১১) তাবলীগ করা কতটুকু জরুরী?	৪২

باسمه تعالى

الحمد لله رب العا لمين والصلو ة والسلا م علي سيد ا لمر سلين

তাবলীগ কি ও কেন?

كنتم خير امة اخر جت للنا س تا مر ون با لمعروف وتنهون عن المنكر وتومنون بالله

অর্থ: “হে (উম্মতে মুহাম্মাদী) মুমিনগণ! ‘তোমরা অন্যান্য সকল উম্মত থেকে উৎকৃষ্ট এমন এক জামা’আত, যে জামা’আতকে সকল মানুষের কল্যাণের জন্য পাঠানো হয়েছে। (তোমাদের কল্যাণ সাধনের পদ্ধতি এই হবে যে,) তোমরা নেক কাজের হুকুম করতে থাকবে এবং শরীয়ত বিরোধী কাজ থেকে বাধা প্রদান করতে থাকবে। আর (এভাবে) তোমরা নিজেদের ঈমান মজবুত করতে প্রয়াসী হবে।’ (সূরাহ আল-ইমরান-১১০)

উম্মতে মুহাম্মাদী “সর্বোত্তম উম্মত” কেন ?

কুরআনে কারীমের উল্লেখিত আয়াতে উম্মতে মুহাম্মাদীর সকল মুমিন-মুসলমানকে খাইরুল

উমাম তথা “সর্বোত্তম উম্মত” ঘোষণা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, হে মুমিনগণ! তোমরা সর্বোত্তম জাতি। কারণ, তোমাদেরকে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের ন্যায় জগতবাসীর কল্যাণের নিমিত্তে দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছে।

এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : “তোমরা বড় বড় সত্তরটি উম্মতের পূর্ণতাকারী এবং তোমরা ঐ সমস্ত উম্মতের মধ্যে আল্লাহ তা’আলার দরবারে বেশী উত্তম ও বেশী সম্মানী।” (তিরমিযী, হাঃ নং - ৩০০৮, ইবনে মাজাহ, হাঃ নং- ৪২৮৮)

আয়াতের এ অংশ দ্বারা দু’টি কথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়:

১. উম্মতে মুহাম্মাদী সর্বোত্তম উম্মত।

২. তাঁদের সর্বোত্তম হওয়ার কারণ হল: তাঁরা বিশ্ববাসীর কল্যাণের নিমিত্তে প্রেরিত হয়েছে । (যেরূপ দায়িত্ব নিয়ে আম্বিয়া আ. প্রেরিত হয়েছিলেন) খাতামুন নাবিয়্যীন (শেষ নবী) হযরত

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উম্মত সেই দায়িত্বের বদৌলতে ‘খাইরুল উমাম’ বা সর্বোত্তম উম্মত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছেন । নামায, রোযা, হজ্ব ও যাকাত এ নেক কাজগুলো পূর্বের উম্মতগণ করেছেন, উম্মতে মুহাম্মাদীও করছেন । কিন্তু এগুলো তাঁদের খাইরুল উমাম হওয়ার কারণ নয়, এমনকি নেক কাজের আদেশ এবং বদ কাজের নিষেধের দায়িত্বও পূর্বের উম্মতগণ পালন করেছেন। কিন্তু এই দায়িত্ব উম্মতে মুহাম্মাদীর উপর যত গুরুত্ব সহকারে অর্পিত হয়েছে, ততটা গুরুত্ব সহকারে অন্য কোন উম্মতের উপর অর্পিত হয়নি। (মা’রিফুল কুরআন, ২:১৫০)

এ কারণেই উম্মতে মুহাম্মাদীর প্রত্যেক নর-নারীর উপর তার অধীনস্থ এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরকে সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ করা ওয়াজিব। আর এ গুরু দায়িত্বই উম্মতে মুহাম্মাদীকে “সর্বোত্তম উম্মত” হওয়ার মহান ফযীলতের অধিকারী করেছে। (মা’রিফুল কুরআন, ২:১৩৭)

এ উম্মতের কোন ব্যক্তি যদি এই দায়িত্ব পালনে অনীহা প্রকাশ করে, তবে সে যদিও নামায, রোযা সহ অন্যান্য ইবাদত-বন্দেগী সঠিকভাবে আদায় করেও, তথাপি সে কখনও খাইরুল উমাম বা সর্বোত্তম উম্মতের সম্মানে ভূষিত হবে না । এ দায়িত্ব পালনে যেমনি ভাবে নিজের অধীনস্থ ও সংশ্লিষ্টদের মধ্যে কাজ করতে হবে, তেমনিভাবে এ কাজ নিয়ে মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরাও অপরিহার্য । এ প্রসঙ্গে হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ. বলেন: “তোমাদের বিশ্ববাসীর কল্যাণের নিমিত্তে প্রেরণ করা হয়েছে” আল্লাহ তা‘আলার এ কথার দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এক স্থানে বসে তোমাদের এ দায়িত্ব পূর্ণভাবে আঞ্জাম দেয়া সম্ভব হবে না । মানুষের কল্যাণের জন্য দুয়ারে দুয়ারে ফিরতে হবে । আর তখনই তোমরা খাইরুল উমাম বা সর্বোত্তম উম্মত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করবে ।”(মালফূযাত, ৫২)

বিশ্ববাসীর কল্যাণ সাধনের প্রকৃত পন্থা কি?

উল্লেখিত আয়াতে স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বিশ্ববাসীর কল্যাণ সাধনের পদ্ধতি সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, "তোমরা বিশ্ববাসীকে সৎ কাজের আদেশ করতে থাকবে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখতে থাকবে।" এটাই বিশ্ববাসীর জন্য প্রকৃত কল্যাণ সাধন । কারণ, এর মধ্যেই রয়েছে প্রত্যেকটি মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের আসল কল্যাণ বা কামিয়াবী ।

প্রকৃত শান্তি আর সব ধরণের সফলতার পর্যায়ে সাধারণভাবে লোকেরা 'দুঃখীজনকে অন্ন-বস্ত্র দান করাকে তার প্রতি কল্যাণ করা' মনে করে থাকে । বাস্তবে এটাও একটা কল্যাণ কামনা বটে, কিন্তু এটা নিতান্তই সাময়িক এবং অস্থায়ী কল্যাণ দান । প্রকৃত কল্যাণ সাধনা হল, খালক্ কে খালিকের সাথে (সৃষ্টিকে স্রষ্টার সাথে) জুড়ে দেয়া । অর্থাৎ মানব জাতিকে তাঁর প্রতিপালকের সাথে সম্পর্কিত করে তাদেরকে স্থায়ী জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে

মহা নি'আমতের অধিবাসী বানানো। (সুরা আল ইমরান, ১৮৫)

একজন মানুষের জন্য এর চেয়ে বড় কোন কল্যাণ কামনা আর হতে পারে না । এ সম্পর্কে মাওলানা ইলিয়াস রহ. বলেছেন : হাদীস শরীফে আছে, যে অন্যের উপর রহম করে না, তার উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে রহম করা হয় না । কাজেই তোমরা জমীন বাসীর উপর রহম কর আসমান ওয়ালা অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর রহম করবেন । কিন্তু আফসোস, লোকেরা এ হাদীসের মর্ম শুধুমাত্র ভুকা-নাঙ্গা লোকদেরকে অন্ন-বস্ত্র দানের ব্যাপারে সীমিত করে দিয়েছে । ভুকা-নাঙ্গা ব্যক্তিদের দানের ব্যাপারে তাদের অন্তরে দয়া আসে কিন্তু দ্বীন থেকে বঞ্চিত পথহারা ব্যক্তিদের ব্যাপারে তাদের অন্তরে দয়া আসে না । বাহ্যিক অবস্থা দৃষ্টে মনে হয়, দুনিয়ার ক্ষতিকে ক্ষতি মনে করা হয়; কিন্তু দ্বীনের ক্ষতিকে তেমন ক্ষতি মনে করা হয় না । তাহলে আসমান ওয়ালা (মহান

আল্লাহ) আমাদের উপর কেন মেহেরবানী করবেন। (মালফুযাতে মাওলানা ইলিয়াস রহ. ৪৮)

“সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ” এ কথার তাৎপর্য কী?

সৎ কাজসমূহকে পবিত্র কুরআনে “মারূফ” বলা হয়েছে। যার মধ্যে ঐ সমস্ত নেক আমল এবং সৎকাজ শামিল, যা ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে এবং নবীগণ যুগে যুগে তা বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। আর অসৎ কাজসমূহকে পবিত্র কুরআনে “মুনকার” বলা হয়েছে। যার মধ্যে ঐ সমস্ত অপকর্ম ও অন্যায় আচরণ শামিল, যা ইসলাম নিষেধ করেছে। (মা‘আরিফুল কুরআন, ২ : ১৪১)

এখানে বিশেষ লক্ষণীয় যে, সৎ কাজ এবং অসৎ কাজের জন্য আরবী ভাষায় “আমলে সালেহ” ও “আমলে গাইরে সালেহ” শব্দ বিদ্যমান থাকা সত্বেও কুরআন পাকে “মারূফ ও মুনকার” শব্দদ্বয় ব্যবহৃত হয়েছে। এর কারণ এই যে, “মারূফ” ঐ

সকল ভাল কাজকে বলে, যে কাজের বৈধতা সর্বজন স্বীকৃত ও প্রসিদ্ধ এবং “মুনকার” ঐ সকল মন্দ কাজকে বলে, যে কাজের অবৈধতা সর্বজন স্বীকৃত ও প্রসিদ্ধ । সুতরাং এ শব্দদ্বয়ের মধ্যে এ ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, যে বিষয়ের দাওয়াত বা হুকুম দেয়া হবে, তার বৈধতা সকলের নিকট পরিচিত হবে । অর্থাৎ সকলেই সেটাকে ভাল বলে জানে এমন হতে হবে । আর যে কাজ থেকে নিষেধ করা হবে সে কাজটাও এমন হতে হবে যার, নিষিদ্ধ হওয়া সকলের নিকট প্রসিদ্ধ । অর্থাৎ নিষিদ্ধ কাজটিও যেন সাধারণ লোকদের নিকট নিষিদ্ধ বলে পরিচিত থাকে । উদাহরণতঃ ঈমানের দাওয়াত ঈমান পূর্ণ করার দাওয়াত, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, পিতা-মাতার খিদমত, সত্য কথা বলা, পরোপকার করা ইত্যাদি ভাল কাজ হওয়া সম্পর্কে সকলেই জানে। তেমনিভাবে কুফর, শিরক, নামায-রোযা তরক করা পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়া, চুরি-ডাকাতি, হাইজ্যাক, সুদ, ঘুষ, যিনা-ব্যভিচার, জুলুম-অত্যাচার এগুলোকে মন্দ কাজ

বলে সকলেই জানে । পবিত্র কুরআন মা’রুফ ও মুনকার শব্দদ্বয় বলে উল্লেখিত বিষয়াবলীর আদেশ ও নিষেধ বুঝানো হয়েছে ।

এর বাইরে যে সমস্ত বিষয় রয়েছে, যেমনঃ যেসব বিষয়ে মাযহাবের ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ ছিল, সেসব বিষয়ে আদেশ নিষেধ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ। বরং প্রত্যেকে তার ইমামের মাযহাব অনুযায়ী চলতে থাকবে। এক মাযহাবওয়ালা অন্য মাযহাবওয়ালাকে নিজের মাযহাব মানতে বাধ্য করতে বা হুকুম করতে পারবে না। যেমনঃ হানাফীগণ ইমামের পিছনে আমীন আস্তে বলেন, শাফী’য়ীগণ আমীন জোরে বলেন। এ ব্যাপারে কোন মাযহাবওয়ালার জন্য অন্যকে হুকুম দেয়া বা নিষেধ করা জায়িয নয়। কারণ, এ জাতীয় বিষয় মা’রুফ বা মুনকারের গণ্ডির মধ্যে পড়ে না । কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্তমানে অনেক স্থানে এগুলো নিয়েই ঝগড়া-বিবাদ হয় । অথচ প্রকৃতপক্ষে যেসব বিষয় মা’রুফ বা মুনকার তা নিয়ে কোন দাওয়াত বা আলোচনাই হয় না।

এটা নিতান্ত নিন্দনীয় কাজ। (মা'আরিফুল কুরআন ২:১৪১)

"সৎকাজে আদেশ" -এর শ্রেণীভেদ

প্রথমেই জানতে হবে যে একজন মুসলমান কি উদ্দেশ্যে অন্যকে দাওয়াত দিবে। অন্যের হিদায়াতের জন্য, না নিজের হিদায়াত ও নিজের উন্নতির জন্য । এ ব্যাপারে শরীয়তের বিধান হল, নিজের হিদায়াত ও উন্নতির জন্যই একে অপরকে দাওয়াত দিবে। এতে অন্য ব্যক্তি হিদায়াত প্রাপ্ত হোক বা না-ই হোক, দাওয়াত প্রদানকারী অবশ্যই লাভবান হবে । আর এ লাভই দ্বীনী দাওয়াতের মুল লক্ষ্য। প্রত্যেকে নিজের পূর্ণতার লক্ষ্যে আল্লাহর বিধান মত অন্যকে দ্বীনের দাওয়াত দিবে এবং সেই ব্যক্তি থেকে তার কোন রকম দুনিয়াবী উদ্দেশ্য হাসিল করা উদ্দেশ্য থাকবেনা। (মা'আরিফুল কুরআন , ১: ১১৯ মালফূযাত-৫২)

এবার জানা দরকার যে, প্রথমে কিসের দাওয়াত দিবে। যেহেতু একজন মানুষের জন্য সবচেয়ে বড়

দৌলত তার ঈমান। ঈমান থেকে বড় কোন দৌলত হতে পারে না। আমলের মর্তবা ঈমানের নীচে। সুতরাং ঈমানের দাওয়াতই সর্বপ্রথম দাওয়াত। প্রকৃতপক্ষে ঈমান এমন বস্তু, যা শিক্ষা করতে হয়। তার জন্য দীর্ঘ মেহনত ও প্রচেষ্টা চালাতে হয়। সাহাবীগণের মক্কী যিন্দেগীর অধিকাংশ মেহনত ঈমান পরিপক্ব করার লক্ষ্যে ছিল। হযরত উমর ফারুক রা. বলতেন:"আমরা প্রথমে ঈমান শিখেছিলাম,তারপর দ্বীনের আহকাম শিখেছিলাম।" অবশ্য আল্লাহর নগণ্য সংখ্যক বান্দা এমনও রয়েছে যে, ঈমানের কথা শ্রবণের সাথে তাঁদের অন্তরের মধ্যে পরিপক্ব ঈমান বদ্ধমূল হয়ে যায় । তাঁদের জন্য ইয়াক্বীন হাসিলের লক্ষ্যে দীর্ঘ মুজাহাদার কোন প্রয়োজন পড়ে না । তবে আল্লাহ তা'আলার সাধারণ নিয়ম যা অধিকাংশ লোকের ব্যাপারে জরুরী, তা হলঃ ঈমান মজবুত করার জন্য ও ইয়াক্বীন পাকাপোক্ত করার জন্য ঈমানের দাওয়াতের মাধ্যমে মুজাহাদা করা। (সূরা :আনকাবূত-৬৯) এর ব্যতিরেকে সাধারণ ঈমান হাসিল হয় না

। আর মজবুত ঈমান হাসিল না হলে বড় বড় বিপদে (যা তারই উন্নতির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে) মানুষ অধৈর্য হয়ে যেতে পারে এবং আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্টি প্রকাশ না-ও করতে পারে অথচ এটা মুমিনের জন্য চরম ব্যর্থতা। মুমিন তো সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপর নির্ভরশীল হ । কোন ব্যাপারে তার নিজস্ব মতামত থাকবে না । সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর ফয়সালার উপর সন্তুষ্টি প্রকাশ করাই তার কর্তব্য । এ জন্য দাওয়াতের তারতীব অনুযায়ী অমুসলিমকে সর্ব অবস্থায় প্রথমে ঈমান কবুল করার দাওয়াত দিতে হব। ঈমান কবুল করার পর তাদেরকে আমলের দাওয়াত দিতে হবে। (মিশকাত-১ : ১৫৫)

আর মুসলমানদেরকে প্রথমে পরিপক্ব ঈমান হাসিলের দাওয়াত দিতে হবে এবং সেই সাথে ঈমানের উপর দৃঢ় থাকার জন্য সহীহ কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা, নামায- রোযা ইত্যাদি জরুরী আমল শিক্ষার দাওয়াত দিতে হবে। হারাম-মাকরুহ যেমনঃ নামায তরক, রোযা তরক, পিতা-

মাতার অবাধ্যতা, সুদ-ঘুষ, মিথ্যা ইত্যাদি থেকে বেঁচে থাকার দাওয়াত দিতে হবে। দাওয়াতের মধ্যে ইমামগণের মধ্যে যেসব বিষয় বিতর্কিত, তার আলোচনা করা যাবে না । এই দাওয়াত প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর ফরজে আইন । অর্থাৎ প্রত্যেকে তার অধীনস্থ লোকদেরকে বা আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী মহল্লাবাসী ও পরিচিত লোকদেরকে সাধ্যানুসারে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করতে থাকবে। (সূরা:তাহরীম ৬/বুখারী ১:১২২) যেখানে হাতের ক্ষমতা চলে সেখানে শক্তি প্রয়োগ করে আল্লাহর বিধান জারী করবে। আর যেখানে শক্তি প্রয়োগ চলে না, সেখানে মৌখিক নসীহতের মাধ্যমে দায়িত্ব পালন করবে। আর যেখানে মৌখিক নসীহত বিপদজনক হতে পারে, বা হিতের বিপরীত বলে প্রবল ধারণা হয়, সেখানে মনে মনে ঐ গর্হিত কাজটাকে (লোকটিকে নয়) ঘৃণা করবে এবং দিলে দিলে ফিকির জারী রাখবে যে, আল্লাহর নাফরমানীর ঐ কাজটা কিভাবে বন্ধ করা যেতে পারে । এ পর্যায়কে

ঈমানের সর্বনিম্ন স্থর বলা হয়েছে। (মিশকাত, ৪৩৫) এ পর্যায়ের দ্বীনি দাওয়াতের যিম্মাদারী প্রত্যেক মুসলমানের উপর অর্পিত হয়েছে। প্রত্যেকে তার কর্ম পরিসরের মধ্যে এ দায়িত্ব পালন করে যাবে।

দ্বীনি দাওয়াতের দ্বিতীয় স্তর হলোঃ মুসলমানদের মধ্য থেকে একটি জামা'আত সর্বদা দাওয়াতের কাজে ময়দানে থাকবে এবং সকল শ্রেণীর লোকদেরকে আল্লাহর দ্বীনের দিকে দাওয়াত দিতে থাকবে । এ দাওয়াত কোন সময়ই বন্ধ হবে না । এক দল লোক মেহনত করে যখন তাদের দুনিয়াবী জরুরত পূর্ণ করার লক্ষ্যে বাড়ীতে ফিরবে, তখন অপর দল যারা দুনিয়ার কাজ আঞ্জাম দিয়ে ফেলেছেন,তারা ময়দানে নেমে যাবে এবং "সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ" এর সিলসিলা জারী রাখবে। এ পর্যায়ের দ্বীনি দাওয়াত উম্মতে মুহাম্মাদীর উপর ফরজে কিফায়া। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ "হে মুমিনগণ। তোমাদের মধ্যে এমন একটি জামা'আত থাকতে হবে, যারা সর্বদা লোকদেরকে ভাল ও মঙ্গলের

দিকে আহবান করতে থাকবে, যারা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করতে থাকবে । আর তারাই পরিপূর্ণ সাফল্য লাভ করবে। (সূরাহ আল ইমরান -১০৪)

দ্বীনি দাওয়াতের জন্য কুরবানী

উল্লেখ্য যে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কিরাম রা. দ্বীনি দাওয়াতের জন্য সর্ববিধ ও সর্বাধিক কুরবানী পেশ করেছেন । মক্কার যিন্দেগীতে দাওয়াতের খাতিরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কুরবানী সর্বজনবিদিত, বিশেষ করে তায়েফের লোমহর্ষক ও হৃদয় বিদারক ঘটনা কোন মুসলমানেরই অজানা থাকার কথা নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন “দ্বীনি দাওয়াতের কারণে আমাকে যতটুকু কষ্ট দেয়া হয়েছে, তা অন্য কোন নবীকে দেয়া হয়নি।” এ দ্বীনি দাওয়াতের জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবা কিরাম রা. নানাবিধ তাকলীফ সহ্য করেছেন। হাদীস শরীফে

তাঁদের কুরবানীর ব্যাপারে অসংখ্য বর্ণনা এসেছে । হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. যখন বাইতুল্লাহ শরীফে প্রকাশ্যে দ্বীনের দাওয়াত পেশ করলেন তখন কাফিররা চতুর্দিক থেকে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. এবং অন্যান্য মুসলমানদের উপর আক্রমণ করল। হযরত আবু বকরকে রা. তারা বেদম মারপিট করল । তাঁকে পদদলিত করল । উতবা বিন রবী'আ কাফির তাকে স্বীয় জুতা দ্বারা মারতে ও পেটাতে লাগল। জুতার আঘাতে তাঁর চেহারা মুবারক যখম হয়ে গেল। হযরত আবু বকরের রা. পেটের উপর উঠে লাফালাফি করতে লাগল। তিনি এত বেশী পরিমাণ যখম হলেন যে, তার নাক এবং চেহারা চেনা যাচ্ছিল না। তখন তাঁর অবস্থা এমন শোচনীয় হয়েছিল যে, তাঁর বংশধরগণ আশংকা করেছিলেন যে আবু বকর মারা যাবেন । তাই তারা ঘোষণা করেছিলেন যে আবু বকর যদি মারা যায়, তাহলে আমরা অবশ্যই উতবা বিন রবী'আকে হত্যা করে ফেলব। (হায়াতুস সাহাবা, ১:২৯৫)

হযরত আবু বকরের ন্যায় অন্যান্য বহু সংখ্যক সাহাবীগণ এই দ্বীনি দাওয়াতের জন্য মার খেয়েছেন, অবর্ণনীয় নির্যাতন ভোগ করেছেন। সীমাহীন কষ্ট বরদাশত করেছেন। এমন কি অনেকে গোত্রের সরদারদের নিকট দাওয়াত দিতে গিয়ে শাহাদাত বরণ করেছেন। (বুখারী ২:৫৮৫)

তাদের সেই দ্বীনি দাওয়াতের জন্য ত্যাগ ও কুরবানীর বদৌলতে আজ বিশ্বের আনাচে কানাচে মুসলমানদের পদচারণা প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে। চীন, আফ্রিকা ও কুসতুনতুনিয়ায় সাহাবায়ে কিরামের সেই গৌরবোজ্জ্বল কুরবানীর স্বাক্ষর এখনও বিদ্যমান রয়েছে । সুদানে এক গ্রাম ‘সাহাবা’ নামে বিদ্যমান আছে । ঐ গ্রামটিতে ৯ জন সাহাবীর রা. কবর আছে।

দ্বীনি দাওয়াতের ফায়দা

দ্বীনি দাওয়াতের মধ্যে অসংখ্য ফায়দা রয়েছে। শিরোনামের আয়াতে স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন একটি জবরদস্ত ফায়দার কথা ঘোষণা করেছেন

যে, এ দ্বীনি দাওয়াতের মাধ্যমে “তোমরা ঈমানকে পরিপূর্ণ করে নিবে ”। এর দ্বারা বুঝা গেল, দ্বীনি দাওয়াতের মুখ্য উদ্দেশ্য ও গুরুত্বপূর্ণ ফায়দা হচ্ছে -ঈমানের তরক্কী ও উন্নতি এবং আল্লাহর শক্তি ও কুদরতের উপর অটল ও অবিচল বিশ্বাস অর্জন । বলা বাহুল্য, আজ সারাবিশ্বে সোয়া‘শ কোটি মুসলমান বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তারা কাফিরদের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত ও তাদের তরয তরীকার অন্ধ অনুসারী এবং তাদের দুয়ারের ভিখারী সেজেছে। আজ মুসলমানগণ বিধর্মীদের শিক্ষা, চাল-চলন, সমাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতির মধ্যে কামিয়াবী দেখছে। মুসলমানরা আজ বিধর্মীদের হাতে মার খাচ্ছে, অপমানিত ও লাঞ্ছিত হচ্ছে এসব কিছুর মূল কারণ হচ্ছে-তাদের ঈমানী দুর্বলতা । আজ মুসলমানদের দৃষ্টি খোদায়ী শক্তি থেকে সরে গিয়ে মাখলুকের শক্তির উপর নিবদ্ধ। তাই তারা হয়ে পড়েছে খোদায়ী সাহায্য থেকে বঞ্চিত। (আল-ই‘তিদাল ফী মারাতিবির রিজাল, ৪৫)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ধরনের ঈমানের বলে বলীয়ান করে সাহাবীগণকে রেখে গিয়েছিলেন, যাঁদের মুষ্টিমেয় সংখ্যা সারাবিশ্বকে কাঁপিয়ে তুলেছিল, যাঁদের ভয়ে সে যামানার পরাশক্তি রোম ও পারস্য শত শত মাইল দূরে থেকেও কম্পিত ছিল, সেই ধরনের ঈমানী শক্তিওয়ালা মুসলমানদের সংখ্যা এখন পৃথিবীতে খুবই নগণ্য। মুসলমান জাতি যতদিন পর্যন্ত এ বাস্তব জিনিসটি অনুধাবন করে তাদের এই ঈমানী দুর্বলতা বিদূরিত করতে সক্ষম না হবে, ততদিন পর্যন্ত তাদের অধঃপতন এবং লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ভোগ করতেই হবে। কোন তন্ত্র-মন্ত্র, কোন প্রোগ্রাম আর পরিকল্পনা তাদেরকে এ অসহায়ত্ব থেকে উদ্ধার করে বিশ্বের বুকে ইজ্জতের আসনে বসাতে পারবে না। এ সমস্যার একমাত্র সমাধান এই যে, আজ যখন দ্বীন ইসলাম ও আমল সম্বন্ধে বিভিন্ন ধরনের আলোচনা ও প্রচেষ্টা চলছে, তখন সর্বাধিক গুরুত্ব সহকারে তাদেরকে ঈমানী তরক্কীর ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। এর জন্য সময় বের করতে

হবে। আল্লাহর ঘরে এসে দ্বীনি পরিবেশে নিজেকে শামিল করে ঈমানের আলোচনা শুনেত হবে, করতে হবে এবং মানুষের দিলের ময়দানে ঈমানের দাওয়াত নিয়ে ফিরতে হবে । আর তখনই আল্লাহর রহমত শামিলে হাল হয়ে তাদের মজবুত ঈমান নসীব হবে ।

আজ সাধারণভাবে ঈমান শিক্ষার এবং ঈমান পরিপক্ব করার বিষয়টি চরমভাবে অবহেলিত! এমন কি যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা দ্বীনের উচ্চ কাতারে শামিল রেখেছেন, তাদের অনেকেই এ বিষয়টি-কে যথাযথ গুরুত্ব সহকারে উপলব্ধি করতে সক্ষম হন না বা চান না । তারা মনে করেন, আমরা তো মু'মিন আছিই, এর জন্য আবার মেহনত কেন করতে হবে? কিন্তু তারা যদি এ ময়দানে নেমে কিছুদিন মেহনত করতেন, তখন অবশ্যই তাদের চক্ষু খুলে যেত, বাস্তবিক পক্ষেই তারা ভুলের ভিতরে ছিলেন। ঈমান শিক্ষার মেহনতকে তারা যতটুকু মনে করছেন, বস্তুত তা কেবল ততটুকু নয়, বরং ঈমানের পূর্ণতা হাসিলের

জন্য যথেষ্ট ত্যাগ, কুরবানী এবং এক জবরদস্ত মেহনতের প্রয়োজন রয়েছে।

হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ. বলেন, "উপরে উল্লেখিত আয়াতের শেষে যে বলা হয়েছে, 'আর তোমরা আল্লাহর উপর ঈমান রাখবে' এর অর্থ নতুন করে ঈমান আনয়ন করা নয়। কারণ, এই আয়াতে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তা মুমিনদেরকে লক্ষ্য করেই দেয়া হয়েছে। কাজেই ঈমান তো তাদের পূর্ব থেকেই আছে। তাই পুনরায় নতুন করে যে ঈমানের কথা বলা হচ্ছে, তার অর্থ ঈমানের পূর্ণতা অর্জন বৈ অন্য কিছু নয়।" (মালফূযাত :৫২)

দ্বীনি দাওয়াতের আরেকটি ফায়দা হলো: এই মেহনত দ্বারা আখিরী যুগের মানুষগণ সাহাবী না হলেও তাদের সাওয়াবের অধিকারী হতে পারেন । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন: " নিশ্চয় এই উম্মতের শেষের দিকে এমন জামা'আত তৈরি হবে, যারা প্রথম যমানার লোকদের ন্যায় সাওয়াবের অধিকারী হবে তারা সৎ

কাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে । আর তারা ফিতনাকারীদের সাথে (হাত দিয়ে বা যবান দিয়ে কিংবা কলম দিয়ে) মুকাবিলা করবে”। (বাইহাকী শরীফ)

অপরদিকে দাওয়াতের কাজ ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে হাদীস শরীফে বিভিন্ন রকম ধমকি এসেছে। যেমনঃ বুযুর্গদের দু‘আ কবুল না হওয়া, ওহীর বরকত থেকে মাহরূম হওয়া এবং গুনাহের কারণে ভালমন্দ সকল শ্রেণীর লোকদের আল্লাহর গজবে পতিত হওয়া ইত্যাদি। (ফাযায়িলে তাবলীগ , ২৮১)

দাওয়াতের আরেকটি ফায়দা সম্পর্কে হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ. বলেন, দ্বীনি দাওয়াতের মেহনত দ্বারা মানুষদের মধ্যে দ্বীনের তলব ও চাহিদা এবং দ্বীনের ক্বদর ও গুরুত্ব পয়দা হয় । এর দ্বারা মানুষদের ঈমান তাজা হয়। (মালফূযাত ৭৭)

হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ. এর উক্ত কথাটি এমন বাস্তব, যা ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজনই রাখে না। প্রত্যেক চক্ষুষ্মান লোক দেখতে পাবেন যে আজ

এই দাওয়াতের মেহনতের কারণে লাখো কোটি অবুঝ, বদ্বদীন, ইংরেজি শিক্ষিত মডার্ণ লোক এমন কি দ্বীনের নাম শুনেত অপ্রস্তুত এমন লোকেরাও দ্বীনের আহকাম সমূহ পুরোপুরিভাবে গ্রহণ করে দ্বীনদারীর সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিচ্ছেন। তারা পিছনের যিন্দেগীর উপর অনুতপ্ত হয়ে পূর্ণ দ্বীনদারীর উপর চলার জন্য অপ্রাণ প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন । নিজের ছেলে মেয়েদেরকে দুনিয়াবী পেটভোজী শিক্ষায় শিক্ষিত না করে আল্লাহ ও তার রাসূলের কালাম শিক্ষার জন্য কওমী মাদ্রাসায় হক্কানী আলেম বানিয়ে দ্বীনের খিদমতের জন্য সর্বতোভাবে ওয়াকফ করছেন। পাশাপাশি নিজেরাও মহান আল্লাহর নির্দেশ, “তোমরা আমার কালামকে সহীহভাবে তিলাওয়াত কর।” (সূরা :মুয্যাম্মিল-৪) এর নির্দেশ পালন করার লক্ষ্যে আল্লাহর কালাম সহীহ শুদ্ধ করে পড়ার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। কারণ, সীনার মধ্যে সহীহ কুরআন থাকা ফরজ। তা না হলে, নামায সহীহ হবে না। তাছাড়া এই সহীহ কুরআন

তিলাওয়াত হিদায়াতের উপর থাকার জন্য রক্ষাকবচ। (সূরাঃ বনী ইসরাইল, ৯)

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “যার সীনার মধ্যে সহীহ কুরআন নেই, তার সেই সীনা বিরান এবং পতিত বাড়ির ন্যায়। (তিরমিযী,হাঃনং-২৯১৩,দারিমী হাঃনং-৩৩০৬)

অর্থাৎ পতিত বাড়ি যেমন ইঁদুর, সাপ, বিচ্ছু, শিয়াল, কুকুর আর জিন-ভুতের আড্ডাখানা হয়, তদ্রূপ তার সীনাও খাহিশাত, শয়তান আর নফসে আম্মারার কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। (আল্লাহ তা‘আলার মেহেরবানী যে, তিনি বিজ্ঞান ও কম্পিউটারের যুগে নূরানী পদ্ধতিতে মাত্র ২৫ দিনে ২৫ ঘণ্টায় কুরআনে কারীমের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।)

পাশাপাশি তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নির্দেশ “ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ”, (ইবনে মাজা হাঃনং-২২৪,শু‘আবুল ঈমান,হাঃনং-১৬৬৬) এ হাদীসের

নির্দেশ পালন করতঃ নামায-রোজা, হালাল-হারামসহ দৈনন্দিন যিন্দেগীর জরুরী মাসায়িল জানার জন্য হাক্কানী উলামাগণের সাথে যোগাযোগ রেখে ইলমে দ্বীন শিক্ষার ফরযিয়্যাত আদায় করছেন। এভাবে কুরআন-হাদীসের আহকাম শিখছেন।

তৃতীয়তঃ তাদের অনেকে আল্লাহর নির্দেশ, "ঐ সমস্ত মুমিনগণ কামিয়াবী অর্জন করেছে, যারা নিজেদের কলব থেকে খারাপ খাসলতগুলো দূর করে ভাল গুণাবলী হাসিল করতঃ আত্মঅদ্ধি অর্জন করে নিয়েছে।" (সূরা:শামস,৯) এ আয়াতের উপর আমল করে কোন হক্কানী বুজুর্গের সুহবতে থেকে বিরাট সাফল্য অর্জন করেছেন ।

উল্লেখ্য যে, শারীরিক রোগের চিকিৎসার জন্য শরীয়ত নির্দেশ দিয়েছে বটে, কিন্তু চিকিৎসা করা ফরজ করেনি। বরং সুন্নত সাব্যস্ত করেছে। কিন্তু অপরদিকে ক্বলবের রোগ অহংকার, রিয়া, হিংসা, না-শোকরী, বে-সবরী ইত্যাদি রোগের চিকিৎসা

শরীয়তের দৃষ্টিতে ফরজ। (মা'আরিফুল কুরআন ১: ৩৩৫)। এ আধ্যাত্মিক রোগ সমূহ দুর করা এত জরুরী যে, এর ব্যতিরেকে মানুষের সমস্ত যিন্দেগীর আমল বরবাদ হয়ে যেতে পারে তাই তো মেহেরবান আল্লাহ তা'আলা যমীনের বুক সকল যমানায়ই তাঁর অনেক বুজুর্গ বান্দাদের তৈরি করেছেন, যারা মুজাহাদার দ্বারা মানুষদের অন্তর থেকে ঐ সব রোগসমূহ দূরীভূত করিয়ে তার স্থানে নম্রতা, খুলুসিয়্যত, সবর, শোকর ইত্যাদি ভাল গুণ অর্জন করানোর খিদমত আনজাম দিয়ে থাকেন ।

মোদ্দাকথা, দাওয়াতের কারণে মানুষের মধ্যে দ্বীনের তলব ও ক্বদর হওয়ার পর তারা ক্বারী সাহেবের নিকট গিয়ে সহীহ কুরআন পড়া শিখে, হক্কানী উলামাগন থেকে মাসায়িল শিখে এবং হাক্কানী পীর থেকে আত্মশুদ্ধি করিয়ে নেয়। আর এভাবে সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর গোটা তা'লীম ও প্রোগামকে বাস্তবায়ন করে থাকে। পবিত্র কুরআনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ত্রিমূখী দায়িত্ব অর্পিত

হয়েছে যে, তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) লোকদেরকে কুরআন পাঠ করে শোনান, তাদের আত্মশুদ্ধি করান এবং তাদেরকে কুরআন ও হাদীসের আহকাম শিক্ষা দেন।” (সুরা : জুমু‘আ-২)

সুতরাং যারা দ্বীনের দাওয়াতের কাজ আনজাম দিচ্ছেন, তাদের যিম্মাদারী হবে দ্বীনের দাওয়াতের সাথে সাথে দ্বীনের অবশিষ্ট বুনিয়াদী জিনিস গুলো হাসিল করার ব্যাপারে তৎপর থাকা। কারণ, যে দ্বীনের দাওয়াত তারা দিচ্ছেন, সে দ্বীনের উপর পূর্ণ ভাবে চলাই মুমিনের ফরজ। এজন্যই ছয় নম্বরের ভিতরে বলা হয় যে, এ ছয়টি বিষয়ের উপর আমল করতে পারলে পুরা দ্বীনের উপর চলা ও আমল করা সহজ হয়ে যায়। তাহলে বুঝা গেল পুরা দ্বীনের উপর চলার ফিকির রাখা জরুরী, আর এজন্যই বলা হয়েছে দ্বীনি দাওয়াতের সাথে সাথে প্রত্যেকের জন্য আল্লাহর কালাম সহীহ শুদ্ধ করে পড়ার ফিকির থাকতে হবে। তেমনিভাবে সকল ব্যাপারে মাসআলা-মাসায়িল জানার জন্য হক্কানী

উলামায়ে কিরামের সাথে যোগাযোগ রাখা এবং নিজের আত্মশুদ্ধির জন্য হাক্কানী বুযুর্গদের সাথে সম্পর্ক রেখে তাদের নিকট নিজের অবস্থা জানাতে থাকা পূর্ণ দ্বীনের উপর চলার জন্য অপরিহার্য। এ গুলো থেকে উদাসীন থেকে পূর্ণ দ্বীনের উপর চলা কখনও সম্ভব নয়।

সত্যিকার অর্থে যখন এ ধরণের ঈমান/আমল ওয়ালা পর্যাপ্ত পরিমাণ লোক তৈরি হবে, তখনই আল্লাহ তা'লা মুসলমানদেরকে দুনিয়ার রাজত্ব দান করবেন। যেমনটি কুরআনে পাকে ওয়াদা করা হয়েছে। (সূরাহ : নূর, ৫৫)

পরিশেষে সকল শ্রেণীর মুসলমান ভাইদের খিদমতে আরয, আজ সারা বিশ্বে দাওয়াত ও তাবলীগের নামে যে মেহনত চলছে, সেই মেহনতের সাথে যতদূর সম্ভব নিজেকে জুড়ে জামা'আতের সহযোগিতা করতে থাকুন। অবশ্য দ্বীনী দাওয়াতের আরো পদ্ধতি আছে, যেমন-হযরত মাওলানা যাকারিয়া রহ. ফাযায়িলে তাবলীগে

(পৃষ্ঠা ২১৭) উল্লেখ করেছেন “ওয়াজ নসীহত, মাদ্রাসার তা‘লীম, মুজাহিদের জিহাদ, মুআযযিনের আজান এগুলোও দ্বীনের দাওয়াতের মধ্যে শামিল। হযরত থানবী রহ.-এর “দাওয়াতুল হক”, হযরত মাওলানা শামসুল হক ফরীদপুরী রহ.-এর খাদিমুল ইসলাম জামাআত, দরসে নেজামীর সকল মাদ্রাসার তালীম, নূরানী ট্রেনিং, ওয়ায়েজগণের ওয়াজ, রাজনৈতিক ময়দানে ইসলামের জন্য সহী আন্দোলনকারীদের আন্দোলন-এ সবই দাওয়াতের মেহনতের মধ্যে শামিল। সুতরাং এগুলোকে ছোট করে দেখা যাবে না। প্রচলিত দাওয়াত ও তাবলীগের দ্বীনি কাজগুলোর ও যথাসাধ্য সহযোগিতা করতে হবে। এ কথা মনে রাখতে হবে যে, সকলের মেহনতই এক এক লাইনের দ্বীনী মেহনত। প্রত্যেকটিই দ্বীনের একেকটি অংশ। সবগুলি মিলেই পূর্ণাঙ্গ দ্বীন এবং সকল মেহনতের সমষ্টিই পরিপূর্ণ দ্বীনি মেহনত। কারণ, কোন একক জা‘মাআত এমন নেই যে, তারা দ্বীনের সকল লাইনের খিদমত আঞ্জাম দিচ্ছেন। বরং এক এক

জামা‘আতকে দিয়ে আল্লাহ তা‘আলা এক এক লাইনের খিদমত নিচ্ছেন। যেমন একটি বিল্ডিং তৈরিতে এক এক জন এক এক লাইনের মেহনত করছে। কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ রড মিস্ত্রী, কেউ রাজমিস্ত্রি কেউ জোগালী ইত্যাদি। সকলের সমন্বিত মেহনতেই বিল্ডিং তৈরি হবে । সুতরাং সকল প্রকার দ্বীনি জামা’আত দ্বীনের খিদমত করে যাচ্ছেন। তাদের সকলকে সহায়তা ও সমর্থন করা। এভাবে দ্বীনের সকল খাদিমগণের মধ্যে এক অভূতপূর্ব সৌহার্দপূর্ণ জোড়, সম্পর্ক ও ভালবাসা সৃষ্টি হবে । এতে দ্বীনের কাজ পরিপূর্ন গতিশীল ও ব্যাপক হবে । আর এটাই দ্বীনের চাহিদা।

উম্মতের প্রতি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ভালবাসা

فلعلك باخع نفسك ان لايكو نو ا مو منين

অর্থঃ “যদি তারা এই বিষয়টির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে, তবে তাদের পশ্চাতে সম্ভবতঃ আপনি

পরিতাপ করতে করতে নিজের প্রাণ নিপাত করবেন ।” (সূরাহ কাহ্‌ফ, আয়াত:৬)

এ সূরার প্রারম্ভে আল্লাহ পাক কুরআন মজীদ কি জন্য নাযিল করেছেন, তা ব্যক্ত করেছেন । অর্থাৎ কুরআন কাফেরদেরকে ভয় প্রদর্শন করবে, যাতে তারা ঈমান গ্রহণ করে এবং মুমিনদেরকে সুসংবাদ দান করবে, যাতে তারা ঈমানের উপর অটল থাকে। তাই কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাফিরদেরকে ভীতি প্রদর্শন এবং মুমিনদেরকে সুসংবাদ দিলেন এবং সকল মানুষের কল্যাণের আশা নিয়ে সঠিক পথের সন্ধান দিতে থাকলেন এবং নিজের সাধ্যানুযায়ী প্রাণপণ চেষ্টা করলেন, কিন্তু এত চেষ্টার পরও যখন দেখলেন যে, মক্কার মুশরিকরা আরো বেশী বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত হয়েছে, নানা রকম অসহনীয় কষ্ট দিতে শুরু করেছে, তখন এতে তিনি খুবই মর্মাহত ও চিন্তিত হয়ে পড়লেন । তাই আল্লাহ তা‘আলা হযরত রাসূলে আকরাম

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে উক্ত আয়াতে অবতীর্ণ করে সান্তনা দিলেন ।

তাফসীর: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমগ্র বিশ্ববাসীর কল্যাণ সরূপ। এজন্যই তিনি তাঁর সমগ্র জীবন উম্মতের কল্যাণ কামনায় কাটিয়ে দিয়েছেন। উম্মতের সবচেয়ে বড় সমস্যা এবং সর্বাধিক ক্ষতির বিষয় হচ্ছে, দুনিয়াতে ঈমানহারা হওয়া এবং এরই পরিণতিতে আখিরাতে চিরস্থায়ী জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়া। এই ক্ষতি থেকে উম্মতকে পরিত্রাণ দেওয়ার জন্য তিনি এত বেশী মেহনত করতেন যে, তিনি নিজের অস্তিত্ব পর্যন্ত বিলীন করে দেয়ার নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছিলেন এবং সর্বাবস্থায় সর্বস্থানে শুধু এ চিন্তায় নিমগ্ন থাকতেন যে, সকল মানুষ কিভাবে ঈমানদার হয়ে যায় আর এ উদ্দেশ্যে তাঁদের মাঝে ব্যাপকভাবে দাওয়াত দিতে থাকতেন ।

তিনি দ্বীনি দাওয়াতের সকল প্রকার পন্থাই অবলম্বন করেছিলেন কখনো পৃথকভাবে দাওয়াত দিয়েছেন।

আবার কখনো সম্মিলিত মজলিসে দাওয়াত পেশ করেছেন। তাঁর পৃথকভাবে দাওয়াত পেশ করার নমুনা স্বরূপ হযরত আসমা রা.-এর হাদীসটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বর্ণনা করেন, হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন আবু কুহাফাকে (হযরত আবু বকর রা.-এর পিতা) বললেন-“আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন-মুক্তি পেয়ে যাবেন।” সুতরাং তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন। (হায়াতুস্ সাহাবাঃ ১খঃ , ৭৮ পৃঃ)

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সম্মিলিত সমাবেশে দ্বীনের দাওয়াত পেশ করা সম্পর্কে ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, একদা সূর্য অস্ত যাওয়ার পর পর বাইতুল্লাহ শরীফের সামনে মক্কার মুশরিকদের সমাবেশ হল । তাতে ছিল রাবী‘আর দুই পুত্র উতবাহ ও শাইবাহ, আবু সুফিয়ান, আবু জাহল, উমাইয়া বিন খলফ, আস বিন ওয়ায়েল প্রমুখ। তারা পরামর্শ করছিল যে, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া

সাল্লাম কে ডেকে ভালভাবে বুঝাবে, যাতে মানুষ একথা বলতে না পারে যে, তোমরা তাকে বুঝাওনি এবং তাকে এ কাজ থেকে ফিরানোর জন্য কোন চেষ্টা করনি । সুতরাং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ডাকার জন্য তাদের মধ্য হতে একজন কে পাঠানো হল এবং তাকে বলে দেয়া হল যে, সে তাঁর নিকট গিয়ে বলবে কুরাইশদের সম্মানিত ব্যক্তিগণ জমা হয়েছেন। তারা আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে চান। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তৎক্ষনাৎ সেখানে এ আশা নিয়ে উপস্থিত হলেন যে, হয়ত তারা ইসলাম গ্রহণ করবে, হয়ত আমার কথা তাদের দিলের মধ্যে রেখাপাত করেছে। আর তিনি মনে প্রাণে চাইতেন যে, কুরাইশরা ইসলাম গ্রহণ করুক এবং কুফরীর কারণে ধ্বংসের সম্মুখীন না হোক। তিনি আসার পর কুরাইশরা তাঁকে অনেক কথা বুঝাতে চাইল এবং রাজত্ব প্রদানের আশ্বাস দেয়া থেকে আরম্ভ করে মাল-দৌলত, নেতৃত্ব সুন্দরী নারী ইত্যাদির লোভ দেখাল। সব শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা যা বলছো এর কিছুই আমার উদ্দেশ্য নয়। আমাকে তো আল্লাহপাক তোমাদের নিকট রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেছেন এবং আমার উপর কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। আর আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে মানুষকে জান্নাতের সুসংবাদ এবং জাহান্নামের ভয় প্রদর্শন করতে। তাই আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর পয়গাম পৌঁছে দিলাম। যদি তা গ্রহণ কর, তাহলে দু’জাহানে কামিয়াব হয়ে যাবে। আর যদি তা গ্রহণ না কর, তাহলে আমি ধৈর্যধারণ করব। এমনিভাবে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন।” [হায়তুস্ সাহাবা, ১খঃ ৮৩ পৃঃ]

হজ্জের মৌসুমে এবং বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত মেলাসমূহে বিভিন্ন গোত্রের নিকট তিনি দাওয়াত পৌঁছিয়েছেন। তিনি এক এক গোত্রের তাবুর নিকট গিয়ে বলতেন, তোমরা আমাকে সামান্য সাহায্য কর, যাতে আমি আল্লাহর দ্বীনকে মানুষের নিকট পৌঁছাতে পারি। তার প্রতিদানে তোমরা জান্নাত পেয়ে যাবে। কিন্তু অধিকাংশ

লোকেরাই তার কথায় সাড়া দেয়নি। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দাওয়াত কবুল করেনি। শুধু এতটুকুই নয়, বরং তারা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে নানাভাবে কষ্ট দিয়েছে । নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনেকের অনেক গাল-মন্দ শুনেছেন । মারপিটও খেয়েছেন । যেমন, রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাওয়াত দিতে দিতে বনী আমের বিন সা’সাআহ-এর নিকট পৌছলেন । তখন তারা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এমন কষ্ট দিল, যা অন্য কেউ দেয়নি। অর্থাৎ তারা তো ইসলাম গ্রহণ করলই না, বরং রাসূলুল্লাহ যখন চলে যেতে লাগলেন, তখন পিছন থেকে তারা পাথর মারতে শুরু করে দিল। যাতে তিনি অনেক কষ্ট পেয়েছেন। [হায়াতূস সাহাবা ১ম খঃ , ৮৭, পৃঃ)

বাজারের মধ্যেও তিনি দাওয়াত পৌঁছিয়েছেন। যেমন, হযরত রাবী বিন উবাদ রা. বলেন-আমি জাহিলিয়্যাতের যমানায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যুলমাজায বাজারে

একথা বলতে শুনেছি যে, “হে লোক সকল! তোমরা বল “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ” কামিয়াব হয়ে যাবে তখন তাঁর চতুর্পার্শ্বে বহু লোক ভির করে ছিল এবং তার পিছনে একজন লোক উচ্চ আওয়াজে এ কথা বলছিল যে, এই লোক বে-দ্বীন হয়ে গেছে এবং সে মিথ্যাবাদী। শুধু তাই নয়, বরং রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেদিকে যেতেন, সেও পিছনে পিছনে সেই দিকেই যেত। আমি মানুষকে জিজ্ঞাসা করলাম, এ লোকটি কে? জওয়াব দেয়া হল যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চাচা আবু লাহাব।” (হায়াতুস সাহাবা , ১খঃ ১০৪ পৃ)

তিনি পায়দল সফর করেও দাওয়াতের কাজ করেছেন। যেমন, তায়িফবাসীদের নিকট পায়দল সফর করে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন। কিন্তু তারা ইসলাম গ্রহণ তো করেইনি, বরং এমন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে যা অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ও হৃদয় বিদারক । তায়িফের নেতৃস্থানীয় লোকেরা প্রথমতঃ ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও গালমন্দ করে নবীজী সাল্লাল্লাহু

‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জর্জরিত করে ফেলল। তারপর দুষ্ট ছেলেদের লেলিয়ে দিয়ে পাথর নিক্ষেপ করে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শরীর মুবারক ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলল। তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি বহু কষ্টে উঠে এলে পুনরায় তাঁকে পাথর মেরে মেরে রক্তাক্ত করা হলো। তিনি আবার মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। এমনিভাবে হযরত সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সমস্ত শরীর রক্তে রঞ্জিত হয়ে যায়। রক্তের কারণে জুতা পায়ের সাথে কঠিনভাবে আটকে যায়। এত কিছুর পরেও রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের জন্য কোনরূপ বদ-দু‘আ করেন নি। বরং তাদের হিদায়াতের জন্য দু‘আ করেছেন। আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়ার প্রস্তাব পেয়েও তিনি তা মঞ্জুর করেননি, বরং তাদের ছেলে-সন্তানদের ইসলাম কবুলের আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। সার কথা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানব জাতির

হিদায়াত ও তাদের উভয় জাহানের সার্বিক কল্যাণ কামনায় বড়ই আকাঙ্ক্ষিত ছিলেন। কোন কোন কাফিরকে সত্তর বারের বেশী ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন। আর এ ব্যাপারে তিনি এত বেশী পেরেশান ও অস্থির থাকতেন যে, আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত আয়াত অবতীর্ণ করে তাঁকে সান্ত্বনা প্রদান করেছেন। অর্থাৎ "তারা যদি ঈমান না আনে, তাহলে তাদের চিন্তায় কি আপনি নিজেকে ধ্বংস করে দিবেন ? " [সূরাহ কাহ্‌ফ ৬]

মুমিনগণের প্রতিও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অতিশয় স্নেহশীল ও দয়ালু ছিলেন। মানব জাতি কোন দুঃখ-কষ্টে লিপ্ত হবে এবং আযাব-গযবে পড়বে-এটা সহ্য করতে পারতেন না। একথার প্রমাণ স্বয়ং কুরআনে মাজীদে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন: "তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল, তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তার পক্ষে সহ্য করা দুঃসহ। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময়। (সূরাহঃ তাওবাহ-১২৮)

অন্যত্র ইরশাদ করেনঃ “নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুমিনদের ব্যাপারে এতটুকু স্নেহ-মমতা রাখেন, যতটুকু মুমিনগণ স্বীয় নফস সম্পর্কে স্নেহ-মমতা রাখে না। অর্থাৎ আমরা নিজেকে যতটুকু মুহাব্বত করি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার চেয়ে বেশী আমাদেরকে মুহাব্বত করেন।” [সূরাহ : আহ্যাব-৬]

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম গুনাহগার উম্মতের প্রতি যে এত মুহাব্বাত রাখেন, তার প্রমাণ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতিটি কাজ কর্ম থেকে প্রকাশ পেয়েছে। আর তিনি দুনিয়াতে উম্মতকে বাঁচানোর জন্য চেষ্টা ফিকির করে শেষ করেছেন এমন নয়, বরং তিনি আখিরাতেও গোনাহগার উম্মাতকে বাঁচানোর জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করবেন । এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,“প্রত্যেক নবীকেই কবুলের বিশেষ নিশ্চয়তা দিয়ে একটি দু‘আ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে । সকল নবীগণ আ. দুনিয়াতেই সেই দু‘আটি চেয়ে

নিয়েছেন। কিন্তু আমি সেই অধিকার দুনিয়াতে প্রয়োগ করিনি, আখিরাতে আমি আমার গুনাহগার উম্মতের নাজাতের জন্য তা সংরক্ষণ করে রেখেছি ।” [মুসলিম শরীফ হাঃ নং ৩৩৮৭]

এসব ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে,তিনি সর্বাবস্থায় এ ফিকিরে নিমগ্ন থাকতেন যে, কিভাবে সকল মানুষ ঈমানদার হয়ে যায় এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাতী হয় ।

হযরত আবু যর গিফারী রা. বলেন- “একটি পাখি যদি আপন দুই ডানা মেলে আকাশে উড়তো, তবে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা থেকে আমাদেরকে একটি নসীহত বা জ্ঞানের কথা বলতেন।” (তাফসীর ইবনে কাছীর, ২খঃ ৪১২ পৃঃ)

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন- “আল্লাহ তা‘আলা কতিপয় বস্তুকে হারাম করেছেন অথচ তিনি এটাও অবগত আছেন যে, তোমাদের অনেকেই তাতে লিপ্ত হবে। আর আমি তোমাদের কোমর ধরে ধরে ঐ সব হারাম

কাজ থেকে তোমাদের হিফাজত করেছি । অথচ তোমরা পতঙ্গের মত সেই আগুনের মধ্যে ঝাঁপ দিতে উদ্যত হচ্ছো।” (বুখারী,হাঃ নং ৬৪৮৩)

অত্র আয়াত থেকে শিক্ষনীয়ঃ

এ আয়াতে একজন নায়িবে নবী (অর্থাৎ আলেম) ও দাঈ (অর্থাৎ দ্বীনদার ব্যক্তি)-এর দায়িত্ব সুস্পষ্ট রূপে বিধৃত হয়েছ। সারা দুনিয়ার সকলেই কিভাবে দ্বীনের জ্ঞান পেয়ে যায়, সে চিন্তায় যারা দ্বীন সম্পর্কে কিছু বুঝেছে, তাদের সর্বদা উদ্বিগ্ন থাকা জরুরী। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সীনা মুবারক হতে উত্তপ্ত ডেগের ফুটন্ত পানির আওয়াজের মতই করুণ আওয়াজ উম্মতের প্রতি সমবেদনায় নির্ঝরিত হত ।

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেমন সারা বিশ্বের জন্য রহমত স্বরূপ, তেমনিভাবে উম্মতে মুহাম্মাদী বিশ্ববাসীর জন্য কল্যাণকর। সুতরাং বিশ্ববাসীর নিকট দ্বীন ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেয়া এ উম্মতের উপর ফরজে কিফায়া। অর্থাৎ

সামান্য সংখ্যক লোক দায়িত্ব আঞ্জাম দিলে, সকলে দায়িত্ব মুক্ত হতে পারবে না ।বরং নির্দিষ্ট সংখ্যক লোক মানুষের ময়দানে কাজ করতে হবে, যাতে করে বিশ্বের সকলের নিকট দাওয়াত পৌঁছানো সম্ভব হয়। এটাই ফরযে কিফায়ার অর্থ । সুতরাং এ ব্যাপারে আমাদের সকলের দায়িত্ব ও কর্তব্য যে প্রথমতঃ আমরা ঈমান আমল সহীহ করার ফিকির ও প্রচেষ্টা চালাব তারপর নিজের পিতা-মাতা,ভাই-বোন, স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, আত্মীয়-স্বজন ,বন্ধু-বান্ধব, পাড়া- প্রতিবেশীদের ঈমান ও ‘আমল সহীহ করার জন্য শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী দাওয়াত দিবে এবং প্রচেষ্টা চালাবে ।

এরই পাশাপাশি অমুসলিম ভাইদেরকে শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিবে। তাদের নিকট ইসলামের পরিচিতি তুলে ধরবে এবং সহজ সরলভাবে তুলে ধরবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই বলে গেছেন “ আমি সহজ সরল দ্বীন নিয়ে তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি। নিশ্চয়ই দ্বীন অতি সহজ। তোমরা

লোকদের নিকট দ্বীনকে সহজ ভাবে পেশ করো। কঠিন ও দুঃসাধ্য করে নয়।” (ইবনে মাজাহ-৪৩) আর একমাত্র ইসলাম ধর্মই মানুষকে চিরস্থায়ী জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিতে পারে-একথা বুঝাব। এ কাজের জন্য নিজের এলাকা, দেশ ও সারা বিশ্বের অমুসলিমদেরকে আমাদের কাজের কর্মক্ষেত্র মনে করব এবং নিজের শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী বিভিন্ন হিকমতের মাধ্যমে তাদের কাছে দাওয়াত পৌঁছাব। আমাদের দ্বারা যদি একজন অমুসলিমও ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে সমগ্র দুনিয়া থেকে বড় দৌলত হাসিল হয়ে যাবে এবং এটাই আমাদের নাজাতের সবচেয়ে বড় উসীলা হতে পারে।

তাবলীগ সম্পর্কিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১: দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ কি ফরজে আইন? দাওয়াতের কাজের তারতীব কি? হুজুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন তারতীবে দাওয়াতের কাজ করেছেন? প্রচলিত তাবলীগী

জামা‘আত যে তারতীবে কাজ করছে, তার বাস্তবতা কতটুকু?

উত্তর: উম্মতে মুহাম্মাদীর উপর নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি যেমনিভাবে ফরয করা হয়েছে, ঠিক তেমনি ভাবে মানুষকে দ্বীনের দিকে দাওয়াত দেয়াও ফরজ করা হয়েছ। অর্থাৎ উম্মতে মুহাম্মাদী শুধু নিজে নিজে দ্বীনের উপর আমল করলেই তার দায়িত্ব শেষ হবে না । বরং অন্যকেও ঐ সমস্ত আমলে আমলদার বানানোর জন্য আজীবন চেষ্টা করতে হবে।

কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন স্থানে এর গুরুত্বের বর্ণনা রয়েছে। বিশেষ করে হুজুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজ্বের সময় অমীয় বাণীতে “তোমরা যারা উপস্থিত আছ, তারা অনুপস্থিত ব্যক্তিদের নিকট আমার কথা পৌঁছে দিবে।”। এর দ্বারা সমস্ত উম্মতে উপর দাওয়াতের কাজকে ফরজ বলে ঘোষণা করেছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণীর বাহক হয়ে সমস্ত সাহাবায়ে কিরামগণ রা. বিশ্বের আনাচে কানাচে পৌঁছে গিয়ে দাওয়াতের কাজ করেছেন। তাই আজ লক্ষ্য করলে মক্কা-মদীনায় সাহাবায়ে কিরামের কবর খুব কমই পাওয়া যায়। সোয়া লক্ষ সাহাবীর মধ্যে আনুমানিক দশ হাজার সাহাবীর রা. কবর মক্কা-মদীনায় পাওয়া যায় আর অন্যদের কবর সুদূর চীন, রাশিয়া, সুদান, আফ্রিকা ও বিশ্বের অন্যান্য স্থানে বিদ্যমান। মোট কথা-নামায ,রোযা ইত্যাদির মত দাওয়াতের কাজও ফরজ। উল্লেখ্য যে দাওয়াতের কাজ দু’প্রকারে বিভক্তঃ

১. নিজের শক্তি ও সামর্থ্যের মধ্যে থেকে নিজের পরিবার, পাড়া-প্রতিবেশী ও বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করতে থাকা। এটা ফরজে আইন।

২. মুসলমানদের পক্ষ থেকে কিছু লোক সব সময় দাওয়াতের কাজ করতে থাকা। একদল কাজ

করতে থাকবে অন্যদল ঘরের জরুরত পুরা করে নিবে এবং যারা দ্বীনের রাস্তায় বের হয়ে গেছে, তাদের পরিবারের খোঁজ-খবর নিবে। অতঃপর বাড়ীতে অবস্থানকারীরা দাওয়াতের কাজে বের হয়ে যাবে এবং ময়দানের গ্রুপ বাড়ীতে ফিরে আসবে। এভাবে মুসলমানগণ জামা'আতভুক্ত হয়ে মুসলিম-অমুসলিম সকলকেই দ্বীন-ইসলামের দিকে আহ্বান করতে থাকবে ।

লোকদেরকে ভাল কাজ করতে বলবে এবং মন্দ কাজ ও জাহান্নামের কাজ থেকে বিরত থাকতে বলবে। এ ধরনের পর্যাপ্ত পরিমাণ জামা'আতের সর্বক্ষণ ময়দানে কাজ করা ফরজে কিফায়াহ্ ।

শরীয়তের দৃষ্টিতে দাওয়াতের কাজের জন্য নির্ধারিত বা অবধারিত বিশেষ কোন তারতীব নেই। বরং ইসলাম সমর্থিত যে কোন তারতীবেই দাওয়াতের কাজ করা যায়। হুজুর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যমানায় দাওয়াতের কাজ বিভিন্নভাবে করা হত। কখনো হুজুর সাল্লাল্লাহু

‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহল্লায় মহল্লায় দ্বারে দ্বারে গিয়ে ঈমানের দাওয়াত দিতেন। আবার কখনো কাফিরদের কোন মজলিসে গিয়ে ওয়াজ নসীহতের মাধ্যমে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছাতেন। আবার কখনো সবাইকে একত্রিত করে বেহেশতের সুসংবাদ ও দোযখের ভয় প্রদর্শন করে দ্বীনের উপর চলার জন্য দাওয়াত পেশ করতেন । আবার কখনো নিজের এলাকা ছেড়ে অন্য এলাকায় গিয়ে দাওয়াত দিতেন। এমনিভাবে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কিরামের রা. জামা‘আত বিভিন্ন এলাকায় বা গোত্রের নিকট বা ব্যক্তি বিশেষের নিকট পাঠিয়েও দ্বীনের দাওয়াত পৌছানোর কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন।

দ্বীনী দাওয়াতের তাগিদে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রয়োজন বোধে হিজরতও করেছেন । আবার কখনো চিঠির মাধ্যমে বিভিন্ন গোত্রের সরদার ও রাজা-বাদশাহদের নিকট দাওয়াত পৌঁছিয়েছেন অনুরূপভাবে জিহাদের

মাধ্যমেও “আমর বিল মা‘রূফ ও নাহী আনিল মুনকার” এর কাজ করেছেন ।

মোটকথা, হুজুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যামানায় দাওয়াতের কাজ নির্দিষ্ট এক তারতীবে সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন তরীকায় দাওয়াতের কাজ করা হয়েছে । হুজুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দা‘ওয়াতী যিন্দেগী সম্পর্কে আরো বিস্তারিত তথ্য জানতে হলে, মাওলানা ইউসুফ রহ. রচিত-“হায়াতুস সাহাবা “ নামক কিতাব দেখুন।

বর্তমান ‘তাবলীগী জামা‘আত’ দ্বারা যেহেতু বিশ্বের আনাচে কানাচে দ্বীনের কাজ চলছে, এর তরজ-তরীকা শরীয়তের কোন বিধানের পরিপন্থীও নয়। বরং তা বিজ্ঞ আলেমগণের কুরআন ও সুন্নাত ভিত্তিতে চিন্তা-ফিকির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁদের পরামর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত। সুতরাং তাবলীগী জামা‘আতের তরয বা তরীকা সম্পূর্ণ সঠিক। উল্লেখ্য যে, প্রচলিত তাবলীগ জামা‘আতের উমুমী

গাশত, খুসূসী গাশত, বিভিন্ন এলাকায় জামা'আত পাঠানো, মসজিদে তা'লীম করা ইত্যাদি এ সবেরই প্রত্যেকটির নমুনা এবং বুনিয়াদ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত। তবে একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে প্রচলিত তাবলীগ জামা'আতের মেহনত দ্বীনী দায়াতের জবরদস্ত অংশ বটে। কিন্তু দ্বীনের দাওয়াতের কাজ কেবল যে শুধু এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ, এমন নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাজা-বাদশাহগণকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে পত্র দিয়েছেন। দাওয়াত কবুল না করলে, তাদের সাথে পর্যায়ক্রমে নিয়মতান্ত্রিকভাবে জিহাদ করেছেন। কিংবা কোন গোত্রের নিকট দ্বীন প্রচার করার পর কবুল না করলে বশ্যতা স্বীকার করতে বলতেন। তা-ও না করলে, জিহাদ ঘোষণা করতেন। তাই দ্বীনি পত্র প্রেরণ, জিহাদ ইত্যাদিও তাবলীগী কাজের গণ্ডির ভিতর গণ্য।

কেউ যদি তাবলীগী জামা'আতের সহিত কোন সম্পর্ক ছাড়াও ব্যক্তিগতভাবে দাওয়াতের কাজ

করতে থাকে; সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করতে থাকে, তাহলেও তার দা‘ওয়াতী দায়িত্ব ও যিম্মাদারী আদায় হবে।তবে জামা‘আতের সাথে থাকার ফায়দা ও খাইর-বারাকাত আলাদা। তা হাসিল করতে হলে, হক্কানী জামা‘আতের সাথে জুড়ে থাকা কর্তব্য ।

মোদ্দাকথাঃ আসল হচ্ছে দ্বীনের প্রচার ও প্রসারের মেহনত করা। যুগের চাহিদার ভিত্তিতে তার তারতীব বিভিন্ন রকম হতে পারে। বস্তুতঃ পরিবেশ, পারিপার্শ্বিকতা ও মানুষের হালত ইত্যাদির তাকাজায় আল্লাহপাক স্বয়ং এক এক যুগের উলামাদের জেহেনে এক এক রকম যুগোপযোগী তারতীব ইলহাম করেন। তাঁরা সেই তারতীবে কাজ করে উম্মতকে দ্বীনের দিকে টেনে আনেন। সেই পদ্ধতিতে আল্লাহ ভোলা অসংখ্য মানুষ আল্লাহর পথে ফিরে আসে। তাই মুল জিনিস হল ঈমান ও আমলের দাওয়াত ও মেহনত। তারতীব শুধু কাজের দ্রুত প্রচার ও সুবিধার জন্যে। [প্রমাণ :ফাতাওয়া মাহমুদিয়া, ১: ৪১৬-৪৬৫]

প্রশ্ন ২: শরীয়তের দৃষ্টিতে “নাহী আনিল মুনকার” অর্থাৎ ! অসৎ কাজে বাধা প্রদান ফরজে কিফায়া এবং গুরুত্বপুর্ণ ইবাদত। কিন্তু তাবলীগের লোকেরা শুধু সৎ কাজের আদেশ দেয়। কখনও নাহী আনিল মুনকারের ব্যাপারে কিছু বলেন না বা বাতিলের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ, প্রতিরোধ বা জিহাদ কোনটাই শরীক হন না। তাদের এরূপ করা কি ঠিক?

উত্তরঃ “তাবলীগের লোকেরা নাহী আনিল মুনকার তথা অসৎ কাজের নিষেধ করেন না” এ কথাটি ঠিক নয়। কারণ, অনেক ক্ষেত্রে সৎ কাজের আদেশের মাধ্যমে অসৎ কাজের নিষেধও হয়ে যায়। যেমনঃ তারা নামায পড়ার জন্য মানুষকে দাওয়াত দেন ,উৎসাহ প্রদান করেন। যার ফলে বহু লোক নামাযী হয়ে যায়। এখন তাদের এই দাওয়াতের মাধ্যমে নামায না পড়া যে “মুনকার” বা অন্যয় কাজ ছিল, হেকমতের সাথে সেই মুনকারের বাঁধা দেয়া হয়ে যায়। কোন প্রতিবাদ বা সংঘর্ষের প্রয়োজন হয় না। এই পদ্ধতিতে তারা

অসংখ্য “নাহী আনিল মুনকার” করে থাকেন । এখন বাকী রইল এমন কতগুলো মুনকার-যা তাবলীগের দ্বারা তৎক্ষনাৎ প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ করা যায় না অথচ সেটারও প্রতিবাদ-প্রতিরোধ মুসলমানদের জন্য ফরজে কিফায়া।

তবে একথা ঠিক, তাবলীগের মাধ্যমে এই ফরজে কিফায়াটা করা সম্ভব হবে না। কারণ হল, এটা যেহেতু ফরজে কিফায়া, তাই তা সকলের জন্য করা জরুরী নয়। আর শুধু এক তাবলীগ পক্ষ থেকে সব ধরনের কাজ করাও সম্ভব নয়। মুসলমানদের রাজনৈতিক বা অরাজনৈতিক যে কোন জামা‘আতের পক্ষ থেকে এটা করা যায়। তাতে সকলেই ফরজে কিফায়ার দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে যায়। যেমনঃ মুরতাদ সালমান রুশদী , ডঃ আহমদ শরীফ ও তসলিমা নাসরিনের বিরুদ্ধে মুসলমানরা প্রতিবাদ করেছে এবং করছে ।

তাবলীগের মেহনতটা বিশ্বজুড়ে একটা নীরব আন্দোলন। এই আন্দোলন বাস্তবায়িত হলে, সে

দিন মুসলমানদের মৌলিক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। বিভিন্ন হেকমতের কারণে কিছু “নাহী আনিল মুনকার” তাবলীগের নামে করা সত্যই মুশকিল। তাতে ফরজে কিফায়া করতে গিয়ে তাদের অনেক জরুরী কাজ বাধাপ্রাপ্ত হয়ে যেতে পারে। এই মজবুরীর কারণে তাবলীগের নামে এ জাতীয় খিদমত আঞ্জাম দেয়া যায় না। এ জন্য হযরত শাইখ যাকারিয়া রহ. তাবলীগী জিম্মাদারদেরকে বলতেন, তারা যেন সমাজের মুনকারাতের (অন্যায়-অপকর্মের) ব্যাপারে মাথা না ঘামান। বরং তারা যে কাজ নিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন, সেই কাজ নিয়েই যেন চলতে থাকেন। অতঃপর তিনি হযরত থানবী রহ.-এর উদ্বৃতি দিয়ে বলেন যে. হযরত থানবী রহ. বলতেন: (বিশ্বব্যাপী কাজের স্বার্থে) তারা যখন মুনকারাতের ব্যাপারে প্রতিবাদ না করার উসূল বানিয়েছেন, তো তাদের সেই উসূলের উপর থাকা উচিৎ। (মালফুযাতে শাইখ রহ.-২৮)

বাস্তবিকপক্ষে অনেক সময় এমন ঘটে যে, অনেক কাজ এক সাথে করতে গেলে কোনটাই সুন্দরভাবে সম্ভব হয় না। বরং সবটাই অসুন্দর হয়ে যায়, বা সম্পূর্ণটা বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এর কারণে শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে বিশেষ বিশেষ সাবজেক্টের ভিত্তিতে বড় বড় মাদ্রাসা কলেজ ভার্সিটিগুলোকে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। এক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সবগুলো সাবজেক্ট রাখা হয় না। (এটা শুধু উদাহরণ স্বরূপ বলা হল ।)

প্রশ্ন-৩: তাবলীগী জামা'আতের লোকেরা মসজিদে থাকে,খায়,ঘুমায় । শরীয়তের দৃষ্টিতে এটা জায়িয কিনা?

উত্তরঃ ইমাম বুখারী রহ. স্বীয় বুখারী শরীফে মসজিদে শয়ন সম্পর্কে স্বতন্ত্র অধ্যায়ের সূচনা করেছেন। সেখানে তিনি অস্থায়ীভাবে মসজিদে থাকা জায়িয প্রমাণিত করেছেন।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রা. যুবক বয়সে নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর

মসজিদে শয়ন করতেন। তখন তার স্ত্রী ছিল না অর্থাৎ তিনি তখন অবিবাহিত ছিলেন। (বুখারী শরীফ, ১:৬৩)। হযরত সাহল বিন সা'আদ রা.-এর বর্ণনায় বলা হয়েছে, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত ফাতেমা রা.-এর নিকট উপস্থিত হয়ে হযরত আলীর রা. কথা জিজ্ঞাসা করেন। হযরত ফাতেমা রা. বললেনঃ তিনি কোন কারণে নারাজ হয়ে কোথাও চলে গেছেন। এ কথা শুনে তাকে তালাশ করার জন্য মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোক পাঠালেন। তালাশ করার পর লোকটি এসে বলল: তিনি মসজিদে ঘুমিয়ে রয়েছেন। এ সংবাদ পেয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে গমন করলেন দেখলেন! হযরত আলী রা. নিদ্রায় বিমগ্ন এবং তাঁর গায়ের চাদর সরে গিয়ে তাঁর গায়ে ধুলোবালি লেগে গিয়েছে। তাঁকে জাগ্রত করতে গিয়ে নবী করিম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ ওহে আবু তুরাব (মাটি মাখা) উঠো।"

(বুখারী শরীফ, ১:৬৩৩) এমনিভাবে এ সম্পর্কে অনেক হাদীস বিদ্যমান আছে।

এছাড়া তাবলীগ জামা‘আতের লোকেরা অনেকে মুসাফির থাকে, তাছাড়া তারা মসজিদে প্রবেশ করেই ইতিকাফের নিয়্যত করে থাকেন। আর মুসাফিরের জন্য বা ইতিকাফের নিয়্যত করার পরে মসজিদে থাকা, খাওয়া ও শোয়াতে শরীয়তের দৃষ্টিতে কোন অসুবিধা নেই । তদুপরি সর্বত্র দ্বীনের প্রচার-প্রসারে ও দাওয়াতের মহান যিম্মাদারী আদায়ের জন্য মসজিদই উপযুক্ত স্থান। তাবলীগের জন্য এর বিকল্প নেই । তবে কোন মসজিদ কর্তৃপক্ষ যদি তাবলীগ জামা’আতের লোকদের জন্য মসজিদ-এর আশে পাশে মসজিদ আবাদ করারই অঙ্গ সরূপ ভিন্ন কামরা নির্মাণ করে দেন; তা খুবই উত্তম।

অজ্ঞতা প্রসূত অনর্থক অজুহাত খাঁড়া করে তাবলীগী জামা‘আতকে নিন্দা বা অপদস্থ করা মারাত্মক অপরাধ। কারণ দ্বীন শিক্ষা করা বা দ্বীনের পূর্ণতা

অর্জনের লক্ষে নিজের খরচে নিঃস্বার্থভাবে দ্বীনের দাওয়াতের ইখলাসপূর্ণ মেহনতে-তাবলীগী জামা'আত একটি হক্কানী সহীহ জামা'আত। এ ব্যাপারে সমগ্র পৃথিবীর উলামাগণ একমত। এর কার্যক্রম ও ব্যবস্থাপনা হক্কানী উলামা-মাশায়িখের পরামর্শ অনুযায়ীই হয়ে থাকে। বর্তমান যামানায় সাধারণ লোকদের দ্বীন ও ঈমান শিক্ষার জন্য তাবলীগী জামা'আতের মেহনত খুবই মুবারক ও উপকারী। এ মেহনতের ওসীলায় বহু পথভোলা মানুষ সহীহ পথের সন্ধান পেয়ে দ্বীনদার হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছেন এবং করছেন । তাই দ্বীনের এ মেহনতে অংশ নিতে না পারলেও অন্ততঃ এর সমর্থন ও সম্ভাব্য সহযোগিতা করা প্রত্যেক মুসলমানের দ্বীনী দায়িত্ব।

প্রশ্ন-৪: তাবলীগ জামা'আতের লোকেরা বলে থাকেন, "তাবলীগে বের হয়ে ১টি টাকা খরচ করলে, সাত লক্ষ টাকা দান করার সাওয়াব হয় এবং কোন নেক আমল করলে ৪৯ কোটি নেক

আমলের সাওয়াব হয়। এক এক কদমে ৭০০ নেকী হয়” এগুলোর কোন প্রমাণ আছে কি না?

উত্তরঃ দ্বীনের প্রচার ও প্রসারের প্রচেষ্টা চালান প্রত্যেক মুসলমানের যিম্মাদারী। বর্তমান যামানায় দ্বীনের প্রচার-প্রসার ও বে-দ্বীনির প্রতিরোধ তাবলীগের মাধ্যমে দ্রুত কার্যকর হচ্ছে। অন্যদিকে জিহাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর কালিমা বূলন্দ করা এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা। কাফের হত্যা করা, বে-দ্বীনের খতম করা জিহাদের আসল উদ্দেশ্য নয়। বরং তারা আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের পথে বাধা, তাই বাধা দুর করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে তাদেরকে খতম করা ফরজ করা হয়েছে। সেই প্রেক্ষিতে জিহাদের যে মূল লক্ষ্য,দাওয়াত ও তাবলীগের সেই একই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। উক্ত লক্ষের বাস্তবায়নের জন্যই রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নির্দেশ অনুযায়ী দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে তাবলীগের নামে সমগ্র বিশ্বে ঘোরাফেরা করা হচ্ছে। সে জন্য জিহাদের ব্যাপারে

যে সব ফজীলত বর্ণিত হয়েছে,সেগুলো তাবলীগের ব্যাপারেও প্রযোজ্য হবে।

এখানে প্রশ্নে উল্লেখিত সওয়াব গুলো আসলে জিহাদের ফযীলতের ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে, তথাপিও সেগুলো তাবলীগের ব্যাপারে বয়ান করতে কোন অসুবিধা নেই। এ ব্যাপারে হক্কানী উলামায়ে কিরাম ঐক্যমত পোষণ করেন। এ সম্পর্কিত হাদীসগুলোর প্রতি লক্ষ্য করুন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি দ্বীনের রাস্তায় খরচ পাঠিয়ে দিল এবং নিজে শরীক হওয়ার সুযোগ পেল না, তাকে প্রতি দিরহামের বিনিময়ের সাত শত দিরহাম দান করার সওয়াব দেয়া হবে।” হাদীসে আরো আছে, “যে ব্যক্তি স্বয়ং আল্লাহর রাস্তায় বের হবে এবং আল্লাহর রাস্তায় খরচ করবে তার প্রতি দিরহামে সাত লক্ষ দিরহাম খরচ করার সাওয়াব হাসিল হবে।” উক্ত কথার প্রমাণ স্বরূপ হুজুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই আয়াত তিলাওয়াত করেন যার অর্থ : আল্লাহ তা’আলা যার জন্য ইচ্ছা

করেন তার (আমলের) সাওয়াবকে বর্ধিত করতে থাকেন। (সূরা বাকারা, ইবনে মাজা : ১৯৮)

অন্য এক হাদীসে আছে, দ্বীনের রাস্তায় নামায, রোযা, জিকির অর্থাৎ শারীরিক ইবাদাত দ্বীনের রাস্তায় পয়সা-কড়ি খরচ করা থেকে সাত শত গুণ বেশি সাওয়াবের কাজ । (আবু দাউদ শরীফ, ৩৩৮)

সে হিসেবে পয়সা-কড়ি খরচ করলে যদি সাত লক্ষ গুণ সাওয়াব পাওয়া যায় তাহলে শারীরিক ইবাদতগুলোর ক্ষেত্রে তার সাথে আরো সাত শত গুণ বৃদ্ধি করতে হবে তাতে দেখা যায় যে, একবার সুবহানাল্লাহ পড়লে, উনপঞ্চাশ কোটি বার সুবহানাল্লাহ পড়ার সাওয়াব পাওয়া যাবে । এমনিভাবে নামায রোযা ইত্যাদির হিসাব হবে।

অন্য এক হাদীসে আছে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. যখন হযরত উসামা রা. কে জিহাদের জন্য বিদায় দিতে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি পায়ে হেঁটে চলছিলেন এবং উসামা সাওয়ারীর পিঠে চড়ে চলতে ছিলেন। উসামা আরয করলেন, “হে

আমীরুল মুমিনীন! হয়তঃ আপনিও আরোহণ করুন, নতুবা আমি নেমে আসব। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. বললেন: খোদার কসম! উসামা তুমি নেমো না। আর আমিও আরোহণ করবো না। কিছুক্ষণের জন্য আল্লাহর রাস্তার ধুলাবালি আমার পায়ে লাগলে ক্ষতি কি? অথচ দ্বীনের রাস্তায় চললে প্রতি কদমে সাত শত নেকী হাসিল হয় এবং জান্নাতের পথে সাত শত দরজা বৃদ্ধি পায় এবং তার আমলনামা থেকে সাত শত গুনাহ মুছে ফেলা হয়। [প্রমাণঃ কানযুল উম্মাল, ৫:৩১৪/ আবু দাউদ শরীফ, ১:৩৩৮/ দূররে মানসুর, ২:২১৫/ ইবনে মাজাহ, ২:১১৮/ খাইরুল ফাতাওয়া ১:৩৭১-৩৭২]

প্রশ্ন-৫: তাবলীগী জামা'আতের লোকেরা অনেক সময় বলেন, দ্বীনের দা' ওয়াত দিতে গিয়ে কারো দরজায় কিছু সময় অপেক্ষা করা, কদরের রাত্রে বাইতুল্লায় গিয়ে হাজরে আসওয়াদ সম্মুখে রেখে ইবাদত করার চেয়েও উত্তম । তাদের এ কথা কি ঠিক?

উত্তর: হ্যাঁ একথা হাদীস শরীফে স্পষ্ট উল্লেখ আছে। হযরত আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন আল্লাহর রাস্তায় কিছু সময় খাড়া হওয়া অর্থাৎ দ্বীনের দাওয়াত দেওয়া কদরের রাত্রে বাইতুল্লাহ শরীফে হাজরে আসওয়াদের সামনে দাঁড়িয়ে ইবাদত করার থেকেও উত্তম। এ রিওয়ায়াত বাইহাকী শরীফে ও ইবনে হিব্বান শরীফে বর্ণিত আছে। [প্রমাণঃ কানযুল উম্মাল, ৪ : ২৮৪/ আত-তারগীব, ২ : ৩৪৬ / দুররে মানসুর, ২ : ১১৫]

প্রশ্ন-৬: তাবলীগী জামা’আতের ভাইয়েরা বলে থাকেন-যে, দাওয়াত দেয়ার উদ্দেশ্যে বের হয়ে প্রথম কদম ফেলে দ্বিতীয় কদম ফেলবার পূর্বেই তার জীবনের সকল গুনাহ মাফ হয়ে যায় । এ কথাটির সত্যতা কতটুকু?

উত্তর: এ কথাটি সরাসরি এভাবে নয়; বরং হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, “যে ব্যক্তি দ্বীন-ইসলাম তলব করবে, তার পিছনের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।

(মিশকাত শরীফ,হাঃনং-২৬৪৮,দারিমী হাঃনং-৫৬১) এছাড়াও যখন কোন মুসলমান দ্বীনকে সামনে নিয়ে বের হয়, তখনই তার সগীরা গুনাহ মাফ হয়ে যায় । অতঃপর যখন সে জীবনের কবীরা গুনাহসমূহ থেকে তওবা করে, তখন সকল কবীরা গুনাহসূহ মাফ হয়ে যায় । এভাবে তার জীবনের সকল গুনাহ মাফ হতে পারে।

প্রশ্ন-৭: তাবলীগ জামা‘আত কি হক? যদি হক হয়ে থাকে তাহলে কিছু সংখ্যক আলেম এর বিরোধিতা করেন কেন?

উত্তর: নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চিন্তা ধারা এই ছিল যে, প্রত্যেকটি মানুষের সম্পর্ক আল্লাহ তা’আলার সাথে হয়ে যাক এবং প্রত্যেকটি লোক জাহান্নাম থেকে বেঁচে জান্নাতবাসী হয়ে যাক। এভাবে সমস্ত দুনিয়াতে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাক। প্রচলিত তাবলীগী জামা’আত (যার মধ্যে সকল হক্কানী উলামায়ে কিরাম শামিল আছেন) যেহেতু এ ফিকির নিয়ে নিজের খরচে

মানুষের ময়দানে কাজ করে যাচ্ছে। সুতরাং এটাকে না হক বলা নিজের মূর্খতা জাহির করা ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে নগণ্য সংখ্যক আলেম যারা এ বিরোধিতা করেন, তারা সম্ভবতঃ তাবলীগী জামা'আতকে গভীরভাবে দেখার সুযোগ পাননি বা কিছু ইলমবিহীন তাবলীগী ভাইদের আচার-ব্যবহারে বা কোন বিষয়ে বাড়াবাড়ির কারণে উল্টা বুঝে বিভিন্ন রকম মন্তব্য করে থাকবেন। তবে উভয়টা তাদেরই দুর্বলতা। কারণ, কোন ব্যাপারে যখন তারা মুখ খুলতে চান, তখন তাদেরই উচিৎ-নিজের পাণ্ডিত্যের উপর নির্ভর না করে জিনিসটি ভালভাবে যাচাই করা। প্রয়োজনে নিজের বড় ও প্রবীণগণের স্মরণাপন্ন হয়ে বা উক্ত জামা'আতের সাথে কিছু সময় দিয়ে মেহনতটা বুঝতে চেষ্টা করা। শুধু নিজের পুঁজি দিয়ে সকল ক্ষেত্রে সবকিছু সমাধান দেয়া সম্ভব না হওয়াটাই স্বাভাবিক। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে "তোমাদেরকে যে ইলম ও জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তা খুবই নগণ্য। [সূরা বনী ইসরাইল, ৮৫]

দ্বিতীয় ব্যাপারে কথা হচ্ছে-তাবলীগের বে-ইলম সাথীদের সাথে কোন কথা বা কাজকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করা আলেমের শান নয়।

তিনি তো দেখবেন ঐ সকল বুজুর্গগণের কাজ বা কথাকে যারা এ কাজকে প্রচলিত পদ্ধতিতে চালু করেছেন। তারা কেমন ধরনের বুজুর্গ ছিলেন।তাদের ইলমের উপর তাদের সমসাময়িক ওলামাগণ নির্ভর করতেন কি না? তারা বিশ্বস্ত ছিলেন কি না? তাদের বয়ান, তাকরীর ও মালফুযাতে কোন আপত্তিকর কথা আছে কি না? এসব দেখে একজন আলেম সিদ্ধান্তে পৌছাবেন।

তাবলীগী জামা'আতের কোন আমীর ও জিম্মাদার মূলনীতির খিলাফ করলে, তার ভুলের সমালোচনা না করে বরং তা শুধরিয়ে দিবেন। এটাই উলামায়ে কিরামের দায়িত্ব। কুরআন এ নির্দেশই দেয় যে, "তোমরা নেক কাজ ও তাকওয়ার ব্যাপারে একে অপরের সহযোগিতা কর।' (সুরাহ মায়িদা-২)

প্রশ্ন-৮: অনেক এলাকায় দেখা যায় যে, মহিলারা সাপ্তাহিকভাবে মানুষের বাড়ী বাড়ী গিয়ে তাবলীগ করে, তা'লীম করে, কেউ কেউ বলে যে, মহিলাদের এভাবে তাবলীগ করা, তা'লীম করা জায়িয নয়। এ ব্যাপারে শরীয়তের সঠিক ফায়সালা জানতে চাই?

উত্তর: পুরুষের ন্যায় মহিলাদেরও ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা ফরজ। যেমন: হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, ইলমে দ্বীন অর্জন করা প্রত্যেক নর-নারীর উপর ফরজ । (মিশকাত শরীফ,৩৪) এখন কথা হলো যে- এ ইলম অর্জনের জন্য তা' লীম এবং মু'আল্লিম তথা শিক্ষক প্রয়োজন। শিক্ষক ও তা'লীম ব্যতীত কখনো প্রকৃত ইলম অর্জন করা সম্ভব নয়। কেননা বুখারী শরীফের এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, প্রকৃত ইলম ঐটা যা তা'লীম এবং শিক্ষকের মাধ্যমে অর্জিত হয়।(বুখারী শরীফ ১ : ১৬)

এমনিভাবে সূরা আর-রাহমানের শুরুতে আল্লাহ তা'আলা নিজে বান্দাদের জন্য মু'আল্লিম হওয়া ব্যক্ত করেছেন :"করুণাময় আল্লাহ শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন"। (সূরাহ আর-রাহমান, ১-২)

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: "আমাকে মু'আল্লিম তথা শিক্ষকরূপে প্রেরণ করা হয়েছে"। (ইবনে মাজাহ শরীফ, ১:২১)

এ হাদীসদ্বয় ও আয়াত দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, দ্বীনি ইলম অর্জনের জন্য তা'লীম ও শিক্ষক জরুরী। এতে পুরুষ-মহিলা উভয় শ্রেণীই অন্তর্ভুক্ত। কারণ, আয়াত ও হাদীস শরীফে শুধু পুরুষদের কথা নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। অতএব, ইলমে দ্বীন অর্জনের জন্য তা'লীম ও শিক্ষক এবং পুরুষ ও মহিলা উভয় শ্রেণীর জন্যই আবশ্যক। তাছাড়া ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল স্বীয় লিখিত বিশুদ্ধ হাদীসগ্রন্থ বুখারী শরীফে মহিলাদের তা'লীমের ব্যাপারে স্বতন্ত্র অধ্যায় রচনা করে একথা

স্পষ্ট ভাবে প্রমাণ করেছেন যে, পুরুষদের ন্যায় মহিলাদেরও দ্বীনী তা'লীম একান্ত জরুরী।

উক্ত অধ্যায়ে যে হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে, "তা হলোঃ একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদের নামায আদায় করতঃ অনুভব করলেন যে, মহিলাগণ বয়ান শুনতে পায়নি, তাই তিনি মহিলাদের মজমার দিকে একটু অগ্রসর হলেন। সাথে হযরত বিলাল রা. ও ছিলেন। অতঃপর তাদেরকে তথায় নসীহত করে দ্বীন শিক্ষা দিলেন এবং সদকা প্রদানের প্রতি উদ্বুদ্ধ করলেন। তখন মহিলাগণ স্বীয় কানের অলংকার, আংটি দান করে দিলেন, আর হযরত বিলাল রা. সেগুলো কাপড় পেতে গ্রহণ করলেন। (বুখারী শরীফ, ১:২০)

উক্ত আলোচনার দ্বারা একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল যে, মহিলাদের ভিন্নভাবে তা'লীম গ্রহণ শরীয়ত স্বীকৃত ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই তাদের এরূপ তা'লীম ব্যাপকভাবে হওয়া প্রয়োজন। আর এ তালীম নিজ ঘরে কোন মহিলা বা মাহরাম পুরুষ

কর্তৃক হওয়া উচিৎ হলেও অনেক ক্ষেত্রে এমনটি সহজে হয় না বিধায় সাপ্তাহিক তাবলীগী তা'লীমের ব্যবস্থা হওয়া জায়িয আছে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, কোন ভাবেই যেন পর্দা ও শরীয়তের অন্যান্য হুকুম লঙ্ঘন না হয় এবং যিনি তা'লীম দিবেন, তাকে অবশ্যই সহীহ আক্বীদাহ ওয়ালা বিজ্ঞ ব্যক্তি হতে হবে। যেন দ্বীনের তা'লীমের নামে বে-পর্দা তথা শরীয়ত পরিপন্থী বা ঈমান-আক্বীদার ক্ষতির কারণ না হয় ।

বলতে কি, যারা মহিলাদের ভিন্নভাবে দ্বীনী তা'লীমকে নাজায়িয বলেন এবং "মহিলাদের তা'লীম নেই" এরূপ কথা বলেন, তারা মারাত্মক ভুলের মধ্যে ডুবে আছে। তাই তাদের এহেন কথা থেকে তাওবা করে নেয়া উচিত। [প্রমাণ: সূরাহ আর-রাহমান, আয়াত, ১-২, বুখারী শরীফ ১:১৬,২০, কানযুল উম্মাল ১০ :৩০]

প্রশ্ন-৯: তাবলীগ জামা'আতের লোকেরা বলে থাকে, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় গিয়ে এক টাকা খরচ করে, তাকে সাত লক্ষ টাকা ব্যয় করার

সওয়াব দেয়া হয়। একটি নেক আমল করলে উনপঞ্চাশ কোটি নেক আমলের সওয়াব দেয়া হয় এখন প্রশ্ন হল, আল্লাহর রাস্তা বলতে কি শুধু তাবলীগ জামা'আতকেই বুঝানো হয়েছে? নাকি আল্লাহর অন্যান্য রাস্তা এর অন্তর্ভুক্ত? যেমন- মাদ্রাসা বা খানকা। মাদ্রাসায় পড়াবস্থায় এক টাকা খরচ করলে বা একটি নেক আমল করলে ঐ পরিমাণ সওয়াব পাওয়া যাবে কি? যদি মাদ্রাসায় পড়লে অনুরূপ সওয়াব না পাওয়া যায়, তাহলে মাদ্রাসায় পড়া উত্তম, না তাবলীগে সময় লাগানো উত্তম?

উত্তরঃ হ্যাঁ, আল্লাহর রাস্তায় এক টাকা খরচ করলে সাত লক্ষ টাকা দান করার ছাওয়াব পাওয়া যায় এবং একটি নেক আমল করলে উনপঞ্চাশ কোটিগুণ ছাওয়াব পাওয়া যায় তাও ঠিক। কিন্তু এই ফজীলত শুধু তাবলীগের সাথে খাস মনে করা বা তাবলীগের রাস্তাকে এর একমাত্র রাস্তা মনে করা বড় ধরনের মূর্খতা বা কম ইলমীর পরিচায়ক।

কারণ, আল্লাহর রাস্তা বলতে কুরআন ও হাদীসে প্রথমত: জিহাদ তথা কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে বুঝানো হয়েছে। তাই কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় আল্লাহর রাস্তার প্রথম মিসদাক বা উদ্দেশ্য হলো জিহাদের রাস্তা। তবে দ্বীনের স্থায়িত্ব ও প্রসারের আরো যত রাস্তা ও মাধ্যম আছে, যথা- মাদ্রাসা, তাবলীগ, খানকাহ, ওয়াজ-নসীহত, দ্বীনী কিতাব রচনা করা ইত্যাদি-এসবও পরোক্ষভাবে এর অন্তর্ভুক্ত হবে। যেহেতু মূল উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন-১০: অনেকে তাবলীগ জামা'আতকে তিরস্কারের ছলে কটাক্ষ করে বলে যে, ১০০ বৎসর পূর্বে তাবলীগ ছিল না, ১০০ বৎসর পরে তাবলীগ এসেছে সুতরাং এটা নতুন আবিষ্কার এবং বিদ'আত। তাদের এসব কথার শরয়ী ফয়সালা কি?

উত্তরঃ বর্তমান তাবলীগী জামা'আত দ্বারা বিশ্বের আনাচে-কানাচে দ্বীনের যথেষ্ট কাজ হচ্ছে। আর এর নিয়ম-নীতিমালা শরীয়তের কোন বিধানের

পরিপন্থী নয়। বরং তা বিজ্ঞ আলেমগণের কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিতে পরিচালিত।সুতরাং তাবলীগ জামা'আতের নিয়ম নীতি ও তরজ-তরীকা সম্পূর্ণ সঠিক,এটাকে বিদ'আত বলা মূর্খতা।

উল্লেখ্য যে,প্রচলিত তাবলীগী জামা'আতের উমুমী গাশত, খুসূসী গাশত, বিভিন্ন এলাকায় জামা'আত পাঠানো, মসজিদের তা'লীম করা ইত্যাদি এসবের প্রত্যেকটির নমুনা-মিছাল স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত।সুতরাং যারা তাবলীগ জামা'আতের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করে এবং কটাক্ষ করে কথা বলে তারা এ মেহনত সম্পর্কে সহীহ ধারণা রাখে না এবং তারা এ মেহনতকে নিকট থেকে দেখার সুযোগ পায়নি বলে মনে হয় কোন জিনিষকে ভালভাবে না জেনে মন্তব্য করা ঠিক নয়। ভালকাজ করার তৌফিক না হলেও ক্ষতির কাজ না করা চাই। বিশেষ করে দ্বীনের ক্ষতি করা আরো বেশী মারাত্মক। তারা যদি এসব তর্ক-বিতর্ক ছেড়ে পরীক্ষামুলক এ মেহনতে শরীক হয়ে কিছু দিন সময় লাগায় তাহলে আশা করা যায়

যে, তাদের ভুল ভাঙবে, দ্বিধা দ্বন্দ্বের অবসান ঘটবে। এ মেহনতের সহায়তায় জান-মাল কুরবানী করতে প্রস্তুত হবে।

তাবলীগী জামা'আত এক শত বৎসর যাবৎ চালু হয়েছে- এ ব্যাপারে বলা যেতে পারে যে- এটি কোন আপত্তির কিছু নয়। প্রচলিত দ্বীনী মাদ্রাসা এবং তার নিয়ম-পদ্ধতি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যামানায় ছিল না। তাই বলে কি এটা বিদ'আত বা নাজায়িয হবে? কখনও নয়। কারণ, মূল তা'লীম তো হুজুর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যামানায় ছিল।তেমনিভাবে দ্বীনের দাওয়াতের কাজও নি:সন্দেহে নবী ﷺ- এর যমানায় চালু ছিল। এ সমস্ত কটুক্তিকারীদের উচিৎ,আম্বিয়া আ. ও সাহাবায়ে কিরামের জীবনী পড়া।তাহলে তারা জানতে পারবে তারা কি ঘরে বসেই দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন, নাকি মানুষের দুয়ারে গিয়ে দ্বীনের দাওয়াত পৌছিয়েছেন? [প্রমাণ ফাতওয়া মাহমুদিয়া,১:৪১৮-৪৬৫৫]

প্রশ্নঃ -১১: তাবলীগ করা উম্মতে মুহাম্মাদীর উপর কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ?

উত্তরঃ সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ আখেরী উম্মতের উপর গুরুত্বপুর্ণ দায়িত্ব। বরং এই দায়িত্ব পালনের ভিত্তিতে এ উম্মতকে সর্বোত্তম উম্মত বলে কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে। নিজের পরিবার পরিজন তথা যতটুকুর মধ্যে প্রত্যেকের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব আছে, ততটুকুর মধ্যে এই দায়িত্ব ফরজে আইন ও একান্ত কর্তব্য। সমগ্র মুসলিম জাতীর সংশোধনের জন্য ও বিশ্বের কোটি কোটি অমুসলিমদেরকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেয়ার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ লোক ময়দানে সহীহ ভাবে মেহনত করা ফরজে কেফায়া। তবে তাবলীগ জামা'আতের সাথে জামা'আতের নাম করা জরুরী নয়। এ নাম তো হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ. দেননি। অবশ্য তার সময় থেকে লোকদের মুখে মুখে এ নাম চলে আসছে। মাওলানা ইলিয়াস রহ. এর যামানার আগে বিভিন্ন নমে দ্বীনের কাজ চালু

ছিল। এখনও তাবলীগ জামা'আত ছাড়াও বিভিন্ন নামে সহীহ মেহনত চালু আছে।

মোদ্দা কথা, সৎ কাজের আদেশ অসৎ কাজের নিষেধ এটাই হলো মূল কাজ। এখন তা যে নামেই করা হোক না কেন, তবে তাবলীগের নামে যে কাজ চলছে, তা নিঃসন্দেহে সহীহ মেহনত এবং এর দ্বারা হাজার হাজার লোক সঠিক পথের দিশা পাচ্ছে। এ জন্য তাবলীগী জামা'আতকে সমগ্র বিশ্বের হক্বানী উলামাগণ সহীহ মেহনত বলে আখ্যায়িত করেছেন। বর্তমান যমানার সাধারণ মুসলমানদের দ্বীন ঈমান সহীহ করার জন্য তাবলীগী মেহনত সবচেয়ে সহজ পদ্বতি। সুতরাং এর সমালোচনা করা নির্বুদ্ধিতা ও গোমরাহী ছাড়া আর কিছু নয়। যিনি ইসলাম ও তাবলীগী জামা'আত সম্বন্ধে কোন স্বচ্ছ ধারণা রাখেন না, তিনি বিষোদগার করেন। সময় লাগালে তিনি অবশ্যই এ কথা থেকে তওবা করে নিবেন বলে মনে করি।

সমাপ্ত

মওদূদী মতবাদ

মুফতী মনসূরুল হক

www.islamijindegi.com

কুরআন হাদীসের আলোকে মওদূদী মতবাদ

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্টা
মওদূদী সাহেবের ব্যাপারে কতিপয় প্রশ্ন	২
১নং প্রশ্নের জবাবঃ মওদূদী সাহেবের চিন্তাধারা নিয়মিতই ভ্রান্ত	৩
কুরআন কী চার বুনিয়াদী ইস্তেলাহেঁ-নামক বই	৫
তানকীহাত নামক বই	৭
দ্বীন সম্পর্কে মওদূদী সাহেবের কয়েকটি বক্তব্য	৮
সার সংক্ষেপঃ	৯
মওদূদী সাহেবের একটি মৌলিক থিওরি	৯
আম্বিয়ায়ে কিরামদের সম্পূর্ণ নিষ্পাপ বলতে নারাজ	১০
সাহাবায়ে কিরামকে সত্যের মাপকাঠি না মানা	১০
ইমামদের তাকলীদ	১২
জগৎবিখ্যাত কয়েকজন আলেমের অভিমত	১৩
আকাবিরে দেওবন্দের সর্বসম্মত ফাতাওয়া	১৪
মুফতীয়ে আযম মুফতী মুহাম্মদ শফী রহ. এর ফাতাওয়া	১৫
হযরত মাওলানা যাফর আহমাদ উসমানীর অভিমত	১৫
শাইখুল হাদীস আব্দুল হক্ব রহ. এর অভিমত	১৬
২নং প্রশ্নের জবাবঃ মওদূদী সাহেবের লিখিত বই-পুস্তক পড়া	১৭
শাইখুল ইসলাম হযরত হুসাইন আহমদ মাদানী রহ. এর অভিমত	১৮
আল্লামা ইউসুফ বিনুরই রহ. এর অভিমত	১৮
মুফতী মাহমূদ হাসান গাংগুহী রহ. এর ফাতাওয়া	১৯
৩নং প্রশ্নের জবাবঃ মওদূদী পন্থী ইমামের পিছনে নামায আদায়	২১

باسمه تعالي

মওদূদী সাহেবের ব্যাপারে কতিপয় প্রশ্নের সমাধান

প্রশ্ন: একঃ মওদূদী সাহেবের চিন্তাধারাকে উলামায়ে কিরাম নিয়মিতই ভ্রান্ত ও গোমরাহ বলে থাকেন, এর আসল কারণ কি?

সঠিক ইসলামী চিন্তাধারার সাথে মওদূদী চিন্তাধারার মৌলিক সংঘাতগুলো কি কি? নির্ভরযোগ্য প্রমাণসহ জানানোর আবেদন রইল।

প্রশ্ন দুইঃ মওদূদী সাহেবের লিখিত বই-পুস্তক তথা তাফহীমুল কুরআন, তাফহীমাত, তানকীহাত, খুতবাত, রাসায়েল মাসায়েল, তাজদীদ ও ইহ্য়ায়ে দ্বীন, খেলাফত ও মুলুকিয়াত, ইসলামী রিয়াসাত, কুরআন কী চার বুনিয়াদী ইস্তেলাহেঁ ইত্যাদি পড়া যাবে কি না?

প্রশ্ন তিনঃ মওদূদী পন্থী ইমামের পিছনে নামায আদায় করলে নামায সহীহ হবে কি-না? এবং তাদেরকে ইমাম বা মুয়াজ্জিন হিসাবে নিয়োগ দেয়া যাবে কি-না?

১নং প্রশ্নের জবাবঃ মওদূদী সাহেবের চিন্তাধারা নিয়মিতই ভ্রান্তঃ

মাসিক তরজুমানুল কুরআন ১৩৫৫ হিজরী রবিউল আউয়াল সংখ্যায় জনাব মওদূদী সাহেব নিজের সম্পর্কে লিখেনঃ

مجھے گروہ علماء میں شامل ہونے کا شرف حاصل نہیں ہے، میں ایک بیچ کی راس کا آدمی ہوں جس نے جدید اور قدیم دونوں طریقہ ہائے ذعلیم سے کچہ کچہ حصہ پایاہے، اور دونو کوچوں کو چل پہر کر دیکہا ہے۔

অর্থঃ উলামা সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়নি। আমি মধ্য বিন্দুর লোক, যে নতুন-পুরাতন উভয় শিক্ষাব্যবস্থার কিছু কিছু অংশ পেয়েছে এবং উভয় গলিতেই হেঁটে চলে দেখেছে।

অপরদিকে "মাওলানা মওদূদী" নামক বইতে জনাব আব্বাস আলী খান লিখেনঃ উনিশ শ' চৌদ্দ খৃঃ এ বালক মওদুদী মৌলভী (তথা তার বর্ণনা মতে) মেট্রিক পরীক্ষা দেন ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে (তার পিতা) আওরঙ্গবাদ থেকে হায়দ্রাবাদ গমন করেন এবং সেখানে দারুল উলূমে (তথা ডিগ্রী কলেজে) পুত্র মওদূদীকে ভর্তি করে দেন কিন্তু ছ'মাস অতীত না হতেই ভূপাল থেকে দুঃসংবাদ এলো যে, পিতা মৃত্যু শয্যায় শায়িত। এ সময় থেকেই বালক মওদূদীকে জীবিকা অন্বেষণের উপায় অবলম্বন করতে হয়। (মাওলানা মওদূদী পৃঃ ৩৬)

মাসিক তরজুমানুল কুরআন রবিউল আউয়াল সংখ্যায় উদ্ধৃত নিজ ভাষ্য ও "মাওলানা মওদূদী" নামক বইতে উদ্ধৃত জামা'আতের সাবেক ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খানের উক্ত বর্ণনা অনুযায়ী বুঝা গেল যে জনাব মওদূদী সাহেব দ্বীনী ও দুনিয়াবী শিক্ষার কোনটিতেই পরিপূর্ণ শিক্ষিত নন।

একদিকে যেমন নিয়মিত কোন শিক্ষা গ্রহণ করে আলেম হওয়ার সুযোগ তিনি পাননি অপর দিকে কোন কামেল ও দক্ষ আলিমের দিক নির্দেশনার অধীনে থেকে দ্বীনী কাজ করার প্রয়োজনীয়তাও তিনি স্বীকার করেননি। বরং নিজ মেধার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ও চরম মুক্ত স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। উম্মতের রাহবার আইম্মায়ে মাযহাব থেকে শুরু করে আইম্মায়ে হাদীস ও যামানার মুজাদ্দিদগণ সহ অতীতের প্রায় সকল দক্ষ উলামায়ে কিরাম তাঁর নিকটে ছিল অতি তুচ্ছ। যা তার বিভিন্ন লেখনীর মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে।

এই ধরনের লোক ইসলামকে নিয়ে গবেষণা করলে পরিণতি যা হওয়ার তাই ঘটেছে। বিষয়টি মওদূদী সাহেব পর্যন্ত সীমিত থাকলে উলামায়ে কিরামের তেমন বিচলিত হওয়ার কিছু ছিল না, কিন্তু যখন তিনি নিজ গবেষণার ফসলগুলো জামায়াতে ইসলাম নামে একটি দল গঠনের মাধ্যমে উম্মতের মাঝে ছড়ানোর প্রয়াস পেলেন তখন শরয়ী মূলনীতির আলোকে তার চিন্তাধারাকে যাচাই বাছাই করে উম্মতের সামনে পেশ করার জরুরী দায়িত্ব দক্ষ ও পরিপক্ক, মুত্তাকী ও সচেতন উলামাদের যিম্মায় বর্তায়।

উপমহাদেশের খ্যাতনামা উলামাদের প্রায় সকলেই মওদূদী সাহেবের চিন্তা ধারায় যে সব মারাত্মক ভুল ভ্রান্তি স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে প্রথমে তা মওদূদী সাহেব ও তার প্রতিষ্ঠিত জামায়াতে ইসলামী নেতৃবর্গকে বিভিন্ন ভাবে অবহিত করে সেগুলো প্রকাশ্যে প্রত্যাহার করতে বলেছেন। কিন্তু যখন দেখা গেল মওদূদী সাহেব বা জামায়াতের নেতৃবর্গ তা প্রত্যাহার করার পরিবর্তে বাড়তি কিছু বিভ্রান্তি যোগ করে ক্রমাগত তা প্রতিষ্ঠিত করতেই চেষ্টা করেছেন। তখন মুসলিম জন সাধারণকে গোমরাহী থেকে বাঁচানোর স্বার্থে উলামায়ে কেরাম মওদূদী সাহেবের মৌলিক ভুলগুলো সুদৃঢ় প্রমাণসহ মুসলিম উম্মাহর সামনে তুলে ধরতে বাধ্য হয়েছেন, এমনকি মওদূদী সাহেবের প্রাথমিক পর্যায়ের তুলনামূলক ভ্রান্তিমুক্ত রচনা-প্রবন্ধ ইত্যাদি দেখে যেসব বিদগ্ধ উলামায়েকেরাম ও ইসলামী বুদ্ধিজীবীগণ জামাআতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠালগ্নে জনাব মওদূদী সাহেবের সঙ্গে এমনকি জামায়াতের অতি গুরুত্বপূর্ণ পদ সমূহে অধিষ্ঠিত হয়ে মওদূদী সাহেবকে খুব কাছে থেকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। অতঃপর মওদূদী সাহেবকে ক্রমশঃ ভুলপথে চলতে দেখে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁরাও একে একে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে জামায়াত হতে পৃথক হয়ে গেছেন। উদাহরণতঃ জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা নায়েবে আমীর মাওলানা মনজুর নো'মানী, সেক্রেটারী জনাব কামরুদ্দীন (এম,এ) বেনারসী। মজলিসে শূরার অন্যতম সদস্য হাকীম আঃ রহীম আশরাফ ও মাওলানা আমীন আহসান এসলাহী বিশ্ব বরেণ্য দাঈয়ে ইসলাম মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী। জামায়াতের অন্যতম রুকন ও মওদূদী সাহেবের জন্যে নিবেদিত প্রাণ ডক্টর এসরার আহমাদ সাহেব প্রমূখ সহ প্রথম সারীর প্রায় আরো সত্তর জন নেতৃবর্গ।

www.islamijindegi.com

দ্রঃ মাওলানা মনযুর নো'মানী লিখিত "মওদূদী সাহেবের সাথে আমার সাহচর্যের ইতিবৃত্ত।"

যুগসেরা মুহাক্কিক উলামায়েকিরাম সঠিক বরাতের ভিত্তিতে মওদূদী সাহেবের গোমরাহ চিন্তাধারাগুলোর তাত্ত্বিক পর্যালোচনা করে অনেক বই-পুস্তক ও প্রবন্ধ লিখেছেন। তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কয়েকটির নাম যথাক্রমে-১। মাওলানা মনজুর নো'মানীর "মাওলানা মওদূদী ছে মেরী রেফাক্বতকী ছার গুযাশ্‌ত" অনুবাদ "মাওলানা মওদূদীর সাথে আমার সাহচর্যের ইতিবৃত্ত"। ২। শাইখুল হাদীস যাকারিয়া রহ.-এর "ফিতনায়ে মওদূদীয়্যাত"। ৩। বিশ্ববরেণ্য আলেম ও ইসলামী দার্শনিক জাস্টিস মুফতী, মাওলানা মুহাম্মাদ তক্বী উসমানীর "হযরত মুআ'বিয়া আওর তারিখী হাক্কায়েক" বাংলা অনুবাদ "ইতিহাসের কাঠগড়ায় হযরত মুআ'বিয়া" ৪। মুজাহিদে আযম আল্লামা শামছুল হক ফরীদপুরী রহ.-এর "ভুল সংশোধন" ও হযরত মাওলানা ইউসুফ বিন্নূরী রহ-এর

الاسذاذ المودودي وشيئ من حياذه وافكاره ইত্যাদি, বিস্তারিত দেখার প্রয়োজন বোধ করলে উপরোক্ত বাইগুলো দেখুন।

(১) মওদূদী সাহেব "কুরআন কী চার বুনিয়াদী ইস্তেলাহেঁ" নামক পুস্তকে লিখেন:

الہ، رب، دین، اور عبادذ یہ چار لفظ قران کی اصطلاحی زبان میں بنیادی اہمیذ رکھذے ہیں- عرب مین جب قران پیش کیا اس وقذ ہر شخص جانذا ذھا کہ الہ کے کیا معنی ہیں اور رب کسے کہذے ہیں.....لیکن بعد کی صدیوں میں رفذہ رفذہ ان سب کے وہ اصل معنی جو نزول قران کےوقذ سمجھے جاذے ذھے بدلذے چلے گئے.....محض ان چار بنیادی اصطلاحوں کے مفہوم پر پردہ پڑ جانے کی بدولذ قران کی ذین چوذھائی سے زیادہ ذعلیم بلکہ اسکی حقیقی روح نگاہوں سےمسذور ہوگئی

অর্থঃ ইলাহ, রব দ্বীন ও ইবাদত এই চারটি শব্দ কুরআনের পরিভাষায় মৌলিক গুরুত্ব রাখে, আরবে যখন কুরআন নাযিল হয় এই শব্দগুলোর মর্ম সকলেই জানত, কিন্তু পরবর্তী শতাব্দিসমূহে ক্রমে ক্রমে কুরআন নাযিলের সময়কার অর্থ নিজ ব্যাপকতা হারিয়ে একেবারে সীমিত বরং অস্পষ্ট অর্থের জন্যে নির্দিষ্ট হয়ে যায়.....। আর বাস্তবে এই চারটি মৌলিক পরিভাষায় অর্থে আবরণ পড়ে যাওয়ার কুরআনের তিন চতুর্থাংশেরও বেশী শিক্ষা বরং মূল স্পীটই দৃষ্টির অগোচরে চলে যায়। পৃষ্ঠা ৮,৯১০

পর্যালোচনা: বাস্তবেই ইলাহ, বর, দ্বীন ইবাদত শব্দগুলো কুরআনের মৌলিক পরিভাষার অন্তর্ভুক্ত। কুরআনের অধিকাংশ বিষয় বস্তুর সাথেই শব্দগুলোর যে কোন ভাবে সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। শব্দগুলোর সহীহ মর্ম অস্পষ্ট হয়ে গেলে কুরআন বুঝা সম্ভব হবে না এবং তদনুযায়ী আমল করাও যাবে না। মওদূদী সাহেবের মতে সাহাবাদের

যামানা তথা ১ম শতাব্দীর পর হতে এগুলোর সঠিক মর্ম অদৃশ্য হয়ে গেছে, সাথে সাথে কুরআনের তিন চতুর্থাংশ শিক্ষা বরং মূল স্প্রীটই পর্দার অন্তরালে চলে গেছে।

অথচ কুরআন আল্লাহ তা'আলার সর্বশেষ কিতাব। পূর্ববতী সব আসমানী কিতাব এর দ্বারা রহিত হলেও পূর্ণাঙ্গ নাযিলের পর কিয়ামত অবধি ও কিতাব কোন অংশেও কখনো রহিত হবে না। কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের পরিপূর্ণ হিদায়াতের একমাত্র মাধ্যমে এ কুরআন। সকল যুগের সর্বজনের জন্যেই পথ প্রদর্শক এ কুরআন। কাজেই কিয়ামতের আগ পর্যন্ত এর শব্দাবলী হুবহু বিদ্যমান থাকা চাই, তেমনিভাবে সব সময়ের জন্যে এর মর্মার্থও থাকা চাই অবিকৃত ও সহজবোধ্য, সাথেই কুরআনের আমলী নমুনাও থাকতে হবে নাযিল হওয়া থেকে কিয়ামত পূর্ব পর্যন্ত একই সূত্রে গাঁথা।

শব্দ, অর্থ ও বাস্তব নমুনা কোন একটিও যদি অস্পষ্ট ও বিকৃত হয়ে যায় বা মাঝপথে তা পর্দার অন্তরালে চলে যায়। তাহলে পরবর্তীদের জন্যে এ কিতাব আর হিদায়াতের কাজ দিতে পারবে না। পক্ষান্তরে এ গুলোর যথাযথ সংরক্ষণ একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কারো পক্ষে সম্ভব নয় কাজেই আল্লাহ তা'আলা-ই এগুলোকে সংরক্ষণ করবেন এটাই স্বাভাবিক, তাই তো আল্লাহ তা'আলা নিজ কালামে পাকে অত্যন্ত জোরালো ভাবে ঘোষণা করেছেন- إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

অর্থঃ নিশ্চয়ই আমিই যিকর তথা এ কুরআন নাযিল করেছি, এবং নিশ্চয়ই আমিই তা সংরক্ষণ করবো। (সূরায়ে হিজর আয়াত-৯)

আর সংরক্ষণের আওতায় উপরোক্ত সবগুলো বিষয় শামিল থাকা জরুরী। তাইতো শ্রেষ্ঠ মুফাসসির আল্লামা আলুসী বাগদাদী "আমিই তা সংরক্ষণ করবো" এর তাফসীরে বলেন-

وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) اى من كل ما يقدح فيه كالذحريف والزيادة والنقصان .....وقال الحسن حفظه بقاء شريعذه الي يوم القيامة

অর্থঃ (এবং নিশ্চয় আমিই তা সংরক্ষণ করবো) তথা অর্থগত বিকৃতি, সংযোজন ও বিয়োজন জাতীয় সব ধরনের ত্রুটি হইতে ..... এবং হযরত হাসান বসরী বলেন কুরআনের সংরক্ষণের অর্থ কুরআনের শরীয়ত (আমল পদ্ধতি) কে কিয়ামত পর্যন্ত বাকি রাখা। (রুহুল মাআনী ১৪ পারা পৃঃ ২৪)

অপর এক আয়াতে ইরশাদ করেন-

لاَّ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ ۖ

অর্থঃ সম্মুখ কিংবা পশ্চাৎদিক হতে কোন বাতিল (বিকৃতি ও মিথ্যা) এই কিতাবে প্রবেশ করতে পারবে না।(সূরায়ে হা-মীম সিজদা আয়াত ৪২)

তেমনিভাবে আল্লাহর রাসূলও ঘোষণা করে গেছেন-

يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله الخ

অর্থঃ এই ইল্‌ম (কুরআন ও হাদীস)কে সঠিক ভাবে ধারণ করে যাবে পরবর্তী প্রত্যেক যুগের যোগ্য বান্দারা- যারা দ্বীনের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন কারীদের বিকৃতি, বাতিলদের বিভ্রান্তি ও অজ্ঞদের অপব্যাখ্যা হতে কুরআনও হাদীসের ইল্‌মকে মুক্ত রাখবে। (মিশকাত শরীফ ৩২ পৃঃ)

অপর এক হাদীসে ইরশাদ ফরমান-

لا ذزال من امذى امة قائمة بامرالله لايضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حذى يأذى امر الله وهم علي ذلك مذفق عليه

অর্থঃ আমার উম্মতের একটি দল সব সময়েই হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। কোন হেয় প্রতিপন্নকারী কিংবা বিরুদ্ধাচারী তাদেরকে হক হতে বিচ্যুত করতে পারবে না। (মিশকাত শরীফ ৫৮৩ পৃঃ)

উল্লেখিত আয়াতদ্বয় ও হাদীস দু'টির দ্বারা এ কথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, কুরআনে পাকের শব্দ, অর্থ ও আমল পদ্ধতি সর্বদা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক সংরক্ষিত ছিল, আছে ও থাকবে। সেই সূত্রে উম্মতের একটি দলকে আল্লাহ তা'আলা সর্বদা কুরআন হাদীসের সঠিকভাবে ধারণকারী ও হকের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখবেন।

কিন্তু উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসগুলোর সাথে মওদূদী সাহেবের বক্তব্য সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক। তাছাড়া অযৌক্তিকও বটে। কারণ প্রথম শতাব্দীর পর হতে কুরআনের মৌলিক পরিভাষা সহ তিনচতুর্থাংশ শিক্ষা বরং মূল স্পীটই লোকান্তরে চলে গেলে উক্ত কুরআনের সর্বকালীন ও সার্বজনীন পূর্ণ হিদায়াতের কিতাব হওয়ার কি অর্থ থাকে?

তাছাড়া ইলাহ রব এ শব্দগুলোর সাথে মানুষের ঈমানের সম্পর্ক। যদি ইলাহের অর্থই অস্পষ্ট থাকে বা বিকৃত থাকে তবে মানুষ لا اله الا الله পড়ে ঈমান আনবে কি করে? তেমনি ভাবে ১ম শতাব্দীর পর হতে এ শব্দ চতুষ্ঠয়ের অর্থ যদি ব্যাপক ভাবে মানুষ ভুলে বসে তাহলে তেরশত বছর পর মওদূদী সাহেবই বা এগুলোর সঠিক অর্থ উদঘাটন করে তাফসীর লিখে বসলেন কি ভাবে?

বস্তুত কুরআনের মৌলিক পরিভাষা সমূহের সম্পর্কে মওদূদী সাহেবের উক্ত বক্তব্য মেনে নিলে এবং সাহাবায়ে কিরামের যামানা হতে এ যাবত তাফসীরে কুরআনের বড় একটি ধারাকে অব্যাহত না ধরলে, কুরআন ও দ্বীন বিকৃতির দ্বারা একেবারেই উন্মুক্ত হয়ে যায়। কারণ যে কেউ পূর্ববর্তী তাফসীর সমূহকে ভুল আখ্যা দিয়ে নিজে মনগড়া একটি তাফসীর করে সেটাকেই সঠিক বলতে সুযোগ পাবে; তখন তার ভুল ব্যাখ্যাকে ভুল বলার দলীল কোথায় পাওয়া যাবে ?

(২) মওদূদী সাহেব তানকীহাত নামক বইয়ে লিখেন

قران اور سنذ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ذعلی سب پر مقدم مگر ذفسیر وحدیث کے پرانے ذخیروں سے نہیں .....اسلامی قانون کی ذعلیم بھی ضروری ہے مگر یہاں بھی پرانی کذابیں کام نہ دینگی-
অর্থঃ কুরআন, সুন্নাহর শিক্ষাই সবার উপরে। কিন্তু তার তাফসীর ও হাদীসের পুরাতন ভাণ্ডার হতে নয়। ইসলামী আইনের শিক্ষাও আবশ্যক, তবে এক্ষেত্রেও পূর্বের কিতাব সমূহ কাজে আসবে না। তানকীহাত - ১৭৫

অন্যত্র লিখেনঃ
قران کےلئےکسی ذفسیر کی حاجذ نہیں ایک اعلی درجہ کا پروفیسر کافی ہے-جس نے قران کا بنظر غور مطالعہ کیا ہو اور جو طرز جدید پر قران پڑھانے اور سمجھانے کی اھلیذ رکھذا ہو .....
অর্থঃ কুরআনের জন্যে কোন তাফসীরের প্রয়োজন নাই। একজন উঁচু মানের প্রফেসরই যথেষ্ট যে গভীর দৃষ্টিতে কুরআন অধ্যয়ন করেছে এবং নতুন পদ্ধতিতে কুরআন পড়ানোর ও বুঝানো যোগ্যতা রাখে। তান্কীহাত ২৯১

পর্যালোচনাঃ মওদূদী সাহেবের মতে কুরআন, সুন্নাহ ও ইসলামী আইন শিক্ষার জন্যে একদিকে যেমন তাফসীর ও হাদীসের পুরাতন ভাণ্ডারের প্রয়োজন নাই অপর দিকে এর জন্যে আলেম হওয়ার কোন জরুরী নয়, বরং গভীর দৃষ্টিতে অধ্যয়ন করলে এসবের জন্যে একজন প্রফেসরও যথেষ্ট।

অথচ সর্বজনবিদিত যে, কুরআনের প্রথম ব্যাখ্যাকার হলেন স্বয়ং রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আর তাঁর ব্যাখ্যার নামই হল হাদীস। রাসূলের হাদীসের আলোকে ও কুরআন নাযিলের প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে দ্বিতীয় ব্যাখ্যাকার হলেন জামাআতে সাহাবা, যে ব্যাখ্যার নাম হল আ-ছা-রে সাহাবা। হাদীস ও আছারে সাহাবার আলোকে কুরআনের তাফসীর ও ইসলামী আইনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে গেছেন, এ কাজের জন্যে প্রয়োজনীয় সকল জ্ঞানে সর্বোচ্চ পারদর্শী আইম্মায়ে কিরামগণ, যা নিশ্ছিদ্র সূত্র পরম্পরায় আজো উম্মতের নিকট হুবহু সংরক্ষিত। পরবর্তী বিদগ্ধ উলামাগণ সময় ও প্রেক্ষাপটভেদে সেই পুরাতন ভাণ্ডারেরই যুগপোযুগী বিশ্লেষণ করেছেন। গ্রহণযোগ্য বরাতের হাদীস ও আছারে সাহাবা এবং উৎসদ্বয়ের আলোকে কৃত তাফসীরের সাথে সাংঘর্ষিত কেনা তাফসীর যেমন তারা নিজেরা করেননি, তেমনি কেউ করে থাকলে তাকে বাতিল বলে বর্জন করেছেন। এটাই মূলতঃ সঠিক ও নিরাপদ রাস্তা, এ রাস্তায় কোন বিকল্প নাই। কারণ হাদীস ও আছারে সাহাবার ভাণ্ডার পুরাতন হয়ে গেছে। সেগুলোর আলোকে কৃত তাফসীরও পুরাতন। নতুন হয়ে আবির্ভূত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই, এখন যদি সে গুলো হতে বিমুখ হয়ে কোন তাফসীর, সুন্নাত বা আইন আবিষ্কার করা হয়। তাহলে সেটা হবে মনগড়া, যার পরিণতি নিশ্চিত গোমরাহী বিশ্বাস না হলে খুলে দেখুন গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী ও স্যার সৈয়দ-আহমাদ খানের তাফসীরের কিতাবগুলো।

এমন গোমরাহী হতে উম্মতকে বাঁচানোর জন্যেই আল্লাহর রাসূল অত্যন্ত স্পষ্ট ও কঠোর ভাষায় বলে গেছেনঃ من قال في القران برأيه فليذبوأ مقعده من النار

অর্থঃ যে ব্যক্তি কুরআনের মনগড়া ব্যাখ্যা করবে সে যেন নিজ ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নেয়। - তিরমিযী ২:১২৩ ও মিশকাত শরীফ ৩৫ পৃঃ

অপর হাদীসে ইরশাদ হচ্ছে - من قال في القران برأيه فاصاب فقد اخطأ

অর্থঃ যে ব্যক্তি কুরআনের মনগড়া ব্যাখ্যা করবে সে (ঘটনাক্রমে) সঠিক ব্যাখ্যা করলেও তা ভুল গণ্য হবে। তিরমিযী ২:১২৩ ও মিশকাত শরীফ ৩৫ পৃঃ

মোটকথা হাদীস ও আ-ছা-রে সাহাবার সেই পুরানো ভাণ্ডার বাদ দিয়ে মনগড়া তাফসীর গোমরাহীর মোক্ষম হাতিয়ার; যার কারণে এর পরিণতি জাহান্নাম এবং এমন তাফসীর সর্বাংশেই ভুল গণ্য হবে। হাদীসের আলোকে এমন তাফসীরের মোটেও অনুমতি নাই। এক্ষেত্রে মওদূদী সাহেবের পূর্বোক্ত দুইটি বক্তব্যই সরাসরি হাদীস পরিপন্থী।

তাছাড়া মওদূদী সাহেবের বক্তব্য পরস্পরে বিরোধীও বটে। কারণ কুরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা নামক পুস্তকের বক্তব্য অনুসারে সাহাবায়ে কিরামের পরবর্তী যুগে কুরআনের তিন চতুর্থাংশের শিক্ষায় পর্দা পড়ে গেছে অর্থাৎ তাঁর মতে আইম্মায়ে মুজতাহেদীন, মুফাচ্ছেরীন ও মুহাদ্দেসীনদের মত যুগশ্রেষ্ঠ মহা মনীষীগণের দ্বারাও কুরআনের এক চতুর্থাংশের বেশী সঠিক শিক্ষা উদঘাটন করা সম্ভব হয়নি। যদি তাই বাস্তব হয়ে থাকে তাহলে তেরশত বছর পর কি করে মওদূদী সাহেবের মত একজন অপূর্ণ শিক্ষিতের জন্যে তাফসীর ও কুরআনের শিক্ষা উদঘাটন এত সহজ হয়ে গেল ? কিভাবে তিনি একজন প্রফেসরের জন্যে তাফসীরের সনদবিতরণ করতে সক্ষম হন? তার আবার হাদীস ও পূর্বের তাফসীরের ভাণ্ডারকে বাদ দিয়ে।

সারকথা তান্‌কীহাতে উদ্ধৃত মওদুদী সাহেবের কথা দু'টি শরীয়াত ও বিবেক বিরোধী। স্বয়ং তারই অপর বক্তব্যের পরিপন্থী। অথচ তিনি তার তাফসীর গ্রন্থে তানকীহাতে উদ্ধৃত বক্তব্যকেই প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। যথাঃ মওদূদী সাহেব তাঁর তাফসীরের ভূমিকার পূর্বে "প্রসঙ্গ কথায়" লিখেছেন যে, আমি "তাফহীমুল কুরআনে" কুরআনের শব্দাবলীকে উর্দূর লেবাস পরানোর পরিবর্তে এই চেষ্টাই করেছি যে, কুরআনের বাক্য সমূহ পড়ে যে অর্থ আমার বুঝে এসেছে এবং উক্ত আয়াত সম্পর্কে আমার মনে যে প্রভাব পড়েছে যথা সাধ্য সঠিক ভাবে উহাকে নিজ ভাষায় ব্যক্ত করে দেই। (তাফহীমুল কুরআন উর্দূ পৃঃ ১০ ১ম খণ্ড)

কথাটির ব্যাপারে চিন্তা করে দেখুন! আয়াতের সম্পর্কে রাসূল কি বলেছেন, সাহাবাগণ কি বলেছেন, তাবেঈন, তাবে তাবেঈনগণ কি বলেছেন, এসব কিছু বাদ দিয়ে তাঁর মনে যে প্রভাব পড়েছে তা দিয়ে তিনি তাফসীর লিখে ফেললেন। এটা ভ্রান্তি না হলে মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে যারা খতমে নবুওয়াতকে অস্বীকার করেছে, যারা

আম্বিয়ায়ে কিরামের মু'জিযা সমূহকে অস্বীকার করেছে, তাদেরকে কেন ভ্রান্ত বলা হবে? হাদীস ও আছারে সাহাবা এবং পুরাতন তাফসীর ভাণ্ডার ছাড়া মওদূদী সাহেবের তাফসীর ও কাদিয়ানীর তাফসীরের মধ্যকার পার্থক্যটা কি দিয়ে নির্ণয় করা হবে?

(৩) দ্বীন সম্পর্কে মওদূদী সাহেবের কয়েকটি বক্তব্য

ক- اس تشریح سے یہ بات صاف ہوجاتاہے کہ دین در اصل حکومت کا نام ہے -شریعت اس حکومت کا قانون ہے

(দ্বীনের অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে একটি নাতিদীর্ঘ ভূমিকার পর তিনি বলেন উক্ত ব্যাখ্যার আলোকে এ কথা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, দ্বীন মূলতঃ রাষ্ট্রের নাম, শরীয়ত হল সে রাষ্ট্রের বিধান। খুতবাত ৩২০ পৃঃ

আরেকটি বক্তব্যঃ খ-

سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ اپ نے نماز روزوں کے ارکان اور ان کی ظاہری صورت ہی کو اصل عبادت سمجھ رکھا ہے اور آپ اس خیال خام میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ جس نے یہ ارکان پوری طرح ادا کر دیئے اس نے بس اللہ کی عبادت کردی۔

অর্থঃ সর্বাপেক্ষা বড় ভুল এই যে, আপনি নামায রোযার আরকান ও বাহ্যিক আকৃতিকেই আসল ইবাদত মনে করেছেন।এবং আপনি এই খাম খেয়ালীপনায় লিপ্ত যে-যে ব্যক্তি এই আরকান সমূহকে পূর্ণরূপে আদায় করলে সে আল্লার ইবাদত করে নিলো। খুত্বাত ১৯২পৃঃ

গ অপর একটি বক্তব্যঃ

اسلام کا مقصد حقیقی مختصر الفاظ میں ذو صرف اتنا کہ دیناہی کافی ہے کہ وہ مقصد انسان پر سے انسان کی حکومت کو مٹا کر خدائے واحد کی حکومت قائم کرنا ہے اور اس مقصد کیلئے سردھڑی کی بازی لگا دینے اور جان ذوڑ کوشش کرنے کا نام جہاد ہے اور نماز، روزہ، حج، زکوۃ سب اسی کام کی ذیاری کی لیئے ہیں.....عباداذ ایک ذربیذی کورس ہیں،

نماز روزہ اور یہ زکوۃ اور حج در اصل اسی ذیاری اور ذربیذ کےلئے ہیں-

অর্থঃ ইসলামের মূল উদ্দেশ্য সংক্ষিপ্ত কথায় মানুষের উপর মানুষের শাসন মিটিয়ে এক খোদার শাসন কায়েম করা। এর জন্যে মস্তক-মেরুদণ্ডের বাজি লাগিয়ে আপ্রাণ চেষ্টার নাম জিহাদ। নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত এসব সে উদ্দেশ্যেরই প্রস্তুতির জন্যে ..... ইবাদাত একটি ট্রেনিং কোর্স। নামায, রোযা, যাকাত ও হজ্ব মূলতঃ তারই প্রস্তুতি ও ট্রেনিংয়ের জন্যে। খুতবাত ৩০৭ ও ৩১৫ পৃঃ

ঘ আরেকটি বক্তব্যঃ

حکومت کے بغیر دین بالکل ایسا ہے جیسے ایک عمارت کا نقشہ آپ کے دماغ میں ہو مگر عمارت زمین پر موجود نہ ہو، ایسے دماغی نقشے کے ہونے کا فائدہ ہی کیا ہے؟

অর্থঃ রাষ্ট্র ছাড়া দ্বীন অবিকল একটি বিল্ডিংয়ের কাল্পনিক চিত্র, ভূ-পৃষ্ঠে যার অস্তিত্ব নাই। এমন কাল্পনিক চিত্রের ফায়দাটাই বা কি? -খুতবাত ৩২২ পৃঃ

ঙ আরো একটি বক্তব্যঃ
لیکن حقیقذیہ ہے کہ اسلام کسی مذہب کا اور مسلمان کسی قوم کا نام نہیں ہے۔ بلکہ دراصل ایک انقلابی نظریہ ومسلک ہے۔
অর্থঃ বাস্তব কথা হল ইসলাম কোন ধর্মের নাম নয়। এবং মুসলমান কোন জাতির নাম নয়। বরং মূলতঃ ইসলাম একটি বিপ্লবী চিন্তাধারা ও পদ্ধতি এবং মুসলমান সেই আন্তর্জাতিক বিপ্লবী বাহিনীর নাম। তাফহীমাত ১ম খ- ৭৭ পৃঃ

সার সংক্ষেপঃ
মওদূদী সাহেবের মতে-

(ক) দ্বীন মূলতঃ রাষ্ট্রের নাম।

(খ) রাষ্ট্র ছাড়া দ্বীন অস্তিত্বহীন কাল্পনিক চিত্রের ন্যায় নিরর্থক।

(গ) ইসলাম একটি বিপ্লবী চিন্তাধারার নাম।

(ঘ) ইসলামী রাষ্ট্র ছাড়া নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাতকে ইবাদত মনে করা মারাত্মক ভুল। বরং নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি জিহাদ ও রাষ্ট্র কায়িমের জন্যে ট্রেনিং কোর্স মাত্র।

পর্যালোচনাঃ মওদূদী সাহেব দ্বীনের যে ব্যাখ্যা করেছেন তা মূলতঃ দ্বীনের রাজনৈতিক ব্যাখ্যা। শরয়ী ব্যাখ্যা আদৌ নয়। কারণ আল্লাহ পাক স্বীয় কালামে পাকে ইরশাদ করেন- {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ } [آل عمران : ١٩]
অর্থঃ ইসলাম আল্লাহর নিকট একমাত্র দ্বীন। সূরায়ে আলে ইমরান আয়াত-১৯
(অনুবাদ তাফহীমুল কুরআন বাংলা)

উক্ত আয়াতে স্পষ্টভাবে বুঝা গেল আল্লাহর নিকট একমাত্র দ্বীন হচ্ছে ইসলাম। এবার দেখুন ইসলাম কি জিনিস। এ ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল কি বলেছেন, বুখারী মুসলিম শরীফে সর্বসম্মত সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে একদা হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদের মাঝে উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় হযরত জিবরাঈল আ. এক অপরিচিত লোকের আকৃতি ধারণ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এসে রাসূলের হাঁটুর সাথে হাঁটু মিলিয়ে বসে কয়েকটি প্রশ্ন করেন। প্রথম প্রশ্নটি ছিল এরূপঃ হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাকে ইসলামের ব্যাখ্যা বলুন, তদুত্তরে রাসূল বললেনঃ ইসলাম হল- তুমি এ মর্মে সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নাই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল। এবং তুমি নামায কায়িম করবে, যাকাত আদায় করবে। রমযানে রোযা রাখবে ও বাইতুল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য হলে হজ্ব আদায় করবে। এ উত্তর শুনে জিবরাঈল

আ. বললেন আপনি সঠিক বলেছেন। বুখারী মুসলিম সূত্রে মিশকাত শরীফ কিতাবুল ঈমানের প্রথম হাদীস। হাদীসটি হাদীসে জিবরাঈল নামে প্রসিদ্ধ।

মোটকথা আল্লাহপাক বললেন যে, তার নিকট একমাত্র দ্বীন হচ্ছে ইসলাম আর রাসূল বললেন, আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ ও মুহাম্মাদকে তাঁর রাসূল বলে সাক্ষ্য দেওয়া, নামায পড়া, যাকাত দেওয়া, রোযা রাখা ও হজ্ব করা হচ্ছে ইসলাম, জিবরাঈল তা সত্যায়ন করলেন, তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং ওহীর বাহক জিবরাঈলের মতে দ্বীন হচ্ছে- ঈমান, নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত। এ কারণে মুসলিম উম্মাহর আক্বীদাও তাই। অথচ মওদূদী সাহেব বললেন এগুলো দ্বীন নয়। দ্বীন হচ্ছে "রাষ্ট্র ও জিহাদ" আর রাষ্ট্র অর্জনের ট্রেনিং হল নামায রোযা, হজ্ব, যাকাত। রাষ্ট্র ছাড়া এসব ইবাদাতও নিরর্থক ও অস্তিত্ববিহীন কাল্পনিক নক্শা।

আল্লাহর ও তাঁর রাসূল এবং জিবরাঈলের বর্ণনার বিপরীতে দ্বীনের এহেন ব্যাপারকে যদি অপব্যাখ্যা না বলা যায় তাহলে অপব্যাখ্যা আর কোন বস্তুকে বলবে?

বস্তুতঃ কুরআনের বহু আয়াত এবং রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বহু হাদীসের দ্বারা একথা একদম পরিষ্কার যে দ্বীনের মূল বিষয় ঈমান, নামায, রোযা, হজ্ব ও যাকাত, বান্দার পক্ষ থেকে আল্লাহ তা'আলার মূল চাওয়া এগুলোই। আরো কিছু ইবাদাত আছে তবে সেগুলো প্রাসঙ্গিক বা সম্পূরক। তাছাড়া বান্দাদের পরস্পরে চলতে গেলে পারিবারিক বিষয়, সামাজিকতা-জাতীয়তা ও লেন-দেনের প্রসঙ্গ আসে। সেগুলোও যেন খোদার মর্জীতে হয়ে বান্দা আরামে জীবন-যাপন করতে পারে এজন্যে মুআমালাত, মুআশারাত, আখলাক ও সিয়াসাত বা হুকুমত তথা শাসন বিষয়ক বিধি-বিধান দেওয়া হয়েছে। আর মূল ইবাদত সহ অন্যান্য বিধি বিধান সুচারু রূপে আঞ্জাম দেওয়ার দ্বারা বান্দা হবে ভূ-পৃষ্ঠে আল্লাহর খলীফা তথা প্রতিনিধি। এ প্রতিনিধিত্ব যে মানবে না বা এতে যে বাধা দিবে তার বিরুদ্ধে মুসলমান জিহাদ করবে। এক কথায় ঈমান ও মৌলিক ইবাদাত তথা নামায রোযা, যাকাত, হজ্ব, এগুলোই দ্বীনের মূল ও কাণ্ড। আর জিহাদ সিয়াসাত সহ অন্য সব বিধি-বিধান হল নিজ নিজ পজিশনভেদে শাখা-প্রশাখা, এ-কারণেই রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিষ্কার ভাবে ঘোষণা করে গেছেন।

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيذاء الزكاة والحج وصوم رمضان) رواه البخارى في صحيحه برقم:٨ ,ومسلم برقم:١٢٢

অর্থঃ ইসলাম তথা দ্বীনের ভিত্তি পাঁচটি জিনিসের উপরঃ একমাত্র আল্লাহকে ইলাহ ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে তাঁর রাসূল বলে সাক্ষ্য দেওয়া-নামায কায়িম করা, যাকাত দেওয়া, হজ্ব করা; ও রমাযানের রোযা রাখা। (বুখারী ও মুসলিম সূত্র মিশকাত পৃঃ ১২)

কিন্তু মওদূদী সাহেব রাসূলের এ ঘোষণার বিপরীতে হুকুমাত তথা রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও জিহাদকে মূল দ্বীন আর নামায, রোযা, যাকাত, হজ্ব কে তার ট্রেনিং বলার মাধ্যমে শাখা-প্রশাখাকে মূল ও কাণ্ড, আর মূল ও কাণ্ডকে শাখা-প্রশাখা বানিয়ে দিলেন, যাতে রয়েছে আক্বীদার খারাবীসহ আরো বহুবিধ খারাবী, যা বিবেকবান মাত্রই বুঝতে পারছেন।

(৪) জনাব মওদূদী সাহেবের একটি মৌলিক থিওরি তিনি এভাবে প্রকাশ করেন

رسول خدا کے سوا کسی انسان کو معیار حق نہ بنائے ، کسی کو ذنقید سے بالاذر نہ سمجھے، کسی کی ذھنی غلامی میں مبذلاء نہ ہو-

অর্থঃ রাসূলে খোদা ছাড়া অন্য কাউকে সত্যেও মাপকাঠি বানাবে না। কাউকে সমালোচনার উর্ধ্বে মনে করবে না। কারো মানুষিক গোলামীতে লিপ্ত হবে না। (দস্তুরে জামাআতে ইসলামী পৃঃ ১৪, সত্যের আলো পৃঃ ৩০)

এই থিওরির উপর ভিত্তি করে তিনি অন্যত্র লিখেনঃ

میں نے دین کو حال یا ماضی کے اشخاص سے سمجھنے کی بجائے ہمیشہ قران و سنذ ہی سے سمجھنے کی کوشش کی ہے-

অর্থঃ আমি অতীত বা বর্তমানে ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে দ্বীন বুঝার পরিবর্তে সর্বদা কুরআন সুন্নাহ থেকেই বুঝতে চেষ্টা করেছি। এ কারণে খোদার দ্বীন আমার ও প্রত্যেক মুমীনের নিকট কি চায় তা জানার জন্যে এটা দেখতে চেষ্টা করিনি যে অমুক-অমুক বুজুর্গ কি বলেন। বরং সর্বদা এটাই দেখতে চেষ্টা করেছি যে, কুরআন কি বলে ও রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি বলেছেন। রুয়েদাদে জামাআত তৃতীয় খণ্ড পৃঃ ৩৭ সূত্র মওদূদী সাহেব আওর উনকী তাহরীরাত পৃঃ ৯০ প্রকাশঃ দারুল ইশাআত -করাচী।

সারকথা মওদূদী সাহেবের মতে সত্যকে জানার ও অনুসরণের জন্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পর আর কোন নির্ভর যোগ্য মাধ্যম নাই। এই থিওরির অন্তরালে তিনি কুরআন ও হাদীস থেকে দ্বীনকে বুঝার ও অনুসরণের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কিরামের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেছেন।

এছাড়া সাহাবায়ে কিরামের জীবনে বিভিন্ন ভাবে কালিমা লেপনের জন্যে তিনি "খেলাফত ও মুলুকিয়্যাত” নামে স্বতন্ত্র কিতাবও লিখেছেন। সবগুলোরই সারকথা হল যে, সত্যকে জানা ও মানার জন্যে সাহাবাদের জামাত নির্ভরযোগ্য নয়, বরং জামাআতে সাহাবার উপর নির্ভর করা যাবে না। তাঁদের অনেকেই পাপী ছিলেন এজন্যে তাঁরা পরবর্তীদের যাচাই বাছাইয়ের উর্ধ্বে নন।

অথচ ইসলামে রয়েছে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান, ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র সব ক্ষেত্রেই তার ব্যাপ্তি, এসব ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল শুধু বিধান শুনিয়ে ক্ষান্ত হননি বরং বিধান সমূহ কার্যকর করে দুনিয়ার সামনে তার আমলী নমুনা রেখে গেছেন। আর আল্লাহ ও তার রাসূলের বিধানাবলীর কার্যক্ষেত্রই ছিল যে পরিবার, যে সমাজ, যে রাষ্ট্র তার নাম জামাআতে সাহাবা। শুধু বিধান বলে গেলে কার্যক্ষেত্রে তার রূপরে

বিকৃত করে ফেলত পরবর্তী যুগের বক্র স্বভাবের লোকেরা। তার থেকে হেফাজতের জন্যেই প্রয়োজন ছিল উক্ত জামাআতে। আর যেহেতু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধানাবলীর প্রাকটিক্যাল রূপই হচ্ছে সাহাবায়ে কিরামের জীবনী, তাই মূল বিধানাবলীর অনুসরণের ক্ষেত্রে তাদের জীবনও হবে মাপকাঠি। এটাই স্বাভাবিক। এই কারণে কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে সাহাবায়ে কিরামের ঈমান, আমল ও ইলমকে অন্যদের জন্যে অনুসরণীয় হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে যথাঃ আল্লাহ পাক ইরশাদ করেনঃ

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوا ۖ وَّإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ۖ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّـهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (١٣٧

অর্থঃ (সাহাবাদের লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে) তারা যদি তোমাদের মত ঈমান আনয়ন করে তাহলে হেদায়াত পাবে আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তারাই হঠকারিতায় রয়েছে। সূরায়ে বাকারা আয়াত ১৩৭

অন্যত্র ইরশাদ করেনঃ

وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٥

অর্থঃ আর যে সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পরও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মুমীনদের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে আমি তাকে সেদিকেই ফিরাব এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর তা হল নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থান। (সূরায়ে নিসা -আয়াত ১১৫) এই আয়াতে মুমীনদের পথ বলতে প্রথমতঃ যারা উদ্দেশ্য তারা হলেন জামায়াতে সাহাবা।

অন্য আয়াতে কুরআনে পাক প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ ﴿٤٩

অর্থঃ বরং যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তাদের অন্তরে ইহা তো স্পষ্ট আয়াত। সূরায়ে আনকাবূত ৪৯। এই আয়াতেও যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তাদের দ্বারা প্রথম উদ্দেশ্য সাহাবায়ে কিরাম।

পক্ষান্তরে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও বিভিন্ন হাদীসে সাহাবায়ে কিরামের অনুসরণের তাকীদ করেছেন যথাঃ -

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سذفذرق امذى ثلاثا وسبعين فرقة كلهم فى النار الا واحدة ، قالوا من هى يا رسول الله قال ما انا عليه واصحابى-

অর্থঃ অতিশীঘ্র আমার উম্মত তেহাত্তর ফেরকায় বিভক্ত হয়ে পড়বে তন্মধ্যে একটি জামাআত হবে জান্নাতী আর বাকীগুলো হবে জাহান্নামী। উপস্থিত সাহাবারা জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! জান্নাতী দল কারা হবে? উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু

‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ যারা আমার ও আমার সাহাবাদের তরীকার অনুসারী হবে। (তিরমিযী শরীফ ২য় খণ্ড পৃঃ ৯৩)

অন্য হাদীসে ইরশাদ ফরমানঃ فعليكم بسنذى وسنذى الخلفاء الراشدين

অর্থঃ(উম্মতকে লক্ষ্য করে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন) তখন তোমাদের জন্যে আমার ও খুলাফায়ে রাশেদীনের তরীকা মত চলা অত্যাবশ্যক। (আবু দাউদ শরীফ ২-৬৩৫)

এছাড়াও কুরআনের বহু আয়াত ও রাসূলের বহু হাদীস দ্বারা এ কথা সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত যে, কুরআন-হাদীস মুতাবিক ইলম ও আমলের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কিরামের অনুসরণ জরুরী। এক্ষেত্রে সাহাবাদের পথ ও মতকে বর্জন করে কুরআন হাদীসের জ্ঞানার্জন ও তদানুযায়ী আমল সম্ভব নয়। লক্ষাধিক সাহাবীর মধ্যে সবাই অনুসরণেরযোগ্য। কুরআন হাদীসের কোথাও এ ক্ষেত্রে কোন সাহাবীকে বাদ দেওয়া হয় নাই। কোন সাহাবীর দ্বারা কখনো গুনাহ হয়ে গেলে তাও হয়েছে গুনাহের পরে তাওবার পদ্ধতির ক্ষেত্রে উম্মতের অনুসরণযোগ্য হওয়ার জন্যেই। দ্বিতীয়তঃ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেহেতু সবকিছু বাস্তব নমুনা হিসাবে দেখিয়ে গেছেন তাই ইসলামী দণ্ডবিধির বাস্তব প্রয়োগবিধি শিক্ষা দেয়ার লক্ষ্যে দু একজন সাহাবী থেকে ভুল প্রকাশ পেয়েছে। একারণেই রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ

قال رسول الله صلي الله عليه وسلم أوحي الله يا محمد ان اصحابك عندى كالنجوم بعضها اضوأ من بعض ولكل نور فمن اخذ بشي مماهم عليه من اخذلافهم فهو عندى علي الهدى – رواه الدارقطني-

অর্থঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন আল্লাহ অহী পাঠিয়েছেন যে, হে মুহাম্মাদ! আপনার সাহাবীগণ আমার নিকট নক্ষত্রতুল্য, কেউ অতি উজ্জল কেউ তার চেয়ে কম, তবে সকলেরই আলো আছে। অতএব, তাদের মতবিরোধের ক্ষেত্রেও যে কোন এক পক্ষকে অনুসরণ করলেই সে অনুসারী আমার নিকট হেদায়াত প্রাপ্ত বলে গণ্য হবে।

(কেননা, তাদের বিরোধ হবে ইজতেহাদী, আর সঠিক ইজতেহাদের কোন অংশকেই নিশ্চিত ভুল বলা যাবে না) হাদীসটির সনদে দুর্বলতা

থাকলেও এমর্মে আরো অনেক হাদীস থাকায় এবং হাদীসটি বিষয় বস্তু কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও অপরাপর হাদীস সমর্থিত হওয়ায় হাদীসটি সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য (অবশ্য কারো মতে কুরআন-হাদীসের সমর্থন গ্রহণযোগ্য না হয়ে নিজের মনের সমর্থন গ্রহণ যোগ্য হলে তা ভিন্ন কথা)তাফসীরে মাযহারী ২য় খণ্ড পৃঃ ১১৬

মোটকথা সাহাবায়ে কিরামের সত্যের মাপকাঠি হওয়ার বিষয়টি কুরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, সাথে সাথে যুক্তি সংগতও। অথচ মওদূদী সাহেব তাঁর দলের জন্যে আইন প্রণয়ন করে গেলেন যে, রাসূলে খোদা ছাড়া আর কাউকে যেন সত্রের মাপকাঠি না বানানো হয়। কি দোষ করেছেন হযরত আবু বকর ও উমর (রা.), যাদেরকে সত্যের মাপকাঠি বানানো যাবে না।হযরত উমর বিন আব্দুল আযীযের রাষ্ট্র ব্যবস্থা, মুজাদ্দিদে আলফেসানীর সংস্কার,

আইম্মায়ে মুজতাহেদীনের ইজতেহাদ, হযরত আবদুল জিলানীর তাযকিয়া ও মা'রিফাতকে অনুসরণ করে যদি কোটি কোটি মানুষ হিদায়াতের ও নাজাতের আশা করতে পারে তাহলে রাসূলে আকরামের মত পরশ পাথরের ছোয়ায় ধন্য ও তার হাতে গড়া জামাআতের জীবনী, কথা ও কাজ কেন অনুসরনযোগ্য হবে না?

বস্তুতঃ রাসূল ছিলেন দ্বীন নামক দূর্গের নির্মাতা। সাহাবায়ে কিরাম ছিলেন সে দুর্গের সুদৃঢ় প্রাচীন। তাদের উপর নির্ভর না করা হলে দ্বীনের ধ্বংস অনিবার্য। ইসলামের অতীত ইতিহাসের গোমরাহ দলগুলো সর্বদা এই প্রাচীরকেই ধ্বংস করতে চেষ্টা করেছে।

তাছাড়া মওদূদী সাহেব শুধু সাহাবাগণকে সত্যের মাপকাঠি স্বীকার করেননি তা নয় বরং বিভিন্ন ভাবে সাহাবায়ে কিরামের কুৎসা রটিয়েছেন। সে সূত্রে তিনি বলেনঃ

بسا اوقاذ صحابہ پر بھی بشری کمزوریوں کا غلبہ ہو جاذا ذھا

অর্থঃ সাহাবাদের উপর প্রায়ই মানবিক দুর্বলতা প্রভাব বিস্তার করত। - তাফ্হীমাত ৪র্থ সংস্করণ পৃঃ ২৯৬ সূত্রঃ মওদূদী সাহেব আওর উন্কী তাহরীরাত ৮৫

তাছাড়া উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ের (মওদূদীর ভাষায়) বড় বড় কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে জনাব মওদূদী লিখেনঃ যে সমাজে সুদের প্রচলন থাকে সেখানে সুদ খোরীর কারণে দুই ধরনের নৈতিক রোগ দেয়া দেয়। সুদ গ্রহণ কারীর মধ্যে লোভ-লালসা, কৃপণতা ও স্বার্থান্ধতা এবং সুদ প্রদানকারীদের মধ্যে ঘৃণা-ক্রোধ, হিংসা ও বিদ্বেষ জন্মে নেয়। উহুদের পরাজয় এ দুই ধরনের রোগের কিছু না কিছু অংশ ছিল। (তাফহীমুল কুরআন বাংলা ৪র্থ পারা ২য় খণ্ড ৬৫ পৃঃ আধুনিক প্রকাশনী ৩য় সংস্করণ।)

চিন্তা করে দেখুন! উদ্ধৃত প্রথম বক্তব্য দ্বারা যে মানবিক দুর্বলতার কথা বলেছেন তারই সম্ভবতঃ কিছুটা ব্যাখ্যা করেছেন উহুদের ঘটনায় গিয়ে। অর্থাৎ মানবিক দুর্বলতাগুলো ছিলঃ লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ, কৃপণতা ও ঘৃণা ইত্যাদি। অথচ উহুদ যুদ্ধে যারা শরীক ছিলেন, তারা সকলেই ছিলেন নবীজীর প্রথম সারির সাহাবা। আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রশংসায় কত আয়াত নাযিল করেছেন। কিন্তু মওদূদী সাহেব নির্দ্বিধায় পাইকারী হারে তাদের দোষচর্চা করে গেলেন। শুধু তাই নয় আশারায়ে মুবাশ্শারাহ (জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজন) থেকে শুরু করে কাতেবে ওহী পর্যন্ত অনেকেই রেহাই পাননি মওদূদী সাহেবের কলমের আক্রমণ থেকে। যার জ্বলন্ত প্রমাণ

পাবেন মওদূদী সাহেবের লিখিত খেলাফত মূলুকিয়াত ও তার পাশাপাশি জাষ্টিস তক্বী উসমানীর লিখা "ইতিহাসের কাঠগড়ায় হযরত মুআবিয়া" এবং হযরত শামছুল হক ফরিদপুরীর লেখা "ভুল সংশোধন" পড়ে দেখলে।

এসবের দ্বারা তিনি যেমন সাহাবাদের পবিত্র জামাআতকে উম্মতের সামনে কলঙ্কিত করতে চেয়েছেন। অপরদিকে রাসূলের হাতে গড় স্বর্ণমানবদের দল সাহাবাকে কলঙ্কিত করে স্বয়ং রাসূলকেও চরম ব্যর্থ প্রমাণ করতে প্রয়াস পেয়েছেন। কেননা, কিয়ামত পর্যন্ত আগত মানুষের জন্যে রূহানী চিকিৎসক যদি বছরকে বছর তার সংস্পর্শে থাকা রোগীদেরকেই পূর্ণ চিকিৎসা করতে না পারেন। বরং তার সংস্পর্শীদের মাঝে "প্রায়ই সে রোগগুলো প্রভাব বিস্তার করে থাকে"। তাহলে এমন চিকিৎসককে সফল কে বলবে ?

অথচ স্বয়ং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবাদের সম্পর্কে কটূক্তি কিংবা সমালোচনা করতে উম্মতকে বার বার এবং কঠোর ভাষায় নিষেধ করে গেছেন। এ ব্যাপারে কয়েকটি হাদীস নিম্নে প্রদত্ত হল-

قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا ذسبوا اصحابي فان احدكم لو انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولانصيفه-

অর্থঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতকে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেন, তোমরা আমার সাহাবাদের মন্দ বলবেনা কেননা তোমাদের কেউ উহুদ পাহাড়সম স্বর্ণ সদকা করলেও তাদের একসের বা আধাসেরের সমান হবে না। বুখারী মুসলিম - সূত্রঃমিশকাত পৃঃ ৫৫৩

عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم الله الله في اصحابي لا ذذخذوهم غرضا من بعدى فمن احبهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم

অর্থঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমানঃ আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহকে ভয় কর আমার সাহাবাদের বিষয়ে। তাদেরকে সমালোচনার পাত্র বানাবে না। যারা তাদেরকে ভালবাসবে আমার মুহাব্বাতেই তা করবে।আর যারা তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করবে তারা আমার সাথেই শত্রুতাহেতু তাদের শত্রু হবে..... তিরমিযী ২-২২৫ মিশকাত - ৫৫৪

عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيذم الذين يسبون أصحابي - فقولوا لعنة الله على شركم

অর্থঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমান, তোমরা যখন ঐ সকল লোকদেরকে দেখবে যারা আমার সাহাবাদের মন্দ বলে তখন তোমরা বলবে তোমাদের অনিষ্টের প্রতি আল্লাহর লা'নত হোক। (তিরমিযী ২-২৫৫ মিশকাত ৫৫৪)

মোটকথা সাহাবায়ে কিরাম- আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দৃষ্টিতে অনেক সম্মানী জামাআত। আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্টির ঘোষণা দিয়েছেন। রাসূল সাল্লা

‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে সমালোচনার পাত্র বানাতে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। বিস্তারিত জানতে হলে দেখেন মুফতী শফী রহ. প্রণীত “মাকামে সাহাবা” নামক কিতাবটি।

আর এ কারণেই আকাইদের বিখ্যাত কিতাব “মুছায়রাতে” উল্লেখ করা হয়েছে যেমনঃ واعذقاد اهل السنة و الجماعة ذزكية جميع الصحابة وجوبا .....

অর্থঃ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আক্বীদা হল যে, সকল সাহাবীকে নির্দোষ বলা ওয়াজিব। (মুসায়ারাহ পৃঃ ১৩২ দেওবন্দ। সূত্রঃ মাকামে সাহাবা - পৃঃ ৭৯)

তেমনিভাবে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া লিখেনঃ

ومن اصول اهل السنة و الجماعة سلامة قلوبهم و السنذهم لاصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم

অর্থঃ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মৌলিক বিশ্বাস হল যে, রাসূলের সাহাবাদের ব্যাপারে নিজ অন্তর ও জিহ্বাকে পরিষ্কার রাখবে। (শরহে আক্বীদায়ে ওয়াসিত্বিয়্যাহ পৃঃ ৪০৩ সূত্র মাকামে সাহাবা পৃঃ ৭৯)

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া আরো বলেনঃ

لا يجوز لاحد ان يذكر شيئا من مساويهم ولا ان يطعن علي أحد منهم بعيب و لا نقص فمن فعل ذلك وجب ذاديبه

অর্থঃ সাহাবাদের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা কারো জন্যেই জায়িয নাই। যে এমন করবে তাকে শাস্তি দেওয়া ওয়াজিব। (আস্‌সারিমূল মাস্‌লুল। সূত্রঃ মাকামে সাহাবা - ৭৭)

ইমাম নববী বলেনঃ

الصحابة كلهم عدول من لابس الفذن وغيرهم باجماع من يعذد به-

অর্থঃ গ্রহণযোগ্য সকলের এ ব্যাপারে ইজ্‌মা যে সকল সাহাবী নিরপরাধী, এমনকি যারা পরস্পর বিগ্রহে পতিত হয়েছেন তাঁরাও। (তাক্বরীব সূত্রঃ মাকামে সাহাবা - পৃঃ৭৭)

ইমাম মুসলিমের উস্তাদ ইমাম আবু যরআহ বলেনঃ

اذا رأيذ الرجل ينذقص أحدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم انه زنديق

অর্থঃ যখন কাউকে কোন সাহাবীর দোষ-বর্ণনা করতে দেখ তাহলে জেনে নাও যে সে হল যেন্দীক্ব (ধর্মদ্রোহী)। আদদুররাতুল মুযিয়্যাহ। (সূত্রঃ মাকামে সাহাবা - ৭৯)

তেমনি ভাবে প্রসিদ্ধ আকীদার কিতাব শরহে আকীদাতুত্বাহাবিয়্যাহ। উল্লেখ আছে.....

ونحب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.....ولا نذكرهم إلا بخير وحبهم دين وايمان واحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان.

অর্থঃ আমরা সকল সাহাবীকে ভালবাসি ..... তাদের শুধুমাত্র ভালোর আলোচনাই করি। তাদের প্রতি ভালবাসা দ্বীন, ঈমান ও ইহসানের পরিচায়ক আর তাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ কুফর, মুনাফেক্বী ও অবাধ্যতার পরিচায়ক। আক্বীদা নং ৯৭-

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা বুঝা গেল যে সাহাবাদের সমালোচনাকারী আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বহির্ভূত ও গোমরাহ দলের অন্তর্ভুক্ত।

(৫) মওদূদী সাহেব যেমন সাহাবায়ে কিরামকে সত্যের মাপকাঠি মানতে নারাজ তেমনি আম্বিয়ায়ে কিরাম, সম্পূর্ণ নিষ্পাপ বলতেও নারাজ; যথা আম্বিয়াকিরাম সম্পর্কে তিনি লিখেনঃ

عصمذ انبياء عليهم الصلاة والسلام كى لوازم ذاذ سے نہيں ..... اور ايک لطيف نكذه يہ ہے كہ الله ذعالى نے بالاراده ہر نبى سے كسى وقذ اپنى حفاظذ اٹہا كر

ايک ده لغزيش ہو جانے دى ہيں ذاكہ لوگ انبياء كو خدا نہ سمجہيں اور جان ليں كہ يہ بہى بشر ہيں-

অর্থঃ নিষ্পাপ হওয়া আম্বিয়ায়ে কিরামের সত্ত্বার জন্যে আবশ্যক নয় বরং নবুওয়াতের দায়িত্ব সঠিক ভাবে পালনার্থে আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে গুনাহ হতে হেফাজতে রেখেছেন। নতুবা ক্ষণিকের জন্যে সে হিফাজত উঠিয়ে নিলে সাধারণ মানুষের মত তাদেরও ভুল ভ্রান্তি হতে পারে, আর মজার কথা যে, আল্লাহ-তা'আলা ইচ্ছা করেই প্রত্যেক নবী থেকে কোন না কোন সময় এই হিফাজত উঠিয়ে দু-একটি গুনাহ হতে দিয়েছেন, যাতে লোকেরা তাঁদেরকে খোদা মনে না করে এবং বুঝে নেয় যে, তাঁরাও মানুষ। তাফহীমাত ২, পৃঃ ৫৭ ষষ্ঠ সংস্করণ তেমনি ভাবে তর্জুমানুল কুরআন ৫৮-এপ্রিল ১৯৭৬ সংখ্যায় اسلام كس چيز كا علمبردار ہے শিরোনামে স্বয়ং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে লিখেনঃ

وه نہ فوق البشر ہے- نہ بشرى كمزوريوں سے بالاذر ہے-

অর্থঃ তিনি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম না মানব উর্ধ্বের ছিলেন, না মানবিক দুর্বলতা মুক্ত ছিলেন। মোটকথা তাঁর মতে আম্বিয়া কিরাম সত্ত্বাগত দিক থেকে মা'সুম তথা নিষ্পাপ ছিলেন না। বরং প্রত্যেক নবীর দ্বারাই গুনাহ সংঘটিত হয়েছে। এমনকি স্বয়ং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও মানবিক দুর্বলতা মুক্ত ছিলেন না, আর আম্বিয়া কিরামের গুনাহ দেখানোর জন্যে তিনি তাফহীমুল কুরআন, তরজুমানুল ২৯ খঃ ও রাসায়িল মাসায়িল ১ম খে- হযরতে আদম, হরতে দাউদ, হযরতে ইউনুস, হযরত ইউসুফ ও হযরত মূসা আলাইহিমুস সালাম কর্তৃক গুনাহ প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন।

অথচ হযরত আদম আ. এর গন্ধম খাওয়ার বিষয়টি দুনিয়ায়ে অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেকার ছিল। এছাড়া কোন নবী হতে ইহ জীবনে শরীয়াতের দৃষ্টিতে কোন পাপ কাজ

হয়েছে এমন প্রমাণ কোথাও নাই। আর হবেই বা কি করে। কারণ কুরআনে পাকের বহু আয়াতে উম্মতকে নবী-রাসূলের নিঃশর্ত ও দ্বিধাহীন আনুগত্যের হুকুম করা হয়েছে। তাঁদের দ্বারা কখনো কখনো গুনাহ হওয়ার সম্ভাবনা থাকাবস্থায় এ আনুগত্য কি করে সম্ভব?

আর খাওয়া পরা সংসার ধর্ম এগুলো হল মানবিক চাহিদা ও প্রয়োজন। মানবিক দুর্বলতা হল, হিংসা বিদ্বেষ, স্বজন প্রীতি অযথা ক্রোধ ইত্যাদি। রাসূল নিজে যদি এসব দুর্বলতা মুক্তই না হন উম্মতকে এ সব দুর্বলতা মুক্ত করবেন কি করে? নবীগণ মানুষজাতের একথা প্রমাণের জন্যে খাওয়া-পরা এজাতীয় মানবিক প্রয়োজনইতো যথেষ্ট, তা সত্ত্বেও তাদেরকে দিয়ে গুনাহ সংঘটিত করিয়ে ও মানবিক দুর্বলতাযুক্ত রেখে মানুষ প্রমাণের কি দরকার আছে?

বস্তুতঃ আম্বিয়াকিরামের নিষ্পাপ হওয়া স্বয়ং কুরআনের ও খোদ নবুওতীর দাবী, গুনাহের প্ররোচক নফস ও শয়তানের কুমন্ত্রণা হতে আল্লাহ তাদেরকেই সর্বদাই মুক্ত রেখেছেন, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত এটাই বিশ্বাস করে এবং করতে বাধ্য।

(৬) কুরআন সুন্নাহর অনুসরণের ক্ষেত্রে মাযহাব চতুষ্টয়ের ইমামদের তাকলীদ করা সম্পর্কে জনাব মওদূদী সাহেব লিখেনঃ

میرے نزدیک صاحب علم آدمی کیلئے ذقلید نا جائز اور گناہ بلکہ اس سے بہی شدید ذر چیز ہے۔

অর্থঃ আমার মতে একজন আলেমের জন্যে তাকলীদ নাজায়িয, গুনাহ বরং এর চেয়েও জঘন্যতম জিনিস। (রাসাইল মাসাইল ১ম খ- পৃঃ ২৪৪ সূত্র মওদূদী সাহেব আওর উনকী তাহরীরাত পৃঃ ৯৯)

অন্যত্র লিখেনঃ

میں نہ مسلک اہل حدیث کو اسکی ذمام ذفصیلاذ کے ساذہ صحیح سمجہذا ہوں اور نہ حنفیذ یا شافعیذ ہی کا پابند ہوں۔

অর্থঃ আমি আহলে হাদীসের মতাদর্শকে যেমন পুরাপুরি সঠিক মনে করি না তেমনি আমি হানাফী বা শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারীও নই। (রাসাইল মাসাইল ১ম খ- পৃঃ ২৩৫ - সূত্র-মওদূদী সাহেব আওর উনকী তাহরীরাত ৯৮)

মোট কথা মওদূদী সাহেবের মতে আলেমের জন্যে ইমামদের তাকলীদ মারাত্মক গুনাহের কাজ, আর আলেম দ্বারা তার মত অপূর্ণ আলেম ও উদ্দেশ্য। তাহলে আইম্মায়ে কিরামের পর হতে মুকাল্লিদ উলামা মাশায়েখ বুযুর্গানে দ্বীন সকলেই তাকলীদ করে। তাঁর মতে মারাত্মক গুনাহগার সাব্যস্ত হয়েছেন। কত জঘন্য কথা!

এ ছিল মওদূদী সাহেবের কতিপয় ভুল চিন্তাধারা। উপরে যে কয়টি ভুলের কথা আলোচনা করা হয়েছে সে গুলো হল তাঁর মূল থিওরির অন্তর্ভুক্ত। এ সব থিওরির আলোকেই তিনি লিখেছেন, দল গড়েছেন ও গবেষণা করেছেন। চিন্তা করলে বুঝতে

পারবেন এসব থিওরির আলোকে লেখা বই, তাফসীর ও গবেষণা কি পরিমাণ গোমরাহী'ও ভুলে পরিপূর্ণ হয়েছে। বিজ্ঞ ও হক্কানী উলামায়ে কিরাম সে সব ভুলের প্রতি মওদূদী সাহেব তাঁর দলকে আকৃষ্ট করলে হয়ত বা ইনিয়ে বিনিয়ে আরো কয়েকটি গলত যুক্তি দিয়ে সে ভুলকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন বা কোন ভাবে ভুল ঢাকা সম্ভব না হলে লিখনি হতে সেই অংশটুকু গায়েব করে দিয়েছেন, কিন্তু কখনো প্রকাশ্যে ভুল স্বীকার করেননি। একারণে হক্কানী উলামায়েকিরাম প্রায় শুরু থেকেই মওদূদী সাবেও তাঁর চিন্তা ধারায় বিশ্বাসী

জামাআতে ইসলামীকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বহির্ভূত একটি গোমরাহ দল হিসাবে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এবং অন্যদেরকে তাদের থেকে সতর্ক থাকতে বলেছেন।

নিম্নে জগৎবিখ্যাত কয়েকজন আলেমের অভিমত উল্লেখ করা হল-

(ক) আকাবিরে দেওবন্দের সর্বসম্মত ফাতাওয়াঃ মওদুদী সাহেব ও জামাআত ইসলামীর বই-পত্র ও রচনাবলী পড়ার দ্বারা সাধারণ মানুষ আইম্মায়ে হিদায়াতের সাথে সম্পর্কহীন হয়ে পড়ে, যা তাদের গোমরাহীর কারণ। তেমনি সাহাবায়ে কিরাম ও বুযুর্গানে দ্বীনের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধায়ও বাটা পড়ে। এছাড়া মওদূদী সাহেবের বহু গবেষণা সম্পূর্ণ ভুল। সার্বিক ভাবে মওদূদী সাহেব ও তাঁর দলের চিন্তাধারা একটি নতুন ফিৎনা, যা নিশ্চিত ক্ষতিকর। এ কারণে আমরা উক্ত চিন্তাধারা নির্ভর আন্দোলনকে গলদ ও মুসলিম উম্মাহর জন্যে ক্ষতিকর মনে করি। এ দলের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নাই।

দস্তখতকারীঃ হযরত মুফতী কিফায়াতুল্লাহ রহ.। হযরত হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ.। হযরত কারী মুহাম্মাদ তৈয়্যেব রহ. (প্রিন্সিপ্যাল দারুল উলূম দেওবন্দ শাইখুল হাদীস হযরত যাকারিয়া রহ. হযরত মুফতী সাইদ আহমাদ মাঃ জিঃ মুফতীয়ে দেওবন্দ প্রমুখ। মাসিক দারুল উলূম যী-কাহাদ ১৩৭০ সংখ্যা। (দৈনিক আল জমিয়ত দিল্লী ৩রা আগষ্ট ১৯৫১ খৃঃ -সূত্রঃ মওদূদী সাহেব আওর উনকী তাহরীরাত পৃঃ ১৯)

(খ) মুফতীয়ে আযম মুফতী মুহাম্মদ শফী রহ. এর ফাতাওয়াঃ আমার মতে মওদূদী সাহেবের মৌলিক ভুল এই যে, তিনি আক্বাইদ ও আহকামের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ইজতেহাদের অনুসরণ করেন, অথচ তাঁর মধ্যে মুজতাহিদ হওযার শর্তাবলী অনুপস্থিত। এই মৌলিক ভুলের কারণে তাঁর রচনাবলীতে বহু কথা ভুল ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত পরিপন্থী (আরো একটু আগে গিয়ে বলেন) মওদূদী সাহেবের রচনাবলীই জামাআতে ইসলামীর চিন্তা চেতনার মূল পুঁজি। জামাআতের পক্ষ থেকে মওদূদী সাহেবের ভুল ভ্রান্তির সাধারণ পক্ষ পাতিত্ব একথাই প্রমাণ করে যে, মওদূদী চিন্তাধারা ও রচনাবলীর সাথে তারা একমত। কেউ একমত না হলে তা নিতান্তই ব্যতিক্রম। (জাওয়াহিরুল ফিকহ-১ম খ- পৃঃ ১৭২)

(গ) গত শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ হাদীস গ্রন্থ ই'লাউসসুনানের সংকলক ও ঢাকা আলিয়ার প্রাক্তন হেড মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা যাফর আহমাদ উসমানীর অভিমতঃ মওদূদী সাহেব বাহ্যত মুনকিরে হাদীস। ইসলামের গণ্ডি বহির্ভূত নয়, হবে গোমরাহ ও বেদআতী। এমন লোক হতে মুসলমানদের দূরে থাকা চাই। তাঁর কথায় মোটেও আস্থা না রাখা উচিত। এবং দ্বীন সম্পর্কে তাকে চরম মূর্খ মনে করা বাঞ্ছনীয়। (সূত্রঃ মওদূদী সাহেব আওর উন্‌কী তাহরীরাত পৃঃ ২৫)

(ঘ) তাফসীরে হক্কানীর লেখক পেশোয়ার দারুল উলূম হক্কানীয়ার প্রতিষ্ঠাতা, শাইখুল হাদীস আব্দুল হক্ব রহ. এর অভিমতঃ মওদূদী সাহেবের আক্বাইদ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত পরিপন্থী ও বিভ্রান্তিমূলক, মুসলমানগণ যেন এই ফিৎনা হতে বেঁচে থাকতে চেষ্টা করেন।সূত্রঃ মওদূদী সাহেব আওর উনকী তাহরীয়াত পৃঃ ২২

এছাড়া জনাব মওদূদী সাহেবের উত্থানের একেবারে প্রথম পর্যায়ে তার লেখা তরজুমানের একটি সংখ্যা হযরত হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভীর সামনে পেশ করা হলে মাত্র কয়েকটি লাইন পড়েই হযরত থানভী ইরশাদ করলেনঃ
باذوں کو نجاسذ میں ملاکر کہذاہے، اہل باطل کی باذیں ایسی ہی ہواکرذی ہیں
অর্থঃ এই লোকের বক্তব্যে নাপাকীর সংমিশ্রণ রয়েছে। বাতিল পন্থীদের কথা এমনই হয়ে থাকে। (তরজুমানুল ইসলাম লাহোর ৩০ শে ডিসেম্বর ১৯৫৭ খৃঃ)

তেমনিভাবে আশরাফুস্‌সাওয়ানেহ বাংলা অনুবাদ আশরাফ চরিত ৮৭৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে যে মাওলানা মঞ্জুর নো'মানী সাহেব জামাআতের সাথে নিজ সম্পৃক্ততার সময়ে হযরত থানভীর সঙ্গে পরামর্শ করতে চাইলে, হযরত বলেন আমার দিল এই আন্দোলনকে কবুল করে না।

মাত্র কয়েক জন শীর্ষস্থানীয় আলেমে দ্বীনের অভিমত এখানে উল্লেখ করা হল, তাছাড়া উপমহাদেশের অতীত বর্তমানের সকল হক্কানী আলেম গণের সর্বসম্মত মত হল যে, মওদূদী সাহেবের চিন্তাধারা ও তার উপর প্রতিষ্ঠিত জামাআতে ইসলামী আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বহির্ভূত। এই হিসেবে শরীয়াতের দৃষ্টিতে তারা ফাসিক ও আকীদাগত ভাবে বিদ্‌আতী।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে সিরাতে মুস্তাকীমের উপর কায়িম থাকার তাওফীক দান করুন, আমীন।

২নং প্রশ্নের জবাবঃ মওদূদী সাহেবের লিখিত বই-পুস্তক পড়া যাবে কী?
মওদূদী সাহেবের লিখিত বই পুস্তকে এমন অনেক আলোচনা রয়েছে, যা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদার পরিপন্থী। ইল্‌মে কালাম, ইল্‌মে ফিক্‌হ ও চিন্তা ধারার ক্ষেত্রে তাঁর ব্যতিক্রমধর্মী মত রয়েছে। তিনি সালফে সালেহীনের কারো অনুসারী নন। তার লিখিত কিতাবাদীতে মু'তাযিলা, খাওয়ারেজ, লা-মাযহাবী ও অন্যান্য বাতিল সম্প্রদায়ের কথাবার্তা পাওয়া যায়। তিনি দ্বীন-ইসলাম, ঈমান,

তাওহীদ, রিসালত, তাকওয়া, ইবাদত ইত্যাদির বিশ্লেষণ করেছেন হাদীস ও আ-ছা-রে সাহাবা অনুসৃত আকাবিরে উম্মতের পথ ত্যাগ করে। অপরদিকে রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিজ হাতে গড়া ও নুযূলে কুরআনের প্রত্যক্ষদর্শী জামাআতে সাহাবার অনুসরণে প্রয়োজনীয় সকল জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী উলামায়ে উম্মাতের সূত্র পরম্পরায় দ্বীন, ইসলাম ও আনুষঙ্গিক সকল বিষয়ের নির্ভুল ব্যাখ্যা বিশ্লেষণকে মওদূদী সাহেব ভুল ও বিকৃতি আখ্যা দিতে চেষ্টা করেছেন। এবং এসব হযম করাতে চেয়েছেন খুব চতুরতার সাথে যা একজন মুহাক্কিক আলেম ছাড়া ধরা মুশকিল।

তাই সাধারণ মানুষের জন্যে প্রথম মওদূদী সাহেবের রচনাবলী সংক্রান্ত হক্কানী উলামাদের লিখিত বই-পুস্তক পড়ে নেওয়া জরুরী। তা না করে প্রথমেই মওদূদী সাহেবের বই-পত্র, তাফসীর, ইত্যাদি পড়তে গেলে বিভ্রান্তি ও গোমরাহী অবধারিত। নিজের ঈমান-আমলের সংরক্ষণের স্বার্থেই এমন কাজ হতে বিরত থাকা জরুরী। এ ব্যাপারে যুগ শ্রেষ্ঠ কয়েকজন আলেমের অভিমত নিম্নে প্রদত্ত হল।

১. শাইখুল ইসলাম হযরত হুসাইন আহমদ মাদানী রহ. এর অভিমতঃ মওদূদী সাহেবের রচনাবলী ও কিতাবাদী দ্বীনের আঙ্গিকে এমন বেদ্বীনী ও অপব্যাখ্যা সম্বলিত যে, কম ইল্‌ম সাধারণ মানুষ তা ধরতে পারে না। তাই সাধারণ শ্রেণী তা পড়ে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনীত ইসলাম যার উপর সাড়ে তেরশত বৎসর উম্মাত আমল করে আসছে তা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে ফেলে। (মওদূদীসাহেব আওর উনকী তাহরীরাত পৃঃ ১৫)

২. বিদগ্ধ মুহাদ্দিস, করাচী নিউটাউন মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা ইউসুফ বিনুরই রহ. এর অভিমতঃ মওদূদী সাহেবের বই পুস্তক, রচনাবলীতে এমন মারাত্মক বিষয় বস্তু ও উক্তি সমূহ রয়েছে যেগুলো দ্বারা নিয়মিত দ্বীনী ইল্‌ম অর্জনে ব্যর্থ নতুন সমাজ শুধু গোমরাহী নয়, স্পষ্ট কুফরীতেও লিপ্ত হয়ে যেতে পারে। (মওদূদী সাহেব আওর উনকী তাহরীরাত- পৃঃ ১১)

৩. দারুল উলূম দেওবন্দের প্রধান মুফতী হযরত মাওলানা মাহমূদ হাসান গাংগুহী রহ. এর ফাতাওয়াঃ জনাব মওদূদী সাহেব যে সমস্ত বই পুস্তক লিখে প্রচার-প্রসার করেছেন, সে সমস্ত বই পুস্তকে অনেক বিষয় এমন ও রয়েছে যা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতাদর্শ পরিপন্থী। তিনি ইল্‌মে ফিক্‌হ এর ক্ষেত্রে ভিন্ন মত রাখেন। আইম্মায়ে সলিফের কারো অনুসারী নন। তাঁর লিখিত বই-পুস্তকে মু’তাযিলা, খাওয়ারেজ ইত্যাদি সম্প্রদায়ের কথাবার্তা পাওয়া যায়।

কাজেই তার কিতাবাদী অধ্যায়ন করা দ্বীনের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর। ... শুধু ক্ষতিকরই নয় বরং ধ্বংসাত্মকও বটে। এবং সরাসরি গোমরাহীর মাধ্যম। এজন্যই জনসাধারণকে তার কিতাবাদী পড়া বা অধ্যয়ন থেকে বিরত রাখা হয়।আর এসমস্ত কিতাবাদী যখন লাইব্রেরীতে থাকবে তখন অধ্যয়নে আসবেই। আর লাইব্রেরীতে না থা

অধ্যয়নেও আসবে না। (সুতরাং লাইব্রেরীতেও এসমস্ত কিতাবাদী না থাকা চাই) (ফাতাওয়ায়ে মাহমূদিয়া ১/২৪৭)

৩নং প্রশ্নের জবাবঃ মওদূদী পন্থী ইমামের পিছনে নামায আদায়

১ম প্রশ্নের বিস্তারিত জবাব দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, মওদূদী সাহেবের চিন্তাধারা ও আক্বীদা অনেকাংশে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত পরিপন্থী। তন্মধ্যে অন্যতম হল তিনি সাহাবায়ে কিরামের দোষচর্চাকারী। তাঁর দলকেও সে কাজে তিনি উৎসাহিত করেছেন এবং বাস্তবে জামায়াতে ইসলামী তার চিন্তাধারার সাথে কার্যতঃ একমত, বিশেষ করে সাহাবাদের দোষচর্চায় তারা মওদূদী সাহেবের পদাঙ্ক অনুসারী।

তাই মওদূদী সাহেবের চিন্তাধারায় বিশ্বাসী বর্তমান জামায়াতে ইসলামীর সদস্যরা শরীআতের দৃষ্টিতে ফাসিক। আর ফাসিকের ইমামতী মাকরূহে তাহরীমী। তেমনি কোন ফাসিককে মুআয্যিন বানানোও মাকরূহে তাহরীমী।

প্রমাণঃ (১) উপমহাদেশের প্রখ্যাত মুফতী জনাব মুফতী মুহাম্মদ শফী রহ. স্বীয় গ্রন্থ জাওয়াহিরুল ফিক্হে লিখেন....নামায সম্বন্ধে শরী'আতের সিদ্ধান্ত হল এই যে, ইমাম এমন ব্যক্তিকে বানানো উচিত যিনি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অনুসারী। সুতরাং যারা মওদূদী চিন্তা ধারায় একমত তাদেরকে স্বেচ্ছায় ইমাম বানানো জায়িয নাই। হ্যাঁ, কেহ তাদের পিছনে নামায পড়ে নিলে নামায হয়ে যাবে। (জাওয়াহিরুলফিক্হ ১/১৭২)

(২) মুজাহিদে আযম, আল্লামা হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরীদপুরী রহ. লিখেন, যাহারা সাহাবায়ে কিরামদের দোষচর্চায় লিপ্ত তাহারা যে কেহই হউন না কেন, তাহাদিগকে ইমাম বানাইয়া পিছনে নামায পড়া কিছুতেই জায়িয হইবে না। কারণ যেহেতু তাহারা সাহাবায়ে কিরামের দোষচর্চার কারণে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত হইতে খারেজ হইয়া গিয়াছে। (ভুল সংশোধন পৃঃ ১৪২)

(৩) প্রসিদ্ধ ফাতাওয়ার কিতাব আহসানুল ফাতাওয়ার লেখক জনাব মুফতী রশীদ আহমদ রহ. লিখেনঃ মওদূদী চিন্তাধারায় একমত এমন ব্যক্তির ইমামতী মাকরূহে তাহরীমী। (আহসানুল ফাতাওয়া ৩/২৯১)

সমাপ্ত

www.islamijindegi.com